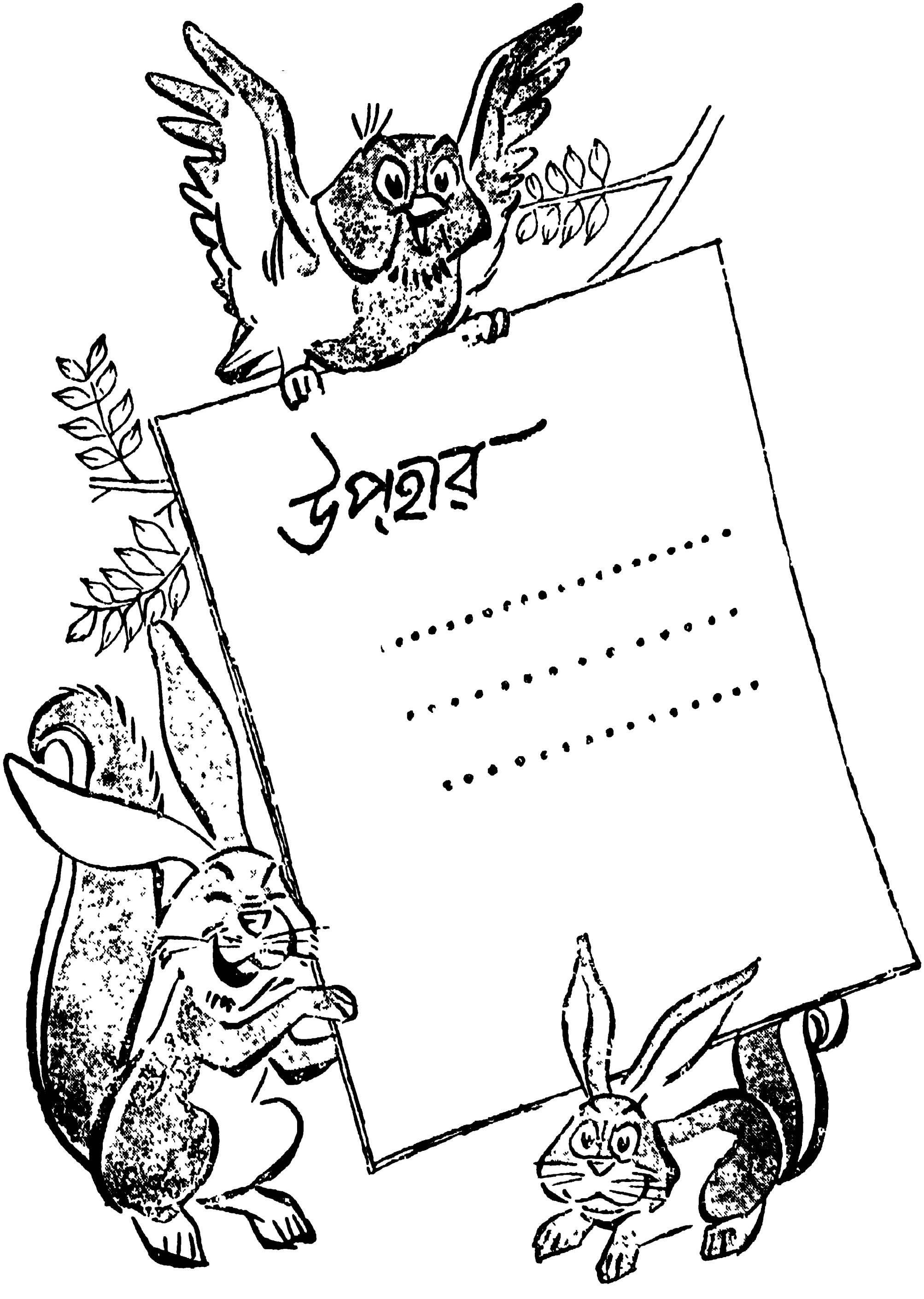
বিশ্বের
শ্রেষ্ঠ গল্প

BISWER SHRESTHA GALPA

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম মুদ্রণ
১৯৬৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
বি. পি. এম্‌স্‌ প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা (উত্তর)


উপহার

চিত্রসূচী

একবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

ত্রিবর্ণ চিত্র

ভূমিকা

গল্প শোনার দিকে মানুষের একটা বড় রকমের ঝোঁক দেখা যায়। তাই যুগে যুগে সাহিত্যের ডালা ভরে ওঠে গল্পের পাঁচ ফুলে। বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের কেউ লিখেছেন ছোট গল্প, কেউ বা বড় গল্প বা উপন্যাস। তাঁদের মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কি, জন গলস্‌ওয়ার্দি, পার্ল বাক, লিও টলস্টয়, স্যার ওয়াল্টার স্কট, ভিক্টর হ্যুগো, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, রবার্ট লুই স্টিভেনসন প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকখানি উপন্যাস দেশকালের গণ্ডী এড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। এই সব উপন্যাসের ভেতর থেকে বেছে বেছে বারোটিকে নিয়ে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এই গ্রন্থে ছোট ছোট গল্পের আকারে ছোটদের মনের মতন করে রূপদান করা হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি ছোট ছোট গল্পের আকারে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলেই এই গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হয়েছে **"বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প"**।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই গল্পগুলি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবে। এক কথায় ছোটদের কাছে এটি একটি লোভনীয় গ্রন্থ। কারণ বিদেশী ভাষা না জেনেও তারা বিশ্বসাহিত্যের সেই অপূর্ব গল্পগুলি পড়বার সুযোগ পাবে।

ইতি—

প্রকাশক

সূচীপত্র







মাদার

—ম্যাক্সিম গোর্কি

কারখানার শ্রমিকদের ভেতর ভ্লাসভ লোকটা ছিল দুদে ও গোঁয়ার, গায়ে তার জোরও ছিল অসাধারণ। রোজগারের মোটা একটা অংশ ব্যয় করত ভডকায়*, আর নেশা ধরলে খুন চেপে যেত তার মাথায়। অকারণে পাথর ছুড়ে মারত মানুষকে; হাতের মাথায় যাকে পেত, বেধড়ক পিটোত খামকাই।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তাকে আসতে দেখলেই পড়শীরা, সহকর্মীরা আগে থাকতেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাত। সে দূর থেকেই দাঁত খিঁচিয়ে অকথ্য গালিগালাজ করে ঝাল ঝাড়ত সবাইযের ওপরে।

বাইরের লোকের তো পালিয়ে বাঁচবার পথ আছে, কিন্তু ঘরে যে দুটি প্রাণী আছে, তারা আর পালাবে কোথায়? বউ পেলাগেয়া, আর ছেলে পাভেল। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, মিখাইল ভ্লাসভ হয় ভোঁসভোস করে ঘুমোয়, আর নয় তো ওই দুটোকে ধরে ঠ্যাঙায়। কারণও দরকার হয় না, কৈফিয়তও দেয় না। ছুটে এল, চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিল, কিংবা হয়ত পেটে বা পিঠে লাগিয়ে দিল তিন লাথি।

প্রতিবাদ? পেলাগেয়া কোনদিন করে না, পাভেল অবশেষে করল একদিন। বাপ তেড়ে আসতেই একটা হাতুড়ি উঁচিয়ে ধরল দু হাতে, "খবরদার, আর মারধোর নয়। ঢের সয়েছি এতদিন, আর সইব না।"

পাভেলের বয়স তখন চোদ্দ।

---

* রুশদেশের সস্তা মদ।

মিখাইল থমকে দাঁড়াল। মিটমিট করে চেয়ে রইল। তারপর একটু হেসে পেছন ফিরে চলে গেল। পেলাগেয়াকে গিয়ে বলল—"আজ থেকে সংসারের খরচা চাইবি তোর ছেলের কাছে। সে তো লায়েক হয়েছে।"

এরপর মিখাইল বেঁচে ছিল আরও দু বছর, তার ভেতর একদিনও একটা কথাও কয় নি ছেলের সঙ্গে।

তারপর সে মরে গেল। মাথার রগ ছিঁড়ে গেল একটা, রাগারাগি করতে করতে। পাঁচদিন বিছানায় পড়ে কাতরাল দারুণ যন্ত্রণায়, কিন্তু কারও চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল ঝরল না তার জন্য। মরার পরেও না।

পাভেলও ধরনটা ধরল বাপেরই। কারখানার কাজ সেও করে। রোজগার তারও মন্দ নয়। সে-ই বা ভডকা খাবে না কেন? ক্রমে গুণ বাড়তে লাগল। মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতে লাগল বাপের মত। অমনি-ধারা চেঁচামেচি গড়াগড়ি। বাপের সঙ্গে তফাত শুধু এই—মাকেও মারে না, গালমন্দও করে না। তবু ছেলের মতিগতি দেখে মা চোখের জল ছেড়ে দেয় এক এক সময়। ধরেছে, বংশের ধারা ধরেছে ছেলেটা। শুধু বংশের ধারা নয়, যুগেরও ধারা। ঘরে ঘরেই তো এমনি ব্যাপার। পুরুষেরা মাতাল। নারীরা কেনা বাঁদী।

পুরুষেরা যতক্ষণ কারখানায় থাকে, ভূতের মত খাটে, গালাগালি খায়, তবু মুখ বুজে খেটে যায়। মগজের ভেতর সারাদিন আগুন জ্বলে ধিকিধিকি, সেইটে ফুটে বেরোয় রাত্রিবেলা, বাড়ি ফেরার পর। দারুণ অসন্তোষ তাদের মনে একটা অনির্বাণ চিতার মত জ্বলছে সারা জীবন ধরে, তারই ছিটেফোঁটা দুই একটা ফুলকি—বাইরে ছিটকে বেরোয় তখন।

তাদের জীবনে নেই শান্তি, নেই তৃপ্তি। কোথা থেকে আসবে? সৎশিক্ষার বালাই নেই এ-সমাজে। শতকরা নিরানব্বুই জনের অক্ষর পরিচয় হয় নি। ভারবাহী পশুর মত খেটেই চলে। স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় সেই পশুরই মত। কখনও শুওরের মত ঘোঁতঘোঁত করে। কখনও বা খেঁকী কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করে।

মজদুরের জীবনেও যে সুখশান্তি আসা সম্ভব, এ যেন তারা কল্পনাও করতে পারে না। তাদের বস্তি যেমন নোংরা, স্বভাবও তেমনি নোংরা। দেহে যেমন সাত পরদা ময়লা পুরু হয়ে জমে আছে, মনেও তেমনি।

এমনিধারা পশুর জীবনযাপন করে এসেছে শ্রমিকেরা পুরুষপুরুষানুক্রমে। মিখাইল ভ্লাসভ এমনি জীবন যাপন করে গিয়েছে চিরদিন, তার ছেলে পাভেলও শুরু করেছে এমনি জীবনই।

বলবার কী আছে অভাগিনী পেলাগেয়ার? ছেলে বড় হলে যে এমনিই দাঁড়াবে, তা তো আগে থেকেই জানা! তবু ব্যথায় মনটা টনটন করে। ভডকা খেয়ে পাভেল যখন মড়ার মত পড়ে থাকে বিছানায়, তখন পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুবর্ষণ করে তার মা।

দিন কাটছিল এক ভাবেই, হঠাৎ পরিবর্তন এল।

অল্পে অল্পে ধাপে ধাপে এল সে-পরিবর্তন। পাভেলের ভেতর। তার দেহে, তার আচরণে, তার মনে। পেলাগেয়া ধরতে পারে নি প্রথমে। কিন্তু মায়ের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া কি সন্তানের কাজ?

পাভেল বদলাচ্ছে। সে আর মদ খায় না, অন্ততঃ মাতাল হয়ে বাড়ি আসে না। বেশভূষায় বিলাসিতার প্রশ্ন ওঠে না, সে-পয়সা পাবে কোথায়? কিন্তু পরিচ্ছন্নতা এসেছে ঠিকই। কারখানা থেকে ফিরেই সন্ধ্যেবেলা গরম জলে সাবান গুলে হাত মুখ ঘাড় বুক ভাল করে পরিষ্কার করে। সন্ধ্যায় বাইরে যায় ঠিকই, কিন্তু টলতে টলতে ফেরে না, হাতে বই নিয়ে চিন্তাকুল বিমর্ষ মুখে বাড়িতে এসে ঢোকে। এসেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ে না, আলো জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত কী যেন পড়াশুনা করে।

সবচেয়ে বড় কথা, মায়ের সঙ্গে ব্যবহারটি ইদানীং হয়ে উঠেছে মধুর। আগের মত পরুষ কর্কশ কণ্ঠে কথা বলে না আর। প্রতি কথাটি কী নম্র, কী আবদারে, আদরে শ্রদ্ধায় ভরপুর! 'মা' বলতে যেন তার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত অনুরাগে আবেগে রাঙা হয়ে উঠছে, এমনি ঝংকার সে-আহ্বানে।

পেলাগেয়া প্রথমে বিস্মিত হল, তারপর হল পুলকিত। কিন্তু তারও পরে? তারও পরে সে পড়ল চিন্তায়। এ-পরিবর্তনের কারণ কী? এ-সূচনার পরিণতি শুভ হবে তো? জিনিসটা তার বোধগম্য নয়; সেইজন্যই আশঙ্কা হয়। কস্মিন্‌কালে কারখানার কোন মজদুর মায়ের সঙ্গে এমন বিনয়নম্র আচরণ করে নি, মাকে ডাকে নি 'মা-মণি' বলে। সবচেয়ে ভাবনার কথা, ছেলেটা গাদা গাদা বই যোগাড় করে এনেছে কোথা থেকে, আর অবাক্ কাণ্ড, রাত জেগে জেগে পড়ে সেই সব বই।

"হ্যাঁরে, এ বই কার?" একদিন সে সসংকোচে জানতে চায়।

"বই?"—মাথা তুলে পাভেল মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে—"বই হল লোকেদের। হোটেলে গিয়ে বসি তো সন্ধ্যাবেলায়, তারা আসে। তাদেরই বই।"

"বই নিয়ে হোটেলে আসে?"—মা অবাক্ সে-কথা শুনে।

"মানে, ওইটিই এখন আমাদের বসবার, কথা কইবার জায়গা কিনা; তা, ওখানে অনেক লোকই আসে। ভালো ভালো ছেলে—"

এরপর একদিন, শনিবার সেদিন, পাভেল বলল—"ওবেলা কয়েকজন লোক আসবে মা-মণি।"

সারাদিন ধরে ঘর পরিষ্কার করল, আর ঘর গুছোলো পেলাগেয়া। যারা বই হাতে না করে হোটেল রেস্তোরাঁতে যায় না, এমনি সব লোক আসছে। নিশ্চয় ভাল ভাল লোক। এ-বস্তির লোকেদের মত লোক নয়। তারা যেন পাভেলের ঘর দেখে, পাভেলের মাকে দেখে নাক না সিটকোয়।

সন্ধ্যাবেলায় এল তারা। একে একে অনেকেই এল। দুই একজন এই বস্তিরই ছেলে, কারখানায় কাজ করে তারা, পেলাগেয়া চেনে তাদের। কিন্তু অন্যসবই বাইরে থেকে আসছে। আন্দ্রিয়েই, ইয়েগর, নিকোলাই—কত। দুটি মেয়েও এল—সাশা আর

নাটাশা। নাটাশা বেঁটেখাটো চটপটে মেয়ে, সাশা লম্বা ধারালো ভারিক্কি। সবাইকে বেশ ভাল লাগছে পেলাগেয়ার।

আর একজন এল, তাকে দেখে কিন্তু মোটেই লাগল না ভাল। সে হল দাগী চোর ভেরশ্চিকভের ছেলেটা। তারও নাম নিকোলাই। তাকে এ-দলে দেখে পেলাগেয়া অবাকও হল, মনে মনে অসন্তুষ্টও হল। পাভেল একে কেন বন্ধুর দলে ভিড়িয়েছে?

এসেই ওরা পড়াশুনায় মন দিল। নাটাশা নাকি কোন্ স্কুলে মাস্টারি করে। সে একখানা মোটা বই খুলে তা থেকে একটানা পড়ে যেতে লাগল। খানিকটা পড়ার পর শুরু হল আলোচনা। বই থেকে যা পড়া হল—এক একজন তার ওপরে টিপ্পনী কাটতে আরম্ভ করল। বলা বাহুল্য, এক একজনের টিপ্পনী এক একরকম। ফলে তর্কাতর্কি শুরু। গলা সপ্তমে উঠে যায় এক একজনের।

কথার তুফান বইছে ঘরের ভেতর। একটি বর্ণও তার বোধগম্য হচ্ছে না পেলাগেয়ার। মাঝে মাঝে বার বার মুখে মুখে ফিরছে একটি দুটি কথা—'সমাজতন্ত্র', 'বিপ্লব', 'নতুন সমাজ' ইত্যাদি। এ-সবের মানে কী? মুখ্যু মাকে কে তা বলে দেবে?

খাওয়াদাওয়ার পর একে একে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়ল। কোনও দুজন এক সাথে গেল না। বাইরের লোকের নজর যাতে না পড়ে তাদের ওপর। মা লক্ষ্য করল এসব। তবে কি এরা লুকিয়ে ছাপিয়ে করছে এ সব? কিন্তু কেন? পড়াশোনার ভেতর দোষের কী থাকতে পারে? আর পড়াশোনা ছাড়া তো এরা আর কিছুই করে নি এখানে বসে।

সেই থেকে প্রতি শনিবার এই বাড়িতেই এদের মজলিশ বসতে লাগল। আন্দ্রিয়েই ছেলেটি তো ঘরের ছেলের মতই হয়ে গেল। পাভেলের সঙ্গে তারই ঘনিষ্ঠতা বেশী। মায়েরও তাকে খুবই ভাল লাগে। ইউক্রেন প্রদেশের লোক সে, নানা জায়গা ঘুরে তারপর এসে কাজ নিয়েছে এই কারখানায়।

দিনকতক যাওয়া-আসার পরে সে পাভেলের বাড়িতেই বাস করতে শুরু করল। তার ছেলেবেলার ডাকনাম ছিল খখল। সেই নামেই তাকে ডাকে এখানে সবাই। সেও পেলাগেয়াকে ডাকে 'নেনকো' বলে। কথাটা ওর দেশের কথা, ওর মানে হল 'মা'।

মারিয়া কারসুনভা বস্তির এক বিধবা, তার কাজ হল খাবার তৈরি করে টিফিনের সময় কারখানার ভেতরে গিয়ে বিক্রি করা। সে একদিন এসে পেলাগেয়ার কানে কানে বলল—"পুলিসের নজর পড়েছে তোমার ছেলের আর তার দলবলের ওপর। আজ রাত্রে তল্লাশি হবে তোমার বাড়িতে—এইরকম সবাই বলাবলি করছিল কারখানাতে।"

পেলাগেয়ার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। পুলিসের তল্লাশি যে কী বস্তু, তা খানিকটা শোনা আছে তার। তল্লাশি দিয়ে শুরু, তারপর ধাপে ধাপে গ্রেফতার, জুলুম, কয়েদ, সাইবিরিয়ায় নির্বাসন পর্যন্ত।

তার ছেলেও কি সেই পথের পথিক হল? অনেক সময় বলেছে বটে পাভেল যে তার বরাতে অনেক দুঃখ আছে। পেলাগেয়া বিশ্বাস করে নি। কেমন করে করবে? সে নিজে তো দেখছে—তার ছেলে পড়াশুনা আর তর্কাতর্কি করা ছাড়া আর কোন কিছুর মধ্যে যায় না। তা, এটা কি একটা অপরাধ হল? জেল কেন হবে, শুনি?

কিন্তু আজ মারিয়ার এই খবরটা তার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে দিল একেবারে। তল্লাশি হবে, অথচ জেল হবে না, এ সম্ভব নয়। সত্যিই কি তার এমন সর্বনাশ হবে? বুকের নিধি একমাত্র সন্তান বুক খালি করে চলে যাবে তার?

স্বামীর জীবদ্দশায় সে একদিনের জন্যেও সুখের মুখ দেখে নি। এখন, পাভেল এই পড়াশুনা আরম্ভ করার পর থেকেই তার দিন ফিরেছে একটু। সোনার চাঁদ সব ছেলে-মেয়েরা আসে এ-বাড়িতে। তারা যতক্ষণ থাকে, বাড়িটা যেন স্বর্গপুরী হয়ে থাকে। পেলাগেয়ার আনন্দের অন্ত থাকে না। সে-আনন্দ বুঝি আর সইল না ওর।



বইয়ের গাদার ওপর মা ঠায় বসে আছে

মারিয়া তো খবর দিয়ে চলে গেল। পেলাগেয়া এখন করে কী? পুলিস আসবে রাত্রে। ছেলেরাও কারখানা থেকে ফিরবে প্রায় সন্ধ্যায়। তাদের আসার অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকলে চলে কেমন করে? মা পাভেলের সব বই এনে এক জায়গায় মজুদ করল। তারপর সেগুলো নিয়ে কী করবে, ভেবে পায় না। এত বই লুকোনোর মত জায়গা কোথা পাবে? সে বইয়ের গাদার ওপর বসে প্রহর গুনতে লাগল।

ওরা এল ঠিক সময়েই। খবর শুনল। বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না ওদের ভেতর। বইয়ের গাদার ওপর মা ঠায় বসে আছে দেখে তারা তো হেসেই কুটিকুটি।

তাকে তুলে পাঠিয়ে দিল খাবার নিয়ে আসবার জন্য। তারপর গাদা থেকে বেছে বেছে খানকতক বই আলাদা করে রাখল।

পেলাগেয়া খাবার নিয়ে এলে পাভেল তাকে দিল সেই বই কয়েকখানি লুকিয়ে রাখবার জন্য। অন্যগুলি? অন্যগুলি নির্দোষ। পেলাগেয়া ওই বই কয়েকটা অনায়াসেই লুকিয়ে ফেলল নিরাপদ জায়গায়।

পুলিস কিন্তু সেদিন এল না, তার পরের দিনও না। এল প্রায় এক মাস পরে। সেদিন বাইরের লোক বলতে বস্তিরই সেই নিকোলাই ছোকরা রয়েছে, দাগী চোর ভেরশ্চিকভের ছেলে। বাড়ির ছেলেরা,—অর্থাৎ পাভেল আর আন্দ্রিয়েই—তারা তো থাকবেই।

পুলিস এল। কেউ ভয় পেল না তাদের দেখে, এক পেলাগেয়া ছাড়া। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ—অনেক খোঁজাখুঁজির পরে পুলিস গ্রেফতার করে নিয়ে গেল আন্দ্রিয়েই আর নিকোলাইকে। কী জানি কেন তারা পাভেলকে এ-যাত্রা রেহাই দিয়ে গেল।

কিন্তু তাতে আশ্বস্ত হওয়ার কিছুই দেখতে পায় না পাভেল। বাড়ির সান্ধ্য মজলিশ আর বসে না। ওরা সাবধান হয়েছে। কেউ কখনো পাভেলের কাছে আসে যদি, দুই পাঁচটা কথা বলে চটপট সরে পড়ে।

ওদের কাজ হচ্ছে এখন একটা ছোট খবরের কাগজ চালানো। নিত্য নিয়মিত নয়, যখন সম্ভব হয়, তখনই। ছোট্ট একখণ্ড ইস্তাহার, কোথায় ছাপা হয় কে জানে। সেই কাগজ গাদাগাদা তারা কারখানার ভেতরে বিলি করে। শ্রমিকেরা পড়ে আর গরম হয়ে ওঠে। তাদেরই হাজার রকম দুঃখ-দুর্দশার কথা আগুনের আখরে ছাপানো হয়েছে সেই কাগজে।

এরপর পুলিস আর একদিন এল। এবার ধরে নিয়ে গেল পাভেলকে।

২

পাভেল, আন্দ্রিয়েই দুজনেই জেলখানায়, পেলাগেয়ার মন হুহু করে একা বাড়িতে। মাঝে মাঝে শহরে যায় ছেলের সঙ্গে দেখা করবার আশায়। প্রথম প্রথম অনুমতি মিলত না, এখন মিলছে। ওরা ভালই আছে, দেখা যায়। পেলাগেয়াকে সান্ত্বনা দেয় নানাভাবে।

ওর বাড়িতে এখনও শহর থেকে ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ আসে এক একদিন। সাশা আর ইয়েগর একদিন এসে বলল—"খবরের কাগজটা কারখানায় বিলি করার একটা উপায় করা দরকার। পাভেলকে কয়েদ করার ফলেই যদি কাগজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পুলিস জানবে পাভেলই চালাত কাগজ, ওই ছোকরাই সকল-কু-র গোড়া। আর ও আটক থাকা সত্ত্বেও যদি কাগজ আগের মত চলতে থাকে, তাহলে ওরা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে পাভেল দোষী নয়।

যুক্তিটা মায়ের মাথায়ও ঢুকল। কাগজ বিলি চালু রাখতে পারলেই যদি তার ছেলেকে পুলিসের সন্দেহ থেকে মুক্ত করা যায়, তাহলে তো যেমন করেই হোক সেকাজ করতে হবে। মা বলে বসল—"কাগজ তোমরা আমাকে দিয়ে যাও, আমি গিয়ে কারখানায় বিলি করে আসব।"

ওরা তো তাজ্জব বনে গেল—"কী করে? তোমায় তারা কারখানার ভেতরে ঢুকতে দেবে কেন? মজদুর ছাড়া কেউ তো ভেতরে যেতে পায় না।"

"কিন্তু মারিয়া কারসুভনা পায়, খাবার বেচবার জন্য। আমি তারই খাবারের মোট মাথায় নিয়ে যাব।"

সাশা আর ইয়েগর চমৎকৃত হয়ে গেল মায়ের বুদ্ধি দেখে। হাবাগোবা সিধে মানুষ বলেই সবাই জানত মাকে। সেই মা যে কাজ হাসিল করার জন্য ফন্দি বার করতে পারে, আর সেই ফন্দি কাজে খাটাবার জন্য নিজেও নিতে পারে বিপদের ঝুঁকি, এ তারা তো আগে ভাবে নি!

তারা বলে গেল যে, কাগজ তারা এনে দেবে।

তখন পেলাগেয়া গিয়ে মারিয়ার কাছে কাঁদুনি গাইতে বসল—"ছেলে গেল জেলে। আমার পেট তো এখন চলে না। তোমার কাজের ভেতর আমায় নাও না! বাজার-হাট করা, রান্নাবান্না করা, আবার রান্না-করা খাবার কারখানায় নিজে বিক্রি করা—একা মানুষের পক্ষে তো সহজ নয়! নাও না আমায় তোমার সাথে! যা হয়, কিছু দিও।"

মারিয়া খুশী হয়েই রাজী হল। সত্যিই কাজের চাপ তার খুব বেশী। বিশ্বাসী লোক মেলে না বলেই সে এতদিন সহকারিণী নেয় নি। এখন পেলাগেয়াকে পেয়ে সে বেঁচে গেল। ওকে তো বস্তিতে কেউ অবিশ্বাস করে না!

পরদিন থেকেই পেলাগেয়া খাবারের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে কারখানায় ঢুকতে লাগল। শ্রমিকদের তল্লাশি করা হয় দেউড়িতে। কিন্তু খাবারওয়ালীকে কোন সান্ত্রী তল্লাশি করে না। পেলাগেয়াকেও করল না। কয়েকদিনের ভেতরই সাশা এসে বড় এক বাণ্ডিল কাগজ দিয়ে গেল। অগ্নিক্ষরা বাণীতে ভরতি এক ইস্তাহার। এই জিনিস বিলি করতে হবে সব মজদুর ভাইয়ের হাতে হাতে।

ধরা পড়লে? ধরা পড়লে গ্রেফতার। ছেলের সঙ্গে মায়েরও জেল অনিবার্য।

কিন্তু পেলাগেয়া ভয় পেল না। কাগজের বাণ্ডিল লুকিয়ে ফেলল নিজের জামার ভেতরে। তারপর খাবারের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে কারখানায় গিয়ে হাজির হল। সেদিন শ্রমিকদের ভেতর সে কী উত্তেজনা! হাতে হাতে ইস্তাহার। জটলা, হইহই!

কর্তাদের কানে কথা পৌঁছুতে দেরি হল না। পাভেল জেলে, আন্দ্রিয়েই জেলে, এ-বস্তির যত ছেলে বিপ্লবী দলে ছিল, ধরা পড়তে কেউ বাকী নেই। তাহলে এখন আবার কাগজ নিয়ে এল কে, এই কারখানার ভেতরে?

বিপ্লবীদলে নতুন নাম লিখিয়েছে কেউ, তাতে সন্দেহ নেই। কে সে, ধরতে হবেই। দেউড়িতে তল্লাশির আরও কড়াকড়ি হল।

পরদিন খাবারওয়ালী পেলাগেয়াকেও তল্লাশি করতে ছাড়ল না সান্ত্রীরা। কিন্তু সেদিন আর পাবে কি? কাগজ তো আর রোজ আসে না। আবার আসবে সাত আট দশ দিন পরে। ততদিন কি আর এত কড়াকড়ি থাকবে?

পেলাগেয়ার ঘরে একদিন এল রীবিন। মধ্যবয়সী লোকটি, এই কারখানাতেই কাজ করে। আন্দ্রিয়েইকে পুলিস যেদিন গ্রেফতার করে, রীবিন ছিল তল্লাশির সাক্ষী। পুলিসের আচরণ দেখে ও তিতোবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রীবিন এসেই বলল—"যাবার বেলায় তোমায় একবার দেখতে এলাম। পাভেলকে তো পাব না। বিদায়টা তোমার কাছেই নিয়ে যাই।"

পেলাগেয়া অবাক্ হয়ে বলে—"তুমি কোথাও যাচ্ছ না কি?"—নিজের ইচ্ছায় যে কারিগরেরা কেউ কারখানা ছেড়ে যায়, এ জানা ছিল না পেলগেয়ার।

"যাচ্ছি গো, সত্যিই যাচ্ছি। পাড়াগাঁ অঞ্চলে যাচ্ছি।"

"পাড়াগাঁ অঞ্চলে যাচ্ছ? সেখানে তুমি করবে কী? তুমি হলে কারখানার লোক—"

"কারখানার কাজ তো তোমরাই মায়ে-পোয়ে চালাচ্ছ। গোটা রুশ জাতটাই যে কারখানার মজুর নয়, তা তোমাদের হুঁশ নেই। আমি দেখতে যাচ্ছি—ক্ষেতে ভুঁয়ে বনে জঙ্গলে যে সব শ্রমিক ভাইয়েরা খাটছে, তারা আছে কী হালে।"

পেলাগেয়া ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারল না হঠাৎ। রীবিনই বলে যাচ্ছে—"পাভেলরা বেরিয়ে আসুক জেল থেকে। আমিও ততদিন ঘুরে আসি খানিকটা। ফিরে এসে পাভেলকে জবর খবর দিতে পারব আশা করি।"

পেলাগেয়া অবশেষে একটা কথার মত কথা বলল—"বলি, এসব নিয়ে তুমি তো মাথা ঘামাতে না আগে! সেদিন পুলিসের সাথী হয়ে এলে, আমরা ভাবলাম—"

"ভুল ভাবলে। পুলিস ডেকে নিয়ে এল পথ থেকে, না এসে করি কী? কিন্তু, এনেছিল, না ভালই করেছিল। আমার চোখ খুলে গেল সেইদিন। দুঃখকষ্ট আমাদের আছে, তা চিরদিনই জানি। কিন্তু তা দূর করার জন্য যে একটা চেষ্টা করা যায়, চেষ্টা যে চলছে, জানতাম না সেইটাই। পাভেলদের ওপর পুলিসের জুলুমবাজি দেখে সেইটাই মাথায় ঢুকল। জানলাম যে আমাদেরই ঘরের ছেলেরা সে চেষ্টায় হাত দিয়েছে এরই মধ্যে।

সেই থেকে ভাবছি। ওরা একাই খেটে যাবে? আমি কেন হাত লাগাই না ওদের সাথে? মুশকিল হল আমি লিখতে পড়তে শিখি নি। ভাবলাম—আমার দ্বারা যদি কোন কাজ হয়, তবে সেইসব জায়গাতেই হবে—যেখানে মানুষ মাত্রই মুখ্যু আমার মত। দেখি গিয়ে সে সব জায়গার অবস্থা, তারপর এসে বলব এখন।"

রীবিন চলে গেল। পেলাগেয়া অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল। আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওই ছুটে চলল একটা জ্বলন্ত ফুলকি। নতুন জায়গায় খাণ্ডবদাহন শুরু করবার জন্য। নেবাক না পুলিস, কত জায়গায় আগুন নেবাবে।

পেলাগেয়ার কাজ চলতে লাগল, অর্থাৎ খাবার বিক্রির তলায় তলায় খবরের কাগজ ছড়ানো। মাঝে মাঝে জেলখানাতে গিয়ে দেখা করে আসে ছেলের সাথে। জেলর লোকটি সদাশয়, একদিন বললেন—"ছেলেগুলোর বিরুদ্ধে প্রমাণ কিছু পায় নি পুলিস। এইবার ছেড়ে দেবে নিশ্চয়।"

কথাটা ঠিক। এক একজন করে বন্দীরা বাড়ি ফিরতে লাগল। প্রথম এল ভেরশ্চিকভ, তারপর এল আন্দ্রিয়েই। আন্দ্রিয়েই আবার পেলাগেয়ার বাড়িতেই এসে বাস করতে শুরু করল, আবার শহর থেকে আসা শুরু হল ছেলেমেয়েদের। তবে এবার আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা মজলিশ চলে না, জোর গলায় তর্কও করে না কেউ।

অবশেষে একদিন ছাড়া পেল পাভেলও।

মায়ের সেদিন যেন আর মাথার ঠিক নেই। কাকে কী বলছে, কী করতে কী করে বসছে—তা নিজেই জানে না। ঘোরে ফেরে, ঠায় দাঁড়িয়ে পাভেলের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। তারপর পাভেলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটু হেসে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

পাভেল আন্দ্রিয়েই দুজনেই আবার কারখানায় যোগ দিয়েছে। কাজেই কাগজ বিলি করার জন্য পেলাগেয়াকে আর যেতে হয় না। সে এখন করে কী? ছেলেকে বলল—"আমি যে একটা কাজ কিছু না পেলে হাঁফিয়ে উঠি!"

রীবিন এল হঠাৎ একদিন। পাভেলকে দেখে মহা খুশী। তার সফরের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলতে বসল। মফস্বলে অনেক জায়গা ঘুরেছে সে। চাষীদের কী দুর্দশা! নিজের জমি কারও নেই, পরের জমিতে সারা জীবন খেটে মরে। কারখানার শ্রমিকরা তো ওদের তুলনায় স্বর্গসুখে রয়েছে! এদের কাছে বিপ্লবের কোন বাণী পৌছয় নি এখনো।

পাভেলরা এদের জন্য কী করছে? এদের বাদ রেখেই কি সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে দেশে?

পাভেল বলে—"সবে শুরু করেছি আমরা। ক্রমে ওদিকটাও ধরব।"

রীবিন জোর দিয়ে বলে—"ভুল করছ। সব জায়গায় একসাথে আগুন জ্বালানো চাই। নইলে পেরে উঠবে না। শোন, ওদিককার সব লোক একদম নিরক্ষর। আমিও তাই ছিলাম। এই অল্প দিনের ভেতরে একটু পড়তে শিখেছি। ওদিকে এক এক গ্রামে মাস্টার বা মাস্টারনী আছে। তাদের ধরলে তারা শেখায়। আমি একদিকে নিজে শিখেছি তাদের কাছে, অন্যদিকে গাঁয়ের চাষীভুষোকে শেখাচ্ছি নিজের সামান্য বিদ্যেটুকু। এখন বই দাও দেখি! সোজা কথায় লেখা সব বই! যা সহজে আমরা পড়তে আর বুঝতে পারব! বই ছড়িয়ে দেব গ্রামে গ্রামে। এদিকে গ্রামের লোকের জন্য একটা খবরের কাগজ বার কর দেখি! বিপ্লবের কাজ কত এগিয়ে যাবে, দেখবে।"

রীবিনের বয়স হয়েছে। সেই লোকের এই উৎসাহ? এমন নিষ্ঠা? ওরা বাহবা দিল রীবিনকে। তার চাহিদামত বই শীগ্রই দেবে বলল। খবরের কাগজ?—চেষ্টা করা যাচ্ছে তারও! তাতে অবশ্য সময় নেবে একটু। ভাল ছাপাখানা তো নেই!

রীবিন একটা বনের ভেতর বাস করছে এখন তিনটি ছেলেকে নিয়ে। চারজনে মিলে আলকাতরা তৈরি করে সেখানে। মালিক মাঝে মাঝে আসে তদারক করবার আর মাল চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য। তা ছাড়া অন্য সব সময়েই রীবিনই মালিক ওখানে। চারদিকের সব গাঁয়ে বই কাগজ অনায়াসে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

"একটা ছেলে শীঘ্রই আসবে বই নেওয়ার জন্য। ইগনাত তার নাম। এবার আলকাতরার চালান নিয়ে সেই আসবে। তোমার ঠিকানা দিয়ে দেব তাকে।"

রীবিন বিদায় নিল। একটা নতুন প্রেরণা রেখে গেল পেছনে।

এসে পড়ল পয়লা মে।

শ্রমিক দিবস পয়লা মে। শ্রমের জয়গান, শ্রমিকসংহতির আশার বাণী শোনবার এবং শোনাবার দিনে। এই দিন পুরোনো কর্মীরা নতুন করে শপথ নেবে নিষ্ঠা আর উদ্যমের। নতুন কর্মীরা দীক্ষা নেবে পুরাতনদের কাছে। প্রতি কারখানায় শ্রমিকেরা স্থির করেছে—মিছিল বার করবে শ্রমিকসংঘের রক্তপতাকা নিয়ে।

পাভেলদের মিছিলের আয়োজন চলছে বিপুল উৎসাহে। লাল পতাকা নিয়ে পাভেল যাবে মিছিলের পুরোভাগে। আন্দ্রিয়েই বার বার নিষেধ করছে তাকে। নিজে নিতে চাইছে পতাকাবহনের ভার। কারণ, পতাকা যে বহন করবে, পুলিসের আক্রোশ পড়বে তারই ওপরে, সবচেয়ে বেশী করে। অন্য সবাই রেহাই পেলেও পেতে পারে, পতাকাবাহী ধরা পড়বেই। বেয়নেট হয়ত তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়েও যেতে পারে।

আন্দ্রিয়েই বা সাশা, বা স্বয়ং পেলাগেয়ারও কাতর অনুরোধ টলাতে পারে না ওকে। পতাকা পাভেলই নেবে। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এল পয়লা মে। সকাল বেলাতেই শ্রমিকেরা দলে দলে মিছিল করে পথে বেরিয়ে পড়ল। সকলের আগে সমুচ্চ পতাকাদণ্ডের মাথায় জমকালো লাল ঝাণ্ডা। শত শত শ্রমিক চলেছে পতাকার পেছনে—মুখে তাদের শ্রমিক-জনতার জয়গান—

"সংগ্রামী জনগণ—জাগো, জাগো হে!"

মিছিলের আগে আগে পাভেল। ঠিক তার পেছনেই আন্দ্রিয়েই, আর পেলাগেয়া। ছেলে চলেছে বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে, মা কোন্ প্রাণে ঘরে বসে থাকবে?

পুলিস দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা বন্ধ করে। আর এগুতে দেবে না মিছিলকে। সংগ্রামী জনতাকে জাগতে বলছে এই মিছিল, এই লাল পতাকা। কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম? চিরপদদলিত জনতা কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চায়? না, সংগ্রাম করতে কাউকে দেওয়া হবে না এই রুশ দেশে। চিরদিন যে সমাজব্যবস্থা চালু রয়েছে এখানে, চিরদিন তাই থাকবে। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বরদাস্ত করবে না শাসক শক্তি।

পুলিস বন্ধ করেছে পথ, পাভেল ভেদ করতে চায় সে বাধা। বেয়নেট বাগিয়ে আছে পুলিস, পাভেল বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তবু। এই বুঝি বেয়নেট বিঁধে যায় তার বুকে—

না, তা বিঁধল না। বেয়নেট ফেলে দিয়ে পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ল পাভেলদের ওপরে। বেঁধে নিয়ে গেল তাদের। আর পেলাগেয়া? পুলিসের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়তে পড়তেও সে পতাকাদণ্ডটিকে উঁচু করে ধরল আবার।

৩

ছেলেরা রইল কয়েদখানায়, পেলাগেয়া একা বাড়িতে।

শহর থেকে নিকোলাই এল একদিন "এখানে তোমার থাকা চলবে না। থাকলে লাভ নেই, অথচ বিপদ আছে। পাভেল বলে গিয়েছে—আমার বাড়িতে তোমায় নিয়ে রাখতে। বাড়িতে আমি একা থাকি, এক দিদি আছে, সে মাঝে মাঝে এসে দু চারদিন মাত্র থেকে আবার নিজের কাজে বেরিয়ে যায়। কোন অসুবিধা হবে না তোমার।"

পরের দিন বস্তির বাস তুলে দিয়ে শহরে চলে গেল পেলাগেয়া। প্রায় সারাটা জীবন এই বস্তিতে কেটেছে, চিরবিদায় নিতে গিয়ে বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল যেন।

যা বলেছিল নিকোলাই, তার বাড়িটা একদম খালি। সংসারের ভার পেলাগেয়াকেই নিতে হল। নিকোলাই ছেলেটি নিজের সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, তার আদর-যত্নের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে আবার গেরস্তালির কাজে ডুবে গেল সন্তানহারা জননী।

নিকোলাই-এর দিদি একদিন এল, সোফিয়া তার নাম। সেও বিপ্লবীদলেরই একজন। সে খবর দিল যে গ্রামের লোকের জন্য খবরের কাগজ ছাপা হয়েছে। সেগুলি রীবিনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কতকগুলি বইও। রীবিনের নিজের লোকও আসতে পারত ওগুলির জন্য, কিন্তু তাকে খবর দেবার তো কোন উপায় নেই!

সোফিয়া যাবে, সঙ্গে নেবে পেলাগেয়াকে। পেলাগেয়া তো কাজে লাগতে পারার আনন্দে আটখানা একেবারে। তারপরে, খানিকটা ঘুরেফিরে আসাও হবে। মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে একটু।

ক্রমাগত দুদিন পথ চলল ওরা। বড় বড় মাঠ, বিশাল বন, দু একটা ছোটখাটো পাহাড়ও পেরিয়ে যেতে হল। অবশেষে পাওয়া গেল এক নিবিড় জঙ্গলের ভেতর খড়ের ছাপরা একখানা। রীবিন সেইখানেই থাকে, সঙ্গে তিনটি ছেলে—ইয়াকভ, ইগনাত আর ইয়েফিম। আলকাতরা তৈরি করে ওরা মনিবের জন্য।

কাগজ পেয়ে ওরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে রীবিনেরা সবাই কিছু কিছু পড়তে শিখেছে। বইপত্র লুফে নিল। পাওয়ামাত্র পড়তে শুরু করল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। কাল থেকেই গাঁয়ে গাঁয়ে বিলি করে দেবে। জমিন তৈরি হচ্ছে বিপ্লবের। চাষী ভাইয়েরা পিছিয়ে থাকবে না মজদুর ভাইদের চেয়ে।

রাতটা থেকে সোফিয়া আর পেলাগেয়া ফিরতি-পথে যাত্রা করল আবার, ভোরের আলো না ফুটতেই। এর পর থেকে পেলাগেয়া একাই আসবে। রীবিন বিদায়বেলায়

সাহস দিল মাকে—"ছেলে তোমার অমর। সাজা হলেও সে সাইবিরিয়া থেকে পালিয়ে আসবে, দেখো।"

পালিয়ে আসা? পাভেলরা পালাতে রাজী থাকলে তো এই শহরের জেলখানা থেকেই পালাতে পারত! নিকোলাই ইয়েগরেরা সে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল বইকি ওদের কাছে! গোপন চিঠিতে পরিকল্পনা খুলেই জানিয়েছিল। পাভেলরা রাজী হয় নি। ওরা খোলাখুলি বিচারের সম্মুখীন হতে চায়। আদালতে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে চায় ওদের মুক্তির দাবি। দলিত, নিপীড়িত মেহনতী মানুষের পক্ষ থেকে আপসহীন সংগ্রাম ঘোষণা করতে চায় অত্যাচারী শোষক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? আগেভাগে পালিয়ে এসে তো সে সুযোগ পাবে না ওরা!

ফিরে এসেই শোনে ইয়েগর খুব অসুস্থ। নিকোলাই বলল,—"তুমি যাও মা, ওকে একটু দেখ এ-সময়। ওর কাছে কাছে শুধু লুদমিল্লা, তা সে তো দলের কাজ নিয়েই ব্যস্ত সব সময়। ছাপাখানাটা বলতে গেলে একাই চালাচ্ছে।"

মা তক্ষুণি চলে গেল ইয়েগরের ফ্ল্যাটে। যে যক্ষ্মায় ভুগছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারও ওদেরই লোক, পাভেলের বস্তির ঘরে তাকেও কতবার দেখেছে মা!

ডাক্তার প্রাণপণে চেষ্টা করল, কিন্তু বাঁচাতে পারল না ইয়েগরকে।

ইয়েগরের দেহ কফিনে বন্ধ করে মেহনতী জনতা মিছিল করে নিয়ে যাচ্ছে কবরখানায়। লাল ফিতে আর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে শবাধার। জনতার বাণী উঠছে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে—"সংগ্রামী জনতা এক হও! শোষক শাসকেরা জাহান্নমে যাক।"

বেশীক্ষণ চলতে পেলো না মিছিল। চারদিক থেকে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিস-বাহিনী। শবাধার থেকে ফিতে আর মালা টেনে ছিঁড়ে ফেলল, অনুগামীদের ওপর চালাল লাঠি আর ডাণ্ডা। তরোয়ালের উলটো পিঠের ঘা দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে সোজা দিকের ঘাও দিয়ে বসল দু একটা।

পেলাগেয়া আর সোফিয়ার হাতে এসে পড়ল বালক ইভান। সে বেশ জবর আঘাত পেয়েছে তরোয়ালের। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার দেহ। তবু তাই নিয়েই সে সমানে চিৎকার করছে—"মেহনতী জনতা জাগো।" সমানে ছুটছে মিছিলের সাথে।

ওরা তাকে জোর করে ধরে একটা গাড়িতে তুলে নিল। নিয়ে এল নিজেদের বাড়িতে। ডাক্তার এসে মুখ বাঁকাল। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে বলে গেল—নড়াচড়া একেবারে বারণ। ইভান মুচকি হাসে কথা শুনে।

তার পরের দিনই কিন্তু কাউকে না বলে সে ছেলে উধাও। তাকে পাঠচক্রে যোগ দিতে হবেই। পড়া বন্ধ করলে চলে কখনো?

আবার কাগজ ছাপা হয়েছে। লুদমিল্লার এখন অন্য ঝামেলা নেই, ইয়েগর মরে

গিয়ে তার কাজের বোঝা ওদিক দিয়ে হালকা হয়ে গিয়েছে। অন্য ঝামেলা নেই, তাই কাগজ তার হাতে দিয়ে এলেই প্রায় তক্ষুনি তা ছেপে বেরিয়ে যায়।

এবার সোফিয়া নেই বাড়িতে, সফরে বেরিয়েছে। দূরে দূরে শহরে শহরে ঘুরে বিপ্লবের জমিন তৈরি করাই তার কাজ। সোফিয়া নেই, কাগজ কে নিয়ে যাবে?

পেলাগেয়া বলল,—"তাতে হয়েছে কী? পথ তো চিনি আমি, একাই যাব?" নিকোলাই প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায় তার পানে।

একটা বাক্স বোঝাই কাগজ আর বই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করল। ওই বাক্সর জন্যই। যাতে ওটা পুলিসের দৃষ্টি না আকর্ষণ করে। ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রেলগাড়ি। যেখানে গিয়ে নামল, হিসাবমত, রীবিনদের আস্তানা সেখান থেকে পাঁচ ছয় মাইল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আজ রাত্রে বোধ হয় বাকী পথটুকু অতিক্রম করা সম্ভব নয়। অচেনা পথ, বনজঙ্গলের পথ, তাতে ভারী বাক্সটা রয়েছে, একজন মুটে সংগ্রহ না করে এক পা-ও নড়তে পারবে না পেলাগেয়া।

স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে সে বসে আছে, বাক্সটা বেঞ্চির তলায় নিয়ে। মন পড়ে আছে সুদূরের সেই জেলখানায়, যেখানে পাভেল, আন্দ্রিয়েইরা আবদ্ধ হয়ে আছে বিচারের প্রতীক্ষায়। বিচার? প্রহসন বললেই ঠিক হয়। বিচারের একটা অভিনয় হবে শুধু, বলেছে নিকোলাই আর সোফিয়া আর লুদমিল্লা। দণ্ড যে দেওয়া হবে, তা নিশ্চয়। কী দণ্ড যে দেওয়া হবে, তাও ঠিক হয়ে আছে। ঠিক করেছেন মস্কোতে বসে, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা। দেওয়া হবে দেশান্তর-দণ্ড। সাইবিরিয়ায় নিবাসন।

নিকোলাই বলছে—ওরা পালিয়ে আসবার ঢের সুযোগ পাবে সাইবিরিয়া থেকে। হয়ত সাইবিরিয়া যাওয়ার পথ থেকেই। মায়ের মনে ও কথা নিচ্ছে না। সুযোগ তো এখান থেকেই হতে পারত। পাভেলরা সুযোগ নেবে না। পালাবে না, পণ তাদের। ইচ্ছা থাকলে কি আর এতদিন পালাত না? এই তো সেদিন পালিয়ে এল ভেরশিচকভ। নিকোলাইরাই বাইরে থেকে সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। সে পালিয়ে এল পাঁচিল টপকে, দিন দুপুরে। তারপর এসে পড়ল লুদমিল্লার ফ্ল্যাটে। সেখান থেকে নিকোলাই তাকে চালান করে দিল শহরের বাইরে, সেখানে সে ছাপাখানায় কাজ করছে।

তাই ভাবো মা, পাভেলরা পালাবে না।

ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল সে, হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে সে চমকে উঠল। বহুলোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে—"মারো কেন? এমন করে মারবার হুকুম কোন আইনে নেই!"

কে কাকে মারে? ঘর থেকে বেরিয়ে উঁকি দিল মা। নীচেই রেল লাইন, তারপরে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে এক জনতা। তারা ঘিরে আছে তিন চারজন লোককে। তাদের ভেতর একজনকে বন্দী বলে ধরে নেওয়া যায়, কারণ তার হাত বাঁধা। বাকী সবাই পুলিস। পরনে তাদের সহকারী উর্দী, হাতে বন্দুক।

মায়ের বুকের ভেতরটায় একরাশ রক্ত লাফিয়ে উঠল উদ্দাম হয়ে। তারপরই তার সারা দেহ হিম হয়ে গেল যেন। এ সে কী দেখছে? ওই বন্দী রীবিন না?—হ্যাঁ, নিশ্চয়! কোন ভুল নেই। ওই সেই লালচে চাপদাড়ির ওপরে চোখা নাক আর ঝাড়ালো ভ্রূ।

বেচারীর হাত কেটে বসেছে বাঁধনের দড়ি। রক্ত চুইয়ে পড়ছে। তা সত্ত্বেও অকারণে মাঝে মাঝে পুলিসগুলো পিটছে তাকে। মাথায়, পিঠে, পায়ে, পেটে, না কোথায়?

এই প্রহারেরই প্রতিবাদ করেছে জনতা। সে-প্রতিবাদে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে পুলিসেরা। দূরে ছিল পুলিসসাহেব, সে গদাই-লশকরী চালে এগিয়ে এসে হাতের চাবুক দিয়ে পিটতে লাগল রীবিনকে। সে পড়েই যেত, কিন্তু জনতার ভেতর দু একজন তাকে ধরে ফেলল।

রীবিন এত মার খেয়েও কিন্তু জ্ঞান হারায় নি। সুযোগ পেলেই চেঁচিয়ে বলছে—"ভাই সব! আমি তোমাদেরই একজন। মেহনতী গরিব মানুষ। আমাদের অশেষ দুঃখ। আমরা খেতে পাই না, আমরা শীতের কাপড় জোটাতে পারি না, শিক্ষার অভাবে আমরা জানোয়ারে পরিণত হয়ে রয়েছি। আর আমাদের হাড়ভাঙ্গা মেহনতের পয়সা গিয়ে ঢুকছে জমিদার আর ব্যবসায়ীর পেটে, যে-সব কুড়ের সর্দার পেটমোটা শকুনি আমাদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, আর বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে চুমুকে চুমুকে।

এইসব দুঃখ-দুর্দশার কথা আমি মুখ ফুটে বলেছি বলেই আমার এই সাজা। স্বচক্ষে দেখছ তোমরা। এই যে রক্ত গড়াচ্ছে আমার গা থেকে, এ-রক্ত কি তোমাদেরও রক্ত নয় ভাই সব? আমার গায়ের ওপর এই বেধড়ক পিটুনি—এতে কি তোমাদেরও গায়ে ব্যথা লাগছে না?

আমার যা হবার, তা হচ্ছে, তা হবে। তোমরা শুধু এইটুকু দেখো যে আমি জেলের আড়ালে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিপ্লবের বাণী চুপ করে না যায়। তোমরা শুধু মনে রেখো যে চিরদিন যারা এত অত্যাচার করে এসেছে, তাদের ওপর শোধ তোলবার দিন এসেছে এবার।"

মারের ধমকে রীবিনের কথা বন্ধ হয়ে আসছে এক একবার, একটু যেই ছেদ পড়ছে তাতে, অমনি সে তারস্বরে শুরু করছে আবার। কথা বলতে বলতে এদিকে-ওদিকে শ্রোতাদের মুখের পানে তাকিয়েও নিচ্ছে মাঝে মাঝে। এমনিভাবে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ একবার বিশ্রামঘরের দোরগোড়াতে কাকে যেন দেখে সে একেবারে ভয়ানক চমকে উঠল। কথার খেই হারিয়ে গেল তার।

যাকে সে দেখেছে, সে আর কেউ নয়—পেলাগেয়া।

পেলাগেয়ার সঙ্গে চোখে চোখে বার্তাবিনিময় হয়ে গেল রীবিনের। সে যে কোন একজন চেনা লোকের দেখা পেয়েছে, এবং দেখা পাওয়ার জন্যই কথার মাঝখানে

আনমনা হয়ে চুপ করে গিয়েছে, একথা বুঝতেই বড় কেউ পারল না! অনেকেই ভাবল—অতিরিক্ত প্রহারের ফলেই কথা তার আটকে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

একটা লোক শুধু স্তেপান তার নাম, সে শুধু রীবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে পেলাগেয়ার দিকে তাকিয়েছিল। অবসরমত একবার সে রীবিনের কাছ ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল, এবং পুলিসেরা শুনতে না পায়, এমন চাপা গলায় তাকে জিজ্ঞাসা করল—"মহিলাটিকে চেনো বুঝি?"

রীবিন লোক চেনে। এ লোকের দ্বারা যে কোন ক্ষতি হবে না, তা সে বুঝতে পেরেছে। মাথা নেড়ে সায় দিল তার প্রশ্নে।

পুলিসের লোকেরা একখানা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এল এইবার, আর রীবিনকে তাতে তুলে নিয়ে শহরের দিকে চলে গেল। গাড়িতে উঠেও সে সমান তেজে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—"মেহনতী মানুষ জেগে ওঠো দিকে দিকে, ভেঙে ফেল হাতের শিকল পায়ের বেড়ী, নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নাও; আর কতকাল শোষক ধনীদের দেবে তোমাদের কলিজার রক্ত চুষে খেতে?"

গাড়ি চলে গেল রীবিনকে নিয়ে। জনতাও নানারকম আওয়াজ তুলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। উত্তেজিত হয়েছে সকলেই, তবে তা এক একজনের ভেতর প্রকাশ পাচ্ছে এক এক ভাবে। কেউ চেঁচিয়ে অভিশাপ করছে জারকে, কেউ চাপা গলায় অসন্তোষ জানাচ্ছে পাশের লোকটির কানে কানে।

ভিড় যখন একেবারে উবে গেল, তখন সেই স্তেপান উঠে এল পেলাগেয়ার কাছে—"তুমি কোথায় যাবে গো মা?"

আলাপ জমল। রীবিনের দলের লোক যে পেলাগেয়া, তা রীবিনই স্বীকার করে গিয়েছে। পেলাগেয়াও তা অস্বীকার করল না। স্তেপান বলল—"তুমি ওদের বনের আস্তানায় যেতে চাইছিলে। আজ রাত্রে তো যাওয়া সম্ভব নয়। গাড়ি বা মুটে কিছু পাবে না। নেকড়ের ভয় আছে পথে। কেউ বেরুবে না ও-রাস্তায় রাত ভোর না হলে।"

একটু থেমে বলল—"আর গিয়েই বা হবে কী? সেখানে গিয়ে কাউকে পাবে, ভেবেছ? একজনকে ধরে কী হাল করেছে, নিজের চোখে তো দেখলে। বাকী যারা ওখানে ছিল, তারা কি আর ওখানে বসে আছে কেউ? নিশ্চয় পালিয়েছে প্রাণের ভয়ে। ফিরবে দু চারদিন পরে।"

পেলাগেয়া এ আলোচনার ভেতর না গিয়ে শুধু বলল—"আজ রাত্রে তোমার বাড়িতে একটু থাকবার জায়গা দেবে আমায়?"

স্তেপান বলল—"সেই কথাই তো আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছিলাম এতক্ষণ। নেহাতই কুঁড়েঘর, তবু—হ্যাঁ, আশ্রয় বটে একটা। স্টেশান-ঘরে তো রাত্রে থাকতে দেবে না!"

পেলাগেয়ার বাক্সটা সে টেনে তুলল কাঁধে। বই কাগজে ভরতি বাক্স পেল্লায় ভারী। কিন্তু স্তেপান হেঁকে বলল—"এই একটা খালি বাক্স বইবার জন্য আবার মুটে খুঁজছ তুমি?"

উদ্দেশ্য শুধু এই যে কেউ যেন সন্দেহ না করে যে বাক্সর ভেতর সন্দেহজনক কিছু আছে।

সেই রাত্রে গাঁয়ের সব মজদুরেরা স্ত্রীপুরুষে মিলে চুপিচুপি এসে জমায়েত হল স্তেপানের কুঁড়েতে। শ্রমিক জাগরণের কথা নানাভাবে তারা পেলাগেয়াকে জিজ্ঞাসা করল। জিজ্ঞাসা করল—রীবিনের ইতিহাস, ওদের পার্টির বিবরণ। রীবিনের হাত দিয়ে কিছু কিছু কাগজপত্র এরা আগেও পেয়েছে, সেবারে সোফিয়ার সঙ্গে এসে পেলাগেয়াই দিয়ে গিয়েছিল ওই কাগজগুলো।

এবারও বাক্স খালি করে সব কাগজ এই পাড়াতেই বিলি করে দিয়ে গেল পেলাগেয়া। রীবিনও তো এদেরই দিত।

* * * *

বিচারের দিন এসে গেল এইবার। আদালতে লোকারণ্য। প্রধান বিচারপতি এক জীর্ণশীর্ণ বুড়ো। তাঁর সহকারী দুজনও প্রায় বুড়ো। সরকারী উকিল এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের সমুখে, পাভেলদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা যে কী তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। বিচারপতিদের পেছনে বসেছেন মেয়র, মার্শাল এবং আরও দু একজন পদস্থ ব্যক্তি।

পাভেলরা সারি বেঁধে এসে বিচারালয়ে ঢুকল, বসে পড়ল কাঠগড়ার ভেতর। দর্শকদের মধ্যে প্রায় সবাই ওদের আপনার জন। পাভেলের মা, সিজভের খুড়ো, সাময়লভের বাবা-মা দুজনেই—বস্তির কেউ আসতে বাকী নেই। আসামীরা ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। হাসির বিনিময়ে এপক্ষ থেকে ঝরছে চোখের জল।

বিচারক বললেন—"যদি কিছু বলতে চাও, আসামীরা একে একে বলতে পার।"

প্রথমে উঠল পাভেল। তার মুখ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা। সে যে আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারের দিন কী কী বলবে, তা অনেক দিন থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। তাই আজ তার কথার ভেতরে একটুও আড়ষ্টতা বা অস্পষ্টতা নেই। শ্রমিক সাধারণের যুগযুগব্যাপী যাতনার ইতিহাস তার মুখ থেকে জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এল যেন।

"পৃথিবীতে রুশ জাতি, জার্মান জাতি, ফরাসী জাতি বলে যে জাতিবিভাগ আছে, তার মূলে কোন সত্যিকার ভিত্তি নেই। আসল জাতিবিভাগ দুনিয়ায় আছে শুধু একটি দিক্ দিয়ে। ধনীজাতি আর গরিবজাতি। এই দু জাতিতে কোনদিন মিশ খাবে না। এদের সম্পর্ক হল যেন তেল আর জলের সম্পর্ক, কিংবা যেন খাদ্য আর খাদকের সম্পর্ক। সুতরাং খাদকের এজলাসে খাদ্যের বিচার যদি হয়, সে বিচার তো প্রহসন ছাড়া কিছু নয়!

আমাদের বলা হয়েছে যে, আমরা ইচ্ছা করলে কিছু বলতে পারি। কিন্তু বলে কোন লাভ আছে কি? বিচার-প্রহসনের পরেই যে দণ্ড দেওয়া হবে আমাদের তা তো আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে! মস্কো থেকে তো হুকুম এসে রয়েছে আদালতের নথির

ভেতরে! আমরা যতই বলি না কেন, নির্দোষিতার যত প্রমাণই দিই না কেন, সে-হুকুমের নড়চড় করবার ক্ষমতা কারও আছে কি? সুতরাং সে সব আমরা কিছুই বলব না।

শুধু বলব—অত্যাচারিত, শোষিত, দীনহীন গরিব জাতির উদ্দেশ্যে—তোমরা এক হও। সংঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াও! এই রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা উলটে দাও, তা নইলে মানুষের মত বাঁচবার অধিকার তোমরা কোনদিন পাবে না পৃথিবীতে।"



মা বাক্স খুলে কাগজগুলো মুঠো মুঠো করে ছুড়তে লাগল। [পৃঃ ১৮

একে একে সবাই উঠে পাভেলের কথারই প্রতিধ্বনি করল, এবং তার পরে বিচারপতিরা দণ্ডাদেশ ঘোষণা করলেন—'সাইবিরিয়ায় নির্বাসন'।

নিকোলাই ঘরে ফিরেই পাভেলের অগ্নিস্রাবী বক্তৃতাটা—যতদূর মনে ছিল, লিপিবদ্ধ করে ফেলল। তারপর পেলাগেয়াকে সেটা দিয়ে বলল—"এক্ষুনি লুদমিল্লাকে দিয়ে দাও' এটা ছাপিয়ে ফেলুক। আমি ততক্ষণে খুঁজে দেখি—কাকে দিয়ে ছাপা কাগজগুলো মস্কোতে পাঠানো যায়—বিলি করবার জন্য।"

পেলাগেয়া বলল—"খুঁজতে হবে না, সে-লোক সামনেই আছে। আমার ছেলের বক্তৃতা আমিই প্রচার করব। মস্কোতে, সেণ্টপিটার্সবার্গে। রুশ দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র।"

নিকোলাই কথা বলতে পারে না আর—ছেলেকে দেখে এসেছে আদালতের কাঠগড়ায়, মাকে দেখছে আঁধার গৃহকোণে। কে যে বেশী মহৎ, সে বুঝে উঠতে পারে না।

ছাপা কাগজ নিয়ে সেই দিনই পেলাগেয়া সন্ধ্যায় স্টেশনে হাজির হল মস্কোর ট্রেন ধরবার জন্য। কাগজ-ভরা স্যুটকেসটি পাশে নিয়ে বিশ্রামঘরে বসে আছে।

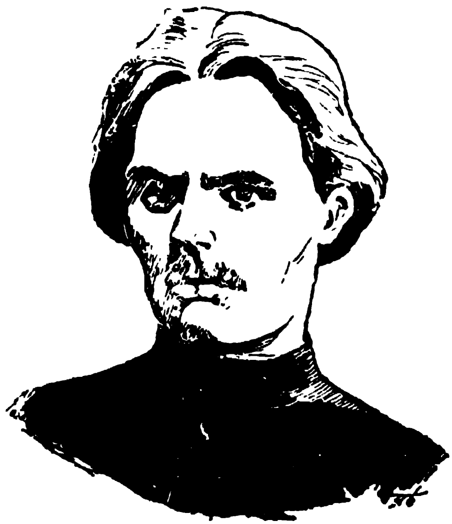
একটা লোক এসে পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। মা কেঁপে উঠল —এ চেনা লোক। স্পাই গোয়েন্দা! সোফিয়ার সঙ্গে একদিন বেড়াচ্ছিল মা, এই লোকটা ছায়ার মত ছিল পেছনে পেছনে। সোফিয়া বলেছিল—"লোকটা পুলিসের চর।"

লোকটা সরে গেল। মাও উঠে পড়ল। কাগজের স্যুটকেসটা ওইখানে ফেলে গেলে তার বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ থাকে না, কিন্তু তা কি সে ফেলে যেতে পারে? নিজের জীবনের চাইতে ওইসব কাগজের দাম তার কাছে বেশী। সে বেরিয়ে এসেই দেখে চারদিকে পুলিস ঘিরেছে তাকে। আর নিস্তার নেই এবার। সে তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে কাগজগুলো মুঠো মুঠো করে ছুড়তে লাগল জনতার মাঝখানে। ভিড়ের ভেতর কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কাগজের জন্য।

পুলিস এসে হাত চেপে ধরল তার। তখন কাগজ বিলি শেষ হয়ে গিয়েছে। মা এইবার চেঁচিয়ে বলতে লাগল—"মেহনতী জনগণ! জেগে ওঠো! ঐক্যবদ্ধ হও! গায়ের জোরে জন্মাধিকার আদায় করে নিতে হবে। জাগো! জাগো—"

পুলিসের হাত তার গলা চেপে ধরল। একটা অব্যক্ত অভিশাপ মায়ের মুখ থেকে বেরুতে বেরুতে মাঝপথে থেমে গেল। জনতার ভেতর কে যেন কেঁদে উঠল একটি বার।

লেখক-পরিচিতি



ম্যাক্সিম গোর্কি

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশদেশের নিজনি-নভোগরদ শহরে ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম হয়। তাঁর পারিবারিক নাম অবশ্য গোর্কি নয়, পেশকভ। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন, মাতাও পত্যন্তর গ্রহণ করে অন্যত্র চলে যান। শিশু ম্যাক্সিমোভিচের প্রতিপালনের দায়িত্ব গিয়ে পড়ে বৃদ্ধা মাতামহীর ওপরে। এই বৃদ্ধার এমন সঙ্গতি ছিল না যে ভাল করে নাতিটিকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেন। তা সত্ত্বেও ওকে মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠার সাহায্য তিনি দরাজ হাতেই করেছিলেন। কী করে? স্রেফ গল্প বলেই! রাজারাজড়ার গল্প নয়, ইতিহাস পুরাণের গল্প নয়, যে সব দীন-দরিদ্র মানুষের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে তাঁকে আসতে হত, তাদেরই গল্প বৃদ্ধা শোনাতেন তাঁর আদরের নাতিকে।

বালক ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করলেন, সর্বহারা রিক্ত মানুষদের ওপরে অসীম ভালবাসা নিয়ে। এই সময়ে মাতামহীর গৃহের অসহ্য দারিদ্র্য তাঁকে ঠেলে বার করে দিল পৃথিবীর পথে, নিজের ক্ষুধার অন্ন নিজে খুঁটে খাওয়ার জন্য। সারা রুশদেশ তিনি পরিক্রমা করে আসেন, জীবিকা সংস্থানের প্রয়োজনেও বটে, জন্মভূমিকে ভাল করে জানবার ও বোঝবার তাগিদেও বটে। হেন কাজ দুনিয়ায় নেই, যা তিনি এই সময়ে করেন নি। মুচির কাজ, মুটের কাজ, পাহারাওয়ালা, ফেরিওয়ালার কাজ, ক্ষেত-মজুর, কারখানার মজদুর, নৌকার মাঝি—প্রত্যেকের কাজ তিনি করেছেন।

সমাজের প্রতি স্তরে দুঃখী দরিদ্রের যে মর্মজ্বালার ছোঁয়া তিনি এই সময়ে পেয়েছিলেন, তা অবশেষে প্রকাশ পেতে শুরু করল তাঁর চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়, তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গল্প "চেলকাস" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে ক্রমে 'মাদার', 'মাই চাইল্ডহুড', 'বাইস্ট্যাণ্ডার', 'স্যাটার্ডে নাইট' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর লেখনী থেকে বেরুলো রুশদেশের নিপীড়িত জনগণকে বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। নব্য রুশের জাগরণের পেছনে লেনিনের চেয়ে গোর্কির অবদান কম ছিল না।

এ অবদানের স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছিলেন। রুশদেশের আপামর সাধারণের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র, একান্ত আপনার জন। তাঁর জন্মনগরী নিজনিনভোগরদের 'গোর্কি' নামকরণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়েছিল রুশদেশের অধিবাসীরা।

গোর্কির মৃত্যু হয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে।



ফর্সাইট সাগা

—গলস্‌ওয়ার্দি

হচপচ ক্লাবের নীচের হলে দাঁড়িয়ে বুড়ো ভদ্রলোকটি দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন-"মিস্টার জোলিয়ন ফর্সাইট কি এখনো এখানকার মেম্বার আছেন?"

"আছেন। ক্লাবেই উপস্থিত আছেন এখন। কী নাম বলব?"

"নাম?—নাম—মানে বল গিয়ে যে তার বাবা এসেছেন—"

দরোয়ান অবাক্ হল না শুধু এই কারণে যে দরোয়ানদের কোন-কিছুতেই অবাক্ হতে নেই। তা নইলে, অবাক্ হওয়ার কারণ তার যথেষ্টই ছিল। আজ পনেরো বছরের ভেতর মিস্টার ফর্সাইটের সঙ্গে দেখা করতে এ-ক্লাবে একটি প্রাণীও আসে নি। আজ একেবারে জলজ্যান্ত বাবা একটি!

কিন্তু দরোয়ানকে আর কষ্ট করে ওপরে যেতে হল না খবর নিয়ে। জোলিয়ন ফর্সাইটই নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—আজ পনেরো বছর পরে। দরোয়ান বেয়াদব নয়, সে দূরে সরে গিয়েছে।

"বাবা?"—বিস্ময়ের ঘোর কাটতে প্রায় আধ মিনিট লাগল যুবক জোলিয়নের। তারপর ঢোক গিলে সে বলল—"কেমন আছ বাবা?"

বুড়ো জোলিয়ন—পিতা পুত্র দুজনেরই এক নাম—কিন্তু ঢোক গিললেন না। একটু ক্ষীণ করুণ হাসি বুঝি ফুটে উঠল অধরকোণে। "তুমি বেরুচ্ছো বুঝি? চলত বাইরে গাড়ি আছে

গাড়ি চলেছে। ছাই রঙের দুটো তেজী ঘোড়া কদমে কদমে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় খটাখট শব্দে ঘোষণা করে চলেছে বুড়ো জোলিয়ন ফর্সাইটের কাঞ্চন-কৌলীন্য। এ-কৌলীন্য বেশী দিনের নয়। বুড়ো জোলিয়নের ঠাকুরদা কোনদিন লণ্ডনের মুখ দেখেন নি। চাষবাস নিয়ে পড়ে ছিলেন ইয়র্কশায়ারের পাড়াগাঁয়ে। তাঁর ছেলে, বুড়ো জোলিয়নের বাবা, লণ্ডনে এসে ঠিকাদারি শুরু করেন—ইমারত গড়ার ঠিকাদারি। তাইতে তিনি বেশ কিছু পয়সা করেন অবশ্য। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে-অর্থ যখন সমান ভাগ হয়ে গেল ছয় ছেলে আর চার মেয়ের ভেতরে, তখন এক এক ভাগে কত আর পড়েছিল ?

তবে ফর্সাইটেরা ছয় ভাই-ই আশ্চর্যরকম বিষয়বুদ্ধির দৌলতে নিজের নিজের জীবনেই অর্থসম্পত্তি রোজগার করেছেন আশাতীত রকম। বড় ভাই জোলিয়নের সাফল্য অবশ্য সকলের ওপরেই টেক্কা দিয়েছে। আজ তিনি কম করেও দু-লক্ষ পাউণ্ডের মালিক।

সংসার ? স্ত্রী মারা গিয়েছেন অনেক কাল। একমাত্র পুত্র এই সমুখে যুবা জোলিয়ন। ওকে ছোট-জোলিয়ন বলত সবাই সেকালে। ছোট জোলিয়ন ক্রমশঃ বড় হল, বিয়ে করল—একটিমাত্র মেয়ে রেখে বধূ গেল স্বর্গে। মেয়েটির নাম জুন। সেই ছিল এতদিন বুড়ো ঠাকুরদার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁর চোখের আলো, তাঁর বুকের স্পন্দন। সেই জুন—আচ্ছা, সে কথা পরে হবে।

ছোট জোলিয়ন আবার বিয়ে করল এবং বাধাল গেরো ! এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করল—যাকে সমাজে নিয়ে চলা যাবে না। তখনও শিরার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি, বুড়ো জোলিয়ন ভাবলেন—যায় ছেলে যাক, মর্যাদা ছাড়তে পারব না। ছোট জোলিয়ন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অবশ্য জুন রইল বাবার কাছে।

তারপর আজই প্রথম দেখা পিতাপুত্রে। বাবাই আগু বাড়িয়ে এসেছেন ছেলের কাছে। এর আগে দু একবার অর্থসাহায্য করবার চেষ্টা করেছিলেন ছেলেকে। ছেলে তা ফেরত পাঠিয়েছে, যদিও দিন চলে তার কষ্টেই। ছোট জোলিয়ন ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি-বাকরি কিছুই করে না, কাজের মধ্যে শুধু ছবি আঁকা। তাতে সামান্য কিছু নাম হয়ত হয়েছে ওর, কিন্তু আয় তাতে কতটুকু ?

গাড়ি চলেছে। সামনা-সামনি দুজন বসে অন্ধকারে। দুজনাই নীরব। এ নীরবতা অসহ্য ঠেকে। অবশেষে বুড়োকেই জোর করে'কথা কইতে হয়—

"জুনের বাগ্দান হয়ে গেল—"

"এরই মধ্যে ?"—অবাক্ হয়ে যায় ছোট জোলিয়ন—"বয়স তো তার—"

"তবু হয়ে গেল। হয়ে গেলে আর বলবার কী আছে ? সে গেছে তার ভাবী স্বামীর বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে—কী জানি ভাল শহরটার নাম—মফস্বলের ছোট্ট জায়গা একটা—লোকটার নাম বসিনি হে—তোমার ঠাকুরদা যা করতেন, সেই কাজ করে—ইমারত গড়ার কাজ। পয়সা ওতে আছে, কিন্তু ছোকরার তো এই সবে হাতে-খড়ি !

তা আমি বলে দিয়েছি—বছরে অন্ততঃ চারশো পাউণ্ড আয় যতদিন না হচ্ছে ওর—বিয়ে আমি হতে দেব না। আমি অবশ্য পয়সা যে না দিতে পারি, তা নয়। কিন্তু আশা করছি যে ছেলেটা এমন অমানুষ নয় যে শ্বশুরবাড়ির অর্থের ওপর ভরসা করে গেরস্থালি পাতবে—"

ছোট জুলিয়ন সব কথা শুনছে কি? বোধ হয় না। সে ভাবছে অন্য কথা। তার বাবা সেই ধরনের শক্ত মানুষ, যারা ভাঙে, তবু মচকায় না। জুন বাড়িতে নেই। নিঃসঙ্গ বাড়ি বৃদ্ধের অহংকারের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে আজ। মন-ভাঙা অভাগা বুড়ো আজ তাই বেরিয়ে পড়েছে পনেরো বছর আগে তাড়ানো ছেলেটাকে ধরবার আশায়।

পিতাপুত্রে সেই দেখাই শেষ দেখা নয়। এরপর একদিন ছোট জুলিয়ন চিড়িয়াখানায় এল নিজের দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে। বুড়ো জোলিয়ন সেখানে এসে জুটলেন অফিস-ফেরতা। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে কী মাতামাতি সেদিন! ছেলেটার নাম জোলিয়ন। সংক্ষেপে জোলি, মেয়েটার নাম হোলি। ছয় বছর আর পাঁচ বছরের দুটি ফুটফুটে শিশু। তাদের এরকম একটা বুড়ো ঠাকুরদা আছে—এমন স্নেহশীল, এমন আমুদে, তা এতদিন তাদের জানতে দেওয়া হয় নি বলে বাপের ওপর তাদের কী সে রাগ!

বুড়োকে নিয়ে তারা মশগুল একেবারে। একজন টানছে বাঁদরের ঘেরার দিকে, আর একজন টানছে পাখির ঘরের দিকে। হোলি বলে—"কুমির দেখাবে চল," আর জোলি বলে—"না দাদু, ভালুক দেখব।" বুড়ো জোলিয়ন আর বুড়ো নেই আজ, তাদেরই সমবয়সী বনে গিয়েছেন যেন। সমান ছোটাছুটি করছেন তাদের সঙ্গে। আর আবোলতাবোল বকছেন।

আর ছোট জোলিয়ন আলাদা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এই তিনজনের আজব খেলাধুলো দেখে ঘন ঘন রুমাল চোখে তুলছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। বাড়ি যেতে হবে। চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এল সবাই, গাড়ির খোঁজে। হুঁশিয়ার বুড়ো নিজের গাড়ি আজ সঙ্গে আনেন নি। আনলেই কোচম্যানের মারফত তাঁর গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু গোপন কথা তবু ফাঁস হল বইকি! পাঁচজনে একসাথে দাঁড়িয়ে আছেন, সমুখ দিয়ে একখানা বাদামী জুড়ি ছুটে গেল। বুড়োর চোখ জোলি হোলির দিকে, ছোট জোলিয়ন কিন্তু গাড়ির সওয়ারদের চিনল—কাকা জেমস ফর্সাইট, কাকীমা এমিলি, তাঁর মেয়ে নাতি নাতনী ইত্যাদি।

তারা কি দেখেছে? অবশ্য দেখেছে। না দেখলে কাকা হঠাৎ রুমাল দিয়ে মুখ আড়াল করলেন কেন? ছোট জোলিয়ন বাবাকে বলল—"কাকা জেমস গেলেন যে। সঙ্গে বাড়ির মেয়েরা সবাই!"

বুড়ো জোলিয়ন রেগে উঠলেন—"এত বড় লণ্ডন শহরটাতে এমন একতিল ঠাঁই কোথাও নেই, যেখানে মানুষ দুদণ্ড নিরিবিলি কাটাতে পারে? যেখানে যাব, সেখানে ফেউ! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি ওদের—"

একখানা গাড়ি ডেকে বুড়ো জোলিয়ন উঠে পড়লেন নাতি নাতনাদের কাছে সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে। সোজা চললেন—জেমস-এর বাড়ি নয়, সব-ছোট ভাই টিমথির বাড়ি। ফর্সাইট বংশের সব শাখার মিলনকেন্দ্র বল, আড্ডা বল—সব এই বাড়িতে। বাড়ির কর্তা টিমথির দেখা কদাচিৎ পাওয়া যায়। তিনি সদাই ওপরের ঘরে সুদের হিসাবে ব্যস্ত। অতিথিদের আপ্যায়নের ভার তাঁর তিন বোনের ওপর—দুজন চিরকুমারী, একজন বিধবা। চার ভাই বোনেরই বয়স আশির কোঠায়।

বসবার ঘরে তিলধারণের জায়গা নেই। এগারোখানা চেয়ার ঘরে, লোকও এসে গিয়েছে দশজন। একখানা চেয়ার খালি থাকবার কথা, তা নেই, তাতে অধিষ্ঠান করে রয়েছে বাড়ির বেড়াল টমি। টমিরই চেয়ার ওটা, সে ছাড়া তাতে কক্ষনো বসে না কেউ।

"এস, এস, এস—" সমস্বরে অভ্যর্থনা জানাল সবাই। জোলিয়ন সবচেয়ে বড় ভাই, সে-হিসাবে বংশের মুরুব্বী। তার ওপরে পয়সার জোরও তাঁরই বেশী এ-পর্যন্ত। ভবিষ্যতে হয়ত টিমথি তাকে ছাড়িয়ে যেতেও পারে, জেমস-এর ছেলে সোয়েমসও যে পারবে না—এমন কথা কে বলবে! কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। এখনও পর্যন্ত বুড়ো জোলিয়নই গোষ্ঠীর ভেতর মধ্যাহ্নসূর্য। তার ওপর তাঁর মেজাজ তিরিক্ষে, কাউকে খাতির করে কথা কওয়া তাঁর অভ্যাস নেই। কাজেই তাঁকে এই মুহূর্তে এ-ঘরে দেখে উপস্থিত সবাই বেশ সন্ত্রস্ত বোধ করলেন। আপ্যায়নের ঘটা সেজন্যই বেশী।

জোলিয়ন সোজা চলে গেলেন বোন অ্যানার দিকে, ইনি জোলিয়নেরও বড়, বয়স প্রায় পঁচাশি, ফর্সাইটগোষ্ঠীর সকলের ওপর সমান দরদ, সবাই ওঁকে মানেও সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে। জোলিয়ন গিয়ে তাঁকেই দুটি মিষ্টি কথা বলে সম্ভাষণ করলেন, তারপর চেয়ারের সন্ধানে এদিকওদিক চোখ ফেরাতেই দেখলেন যে টমি চেয়ার খালি করে দিয়েছে তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য। আসল কথা সে বেচারী ঘুমোচ্ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ পাশের ঘরে বাসন-কোশনের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ঘুমের ঘোরেই। যে কোন খাওয়ার সময় খাওয়ার ঘরটিতে উপস্থিত থাকা তার চিরদিনের অভ্যাস, ওতে তার ভুল হয় না কখনও। তাই সে ছুটেছে, এবং ছুটতে গিয়েই ধাক্কা খেয়েছে জর্জের বুটজুতোয়। জর্জ হল ফর্সাইটগোষ্ঠীর সেজো ভাই নিকোলাসের ছেলে, লম্বা-চওড়া দশাসই পুরুষ, কোথাও বসলে পা-দুখানা ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয় পাশের চেয়ারের তলা পর্যন্ত।

মিয়াঁও—একটা তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ টমির তরফ থেকে, ততক্ষণে তারই পরিত্যক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে জোলিয়ন বললেন—"এ বাড়িতে বেড়ালের বড় বাড়াবাড়ি, তারা খামকা অন্যের গায়ে পড়ে অশান্তি সৃষ্টি করে, যেখানে যাবার কথা নয় সেখানে যায়, যে-কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই—"

জোলিয়ন চেপে গেলেন। বেড়ালের মাথা-ঘামানো? ইঙ্গিতটা বড় স্থূল হয়েছে আড়চোখে একবার ভাই জেমস-এর পানে তাকালেন: সে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম

মুছতে ব্যস্ত। ওর জন্য একটু করুণা বোধ করলেন কি জোলিয়ন? তাইদের তিনি কম ভালবাসেন না। ওরা সবাই সক্ষম লোক, সমাজে ওদের স্বীকার করা যায় ভাই বলে। না, উনি ওদের দুঃখ দিতে চান না। কিন্তু তাই বলে তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে ওরা যেন আড়ি পাতবার মতলব না করে।

জোলিয়নের ইঙ্গিতটা বাস্তবিকই প্রত্যেকের গায়ে বিঁধেছে। কারণ, তিনি ঘরে ঢোকবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কথা নিয়েই আলোচনা করছিলেন সকলে। জেমস নিজে কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর স্ত্রী-কন্যারা—তাঁরা কথাটা আত্মীয়মহলে না জানিয়ে পারবেন কেন? এতদিন পরে দুটো ফুলের মত সুন্দর ছেলেমেয়ে—বাস্তবিক হাঘরে মায়ের এমন ফুটফুটে ছেলেমেয়ে কেমন করে যে হল—

পাছে অসাবধান হয়ে সেই কথারই জের কেউ টেনে বসে এই সময়, তাই অ্যানা বুড়ী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"শুনেছ জোলিয়ন, ভাই জেমস-এর ছেলে ওই সোয়েমস—লক্ষ্মীমন্ত ছেলে বাস্তবিক—বাড়ি করছে যে রবিন পাহাড়ে। জমি কেনা হয়েছে, ঠিকাদারি দিয়েছে ওই বসিনিকেই, আমাদের জুন যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তুমি কিছু শোনো নি বোধ হয়? জুন এসে অবিশ্যি বলবে। তা আমি বলি কি—এ ভালই হল। ঠিকাদারেরা তো মোটা কমিশন পায়, সেটা বংশের ভেতরই রইল। আর বাড়িটা যদি বসিনি ভালমত উতরে দিতে পারে ওরও নাম হবে, পসার হবে, দাঁড়িয়ে যাবে ও। তাই হোক, আমাদেরই বাড়ির জামাই যখন হতে যাচ্ছে ও—"

"কিন্তু সোয়েমস যে ওখানে একটা বাড়ি করতে যাচ্ছে কেন—আমি যদি কিছু বুঝতে পারি"—বিরক্ত ভাবে বলে ওঠে উইনিফ্রেড জেমস-এর মেয়ে, সোয়েমস-এর বোন। "একেই তো আইরিনের সাথে বনে না সোয়েমস-এর, তায় আবার শহর ছেড়ে রবিন পাহাড়ে গেরস্থালি পাতলে—"

জেমস-এর স্ত্রী এমিলি এমন কটমট করে তাকাতে লাগলেন উইনির পানে যে, সে বেচারী আর কথা শেষ করতে সাহস পেল না।

অ্যানা বুড়ী আবার এগিয়ে এলেন আলাপচারিটা চালু রাখার জন্য—"না না, উইনি, তুমি ভুল বুঝছ। আমি তো মনে করি—রবিন হিলে বাড়ি করার পেছনে আইরিনেরই আগ্রহ রয়েছে। আইরিনে আর জুনে কত ভাব, তা কি তোমরা জান না? বাড়ি করা, বাড়ির ঠিকাদারি জুনের হবু-স্বামীকে দেওয়া এ সব যদি আইরিনের মাথা থেকে না বেরিয়ে থাকে তো কী বলেছি আমি। ঠিকই তো! আপনার জন যদি আপনার জনকে না দেখবে, তাহলে তো পৃথিবীতে টেঁকাই যায় না!"

অ্যানার দুর্ভাগ্য! ভাল করতে গিয়ে তিনি মন্দ করে বসলেন। আইরিনের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে ঘা দিয়ে বসলেন জোলিয়নের অভিমানে। আপনার জন? আইরিন হল আপনার জন জুনের? বুড়ো জোলিয়ন বেঁচে থাকতেই? আইরিন মোড়লি না করলে,

জুনের স্বামী খেতে পাবে না? তিনি তিক্তস্বরে বলে উঠলেন—"গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। বাড়ি হচ্ছে কি না হচ্ছে, তাঁর ঠিক নেই! ওহে জেমস, তুমি কথা কইছ না যে? সত্যিই বাড়ি করছে না কি সোয়েমস? কত টাকায়?"

জেমস ধীরে ধীরে বললেন—"হচ্ছে বাড়ি, তা ঠিক। সোয়েমস-এর মুখ থেকে



জোলিয়ন তিক্তস্বরে বলে উঠলেন—

শুনি নি। শুনেছি বসিনির মুখ থেকে। মানে, কথাটা কানে এল যখন, আমি নিজেই চলে গিয়েছিলাম রবিন হিলে। বসিনির সঙ্গে দেখা সেখানে। জায়গাটা দেখালে। আট হাজারের ভেতর হবে বাড়িটা।"

আ-ট হাজার পাউণ্ড? কম তো নয়! তাহলে সোয়েমস তো পয়সা করেছে মন্দ নয়! জোলিয়ন উঠে পড়লেন। এদের ধমকচমক করবার জন্য আসা, সে-উদ্দেশ্য যথাসম্ভব সিদ্ধ হয়েছে। তাঁর ছেলে আর নাতি নাতনীদের সম্বন্ধে অন্য কারও কৌতূহল যে তিনি সহ্য করবেন না, বেড়ালের উপমা দিয়ে তিনি তা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন আবার এই এক চিন্তা এল—বসিনিকে নিয়ে। বসিনি নিয়েছে সোয়েমস-এর বাড়ির ঠিকাদারি। সোয়েমসকে জানেন তিনি। এ-ঠিকাদারির পরিণাম ভাল হবে না। আত্মীয়তার সূচনাতেই আত্মীয়বিচ্ছেদ হবে।

জোলিয়ন বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মাথায় ঘুরছে, আইরিন, সোয়েমস—বসিনি, জুন। জুনের ওপর রাগ হতে লাগল। বসিনি ছাড়া বিয়ে করবার আর কাউকে পেল না সে? একটা দীনদুঃখী ঠিকাদার, হোক সে স্থপতি, হোক সে শিল্পী—সোয়েমস-এর মত লোকের তাঁবেদারি করে যদি তাকে দিন গুজরান করতে হয়, তাহলে সে জুনকে কতখানি সুখে রাখবে?

২

লণ্ডন নগরী বলতে যে বিস্তীর্ণ এলাকাটিকে বোঝায়, তা থেকেও মাইল দশেক দূরে রবিন হিল। পল্লীঅঞ্চল, শস্যক্ষেত্রের পর গোচারণ মাঠ, কচিৎ দু একখানা করে বাড়ি, আর যেখানে সেখানে পাখির গানে মুখর বনভূমি!

পল্লীঅঞ্চলই বটে, কিন্তু বিচক্ষণ বিষয়ী লোকেরা ধরে ফেলেছেন যে পল্লীপ্রকৃতির দিন ঘনিয়ে এসেছে এখানে। শহর বাড়ছে এদিক পানেই, রবিন হিল আর দশ বিশ বছরের ভেতরই তার কুক্ষিগত হবে।

একটু অসুবিধা আছে। এখানকার বাসিন্দারা শহরের ব্যবসাকেন্দ্র থেকে একটু বেশী দূরে পড়বে। কিন্তু সে অসুবিধা নিরাকরণের উপায়ও বুঝি ওই দেখা যায়। ওই নতুন ধরনের গাড়িগুলো। মোটরগাড়ি যার নাম। ঘোড়ার দরকার হয় না, বাষ্পের বলে চলে। ঘোড়ার গাড়ির চাইতে অনেক জোরেই চলে। দেখতেও মন্দ নয়, চকচকে ঝকঝকে অতিকায় খেলনা যেন একখানা। অশ্বযানের গুরুগম্ভীর রাজকীয় চাল এদের নেই অবশ্য, কিন্তু কাজের মানুষ যারা, তারা চাল দিয়ে করবে কী? যাতে সময়ের সাশ্রয় হয়, তাই তারা চাইবে। হ্যাঁ, শহর বাড়লেই মোটরগাড়ির চাহিদা বেড়ে যাবে, দেখে নিও।

সোয়েমস অবশ্য এক্ষুনি মোটর কিনছে না, ঘোড়ার গাড়িতে চড়েই সে খুশী। কিন্তু মোটরে তার বিতৃষ্ণা নেই। বিশেষতঃ আইরিন যদি পছন্দ করে মোটর, কিনে ফেলবে একখানা। মুশকিল হয়েছে এই যে—কী যে আইরিনের পছন্দ, কী যে নয়, তা ভাবে বুঝে নিতে হবে, সে মুখ ফুটে বলবে না কিছু।

যা হোক, সোয়েমস-এর বাড়ির কাজ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। দেখে গিয়েছেন

ফর্সাইট মুরুব্বীরা অনেকেই। বাবা জেমস, কাকা সুইদিন, কাকা নিকোলাসের ছেলে জর্জ, এমন কি শেষপর্যন্ত একদিন স্বয়ং আইরিনও।

আইরিন এসেছিল কাকা সুইদিনের গাড়িতে। সুইদিন পেল্লায় লম্বা-চওড়া মানুষ, পাহাড়ে খানিকটা উঠতেই হাঁপিয়ে পড়লেন। বাড়ির সামনে বড় ওকগাছটার গোড়ায় বসে পড়লেন বিশ্রামের জন্য। আইরিনকে সব কিছু দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালো স্থপতি বসিনি। বসিনিকে এই বাড়ির সম্পর্কে প্রায়ই যেতে হয় সোয়েমস-এর বাসস্থানে। দেখা হয় আইরিনের সাথে, একটু ঘনিষ্ঠতাও বুঝি হয়েছে।

অন্ততঃ লোকে কানাঘুষা শুরু করেছে এরই মধ্যে। টিমথিকাকার বাড়িতে ফর্সাইটগোষ্ঠীর দশবিশ জন রোজই জমায়েত হয়ে থাকে, সে-সব মজলিশে আজকাল আইরিনের কথা ছাড়া কথা নেই। ও পছন্দ করে না সোয়েমসকে—অন্যায়। প্রায়ই বসিনির সঙ্গে ওকে এখানে সেখানে দেখা যায়—ঘোরতর অন্যায়।

অবশেষে বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেল। আর তক্ষুনি সোয়েমস আদালতে নালিশ করল বসিনির নামে। বসিনি যে পরিমাণ টাকায় বাড়ির কাজটি ঠিকা নিয়েছিল, খরচ করে বসেছে তার চেয়ে কয়েক শো পাউণ্ড বেশী। সে-টাকা ফেরত দিতে হবে বসিনিকে।

আদালত হুকুম দিল—বসিনি তিনশো পাউণ্ড ফেরত দিক।

সেই রাত্রেই বসিনির মৃতদেহ পাওয়া গেল শহরতলির এক রাস্তায়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এটা, না আত্মহত্যা—পুলিস বা ডাক্তার কেউ বলতে পারল না।

সেই খবর যখন সোয়েমস-এর বাড়িতে আইরিনের কাছে পৌছোলো, সে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করল জন্মের মত। কারণ? কে বলবে?

আইরিন চলে গেল যখন, সোয়েমস আর রবিন হিলের বাড়িতে গিয়ে বসবাস করতে উৎসাহ বোধ করল না। একা কখনো অতবড় বাড়িতে থাকা যায়? আর অমন নিরালা জায়গায়? সে বাড়িটা বেচে দেবার সঙ্কল্প করল।

খরিদ্দার সহজেই পাওয়া গেল। দূরের লোক নয়, তারই আপন জেঠা জোলিয়ন।

জোলিয়ন যখন নতুন বাড়িতে উঠে এলেন, সঙ্গে জুন তো এলই, আরও এল তাঁর ছেলে ছোট জোলিয়ন সপরিবারে। ছোট জোলিয়নের দ্বিতীয়া স্ত্রী, যাকে এতদিন সমাজে চালাবার চেষ্টাই কেউ করে নি, অবশেষে শ্বশুরের গৃহে স্থান পেল একটু। কিন্তু এর ফলে ফর্সাইট বংশের অন্য শাখাগুলির সঙ্গে রবিন হিল শাখার যেন একটা বিচ্ছেদ ঘটে গেল তলে তলে। বুড়ো জোলিয়ন আগে জুনকে নিয়ে ভাইদের বাড়িতে যেতেন, এখন আর যান না। বুড়ো জোলিয়নের ভাইয়েরা বোনেরা ভাইপোরা ভাইঝিরাও আগে আসত তাঁর গৃহে, এখন আর আসে না। কার্যতঃ জ্যেষ্ঠ ফর্সাইট যেন একঘরে হয়ে পড়লেন।

অ্যানা দিদির মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যে, তা নইলে সে বুড়ী অন্ততঃ জোলিয়নদের ত্যাগ করত না, সে ফর্সাইট বংশের সবাইকে ভালবাসত সমানভাবে।

জুনের বাগ্‌দান হয়েছিল বসিনির সঙ্গে। বসিনির মৃত্যুর পরে সে যেন উদাসিনীর মত হয়ে গেল। সমাজে মেশবার, আমোদ-আহ্লাদের কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবারই উৎসাহ তার নিবে গেল।

তাকে নিয়ে বুড়ো জোলিয়নের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। অনেক ভেবে তিনি জুনকে দেশভ্রমণে পাঠালেন শেষপর্যন্ত। ফরাসী দেশ, স্পেন, ইতালি—এসব দেশে আবহাওয়া চমৎকার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অপরিসীম, তা ছাড়া ঐতিহাসিক কীর্তি স্থাপত্য শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন—ভূরি ভূরি প্রতি শহরে। সব দেখে এলে অবশ্যই এই মনমরা ভাবটা সে কাটিয়ে উঠতে পারবে।

একা গেল না জুন। তার বাবা গেল এবং বিমাতাও। ছোট জোলিয়নের এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর স্বাস্থ্য অনেকদিন আগেই ভেঙেছে, এই বায়ুপরিবর্তনে তারও উপকার হবে, সন্দেহ নেই।

বুড়ো জোলিয়ন রবিন হিলের প্রাসাদে রইলেন ছোট্ট নাতনী হোলিকে নিয়ে। নাতি জোলিকে এবারে পাঠানো হয়েছে দূরবর্তী এক বড় স্কুলে, সে সেখানেই থাকে।

আবার যে একা, সেই একা। তবু ওই নাতনীটা আছে, আর কুকুর বেলশাজার আছে, তাদের সাথে খেলাধূলা করে দিন একরকম করে কাটিয়ে দেন বুড়ো জোলিয়ন। শহরে কদাচিৎ যান, কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন, শক্তির অভাব হয়েছে বলে নয়, ভাল লাগে না বলে। কাজের ভেতর আগেকার সে জৌলুশও নেই আর। দিনকাল পালটে যাচ্ছে। অনেকগুলো কোম্পানির তিনি চেয়ারম্যান। এ-যাবৎ তিনি যা বলেছেন, তাই হয়েছে। অংশীদারেরা টঁ্যা-ফুঁ করে নি কখনও। কিন্তু ইদানীং কথায় কথায় প্রতিবাদের সুর ঝংকার দিয়ে উঠছিল প্রতি অধিবেশনে। ভোটাভুটি পর্যন্ত গড়াচ্ছিল এক এক সময়। অবশ্য শেষ দিন পর্যন্ত জোলিয়ন অপ্রতিহতভাবে প্রভুত্ব খাটিয়ে এসেছেন প্রতি কোম্পানিতে। কিন্তু আর বেশী দিন চেয়ার আঁকড়ে থাকলে কী হত বলা যায় না। বুদ্ধিমান্ জোলিয়ন সময় থাকতে মানে মানে সরে এসেছেন। লোকসান হয় নি কিছু। শেয়ার সব চড়া দামে ছেড়েছেন, নগদ অর্থের আণ্ডিল হয়ে এসে বসেছেন নিভৃত বাসে।

তবু শান্তি নেই যেন—বড় নিঃসঙ্গ। হোলিটার পড়াশুনা আছে, নাচ-গান সেলাই-ফোঁড়, না আছে কী? তার ফরাসী শিক্ষয়িত্রীই প্রায় সারাদিন আটকে রাখে তাকে। ভারী রাশভারি মহিলা, জোলিয়ন সাহসই পান-না—শিক্ষয়িত্রীর অমতে হোলিকে পাঁচ মিনিট কাছে ধরে রাখতে।

সুতরাং জোলিয়নের বুড়ো বয়সের সঙ্গী একমাত্র কুকুর বেলশাজার।

তাকে নিয়েই, কখনো জোলিয়ন ওকগাছের তলায় চেয়ারে বসে থাকেন, কখনো প্রাসাদের বিস্তীর্ণ হাতার ভেতর এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান।

এমনি একদিন ঘুরছেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে, হঠাৎ দেখতে পেলেন—একটা কেটে-নামানো

গাছের গুঁড়ির একাংশ পড়ে আছে গোলাপঝাড়ের ওধারে—সেই গুঁড়ির ওপরে আসীন দেখতে পেলেন একটি মহিলাকে।

রেগেই গেলেন জোলিয়ন। এ তো অনধিকার প্রবেশ! তাঁকে না জানিয়ে তাঁর বাগানে বাইরের লোক আসবে কেন? দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেবার জন্যই জোলিয়ন এসে দাঁড়ালেন মহিলার সমুখে।

মহিলা যেন ধ্যানস্থ ছিলেন এতক্ষণ। জোলিয়নকে লক্ষ্যই করেন নি। দৃষ্টি তাঁর বাড়িটার উপরেই নিবদ্ধ।

সে-দৃষ্টি অবশেষে জোলিয়নের ওপর পড়ল যখন, একটু লজ্জিত দুঃখিত ভাবেই মহিলা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন—"অনধিকার প্রবেশের জন্য আমায় তিরস্কার করতে পারেন—"

জোলিয়নের মুখ থেকে ক্রোধের চিহ্ন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—কোমল স্বরে তিনি বললেন—"না মা, এ-বাড়িতে প্রবেশের অধিকার সদাই আছে তোমার। কতক্ষণ এসেছ? চল, চারদিক ঘুরিয়ে দেখাই তোমায়।"

চিনেছেন জোলিয়ন। এ আইরিন, সোয়েমস-এর গৃহত্যাগিনী পত্নী। লুকিয়ে এসে বাড়িটা দেখছে। কেন? জোলিয়নের খামকাই মনে হয়—বসিনির স্মৃতি বাড়িটার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বলেই বোধ হয়।

এমন মানুষের ওপর কি কঠোর হওয়া যায়?

জোলিয়ন আইরিনকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন সব। বাড়ি কেনবার পরে অনেক কিছু নতুন জিনিস তিনি এখানে করেছেন। ফুলবাগান, সবজিবাগান, পুকুর, গোয়াল—

মাঝে মাঝে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কথা কইছেন দুজনে। আইরিন চিরদিনই ডাকসাইটে সুন্দরী। এই কয়েক বৎসরের অজ্ঞাতবাস যেন তার সৌন্দর্যকে এক তপস্বিনীর মহিমায় মণ্ডিত করেছে। স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধা আসে তার দিকে তাকালে।

সবকিছু দেখানোর পরে আইরিনকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন জোলিয়ন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। না খেয়ে যেতে পারবে না আইরিন। ডিনার এখনই আসবে। রাত্রি হয়ে যাবে? তা যাক, জোলিয়নের গাড়ি আইরিনকে পৌঁছে দেবে শহরে।

ডিনারের পর পিয়ানোতে গান গেয়ে শোনাল আইরিন। গানে সে ওস্তাদ। একটার পর আর একটা, বুড়োর আর সাধ মেটে না। আসর যখন ভাঙল, তখন বুড়ো জোলিয়ন মন্ত্রমুগ্ধ। আবেগের সঙ্গে আইরিনকে বললেন—"মা! মাঝে মাঝে এসো, আমি বড় নিঃসঙ্গ। তোমার সময় কাটে কেমন করে?"

আইরিন মৃদু হেসে বলল—"গান শেখাই কয়েকটি ছেলেমেয়েকে। বাদবাকী সময়ে অন্য একটা কাজ করি—যে সব অভাগিনী নারীর আশ্রয় নেই, অন্নবস্ত্রের সংস্থান নেই,

তাদের কাছে যাই। সত্যিকারের সাহায্য করার সামর্থ্য আমার নেই, তবু মুখের কথায় যেটুকু সান্ত্বনা দেওয়া যায়—"

জোলিয়ন একখানা চেক দিলেন আইরিনের হাতে, পঞ্চাশ পাউণ্ড—"এইবার সত্যিকার সাহায্যও কিছু কিছু করতে পারবে।" আইরিনের চোখে জল এল কৃতজ্ঞতায়।

আইরিন চলে গেল।

দিন দুই পরে তার দান হীন ফ্ল্যাটে জোলিয়ন গিয়ে উপস্থিত। লণ্ডনের এক দরিদ্র পাড়ায় আইরিন থাকে। সে-রাত্রে জোলিয়নেরই গাড়ি আইরিনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে, কাজেই কোচম্যান বাড়ি চেনে।

আইরিন তার আশ্রয়হীন প্রতিপাল্যদের দু একজনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, অর্থাৎ জোলয়নের দানের অর্থ থেকে কিছু কিছু দিচ্ছিল তাদের। এসব দানধ্যানের দুর্বলতা থেকে জোলিয়ন চিরদিনই মুক্ত ছিলেন, আজ কিন্তু দরিদ্র নারীগুলির মুখে কোমল কৃতজ্ঞতার সজল আভাস দেখে তাঁর কী জানি কেমন মনে হল—"আমার তো অনেক আছে! আইরিনের হাত দিয়ে এদের কিছু দিলে তো হয়!"

সেই থেকে প্রায় নিত্যসঙ্গী হল আইরিন। হোলিকে গান শেখাবার ভার আইরিনকেই দিলেন জোলিয়ন। আইরিন অপরাহ্ণে আসে রেলগাড়িতে রবিন হিলে। সেই গাছের গুঁড়িটার ওপরেই বসে থাকেন জোলিয়ন তার প্রতীক্ষায়। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় সেখানে। তারপর আইরিনকে হোলির কাছে পৌঁছে দিয়ে ওকগাছের নীচে চেয়ারে বসে থাকেন তিনি। আইরিন গান শেখায় ডিনারের আগে পর্যন্ত। তারপর জোলিয়ন তাকে নিয়ে খেতে বসেন। খাওয়ার পর আইরিন গান শোনায় জোলিয়নকে। তারপর গাড়ি গিয়ে আইরিনকে পৌঁছে দিয়ে আসে তার লণ্ডনের ফ্ল্যাটে।

একটা মাস কী আনন্দেই যে কাটল বুড়ো জোলিয়নের। জীবনের সবচেয়ে আনন্দ-ভরা একটা মাস। কিন্তু সব আনন্দের মত এ আনন্দেরও শেষ হয়ে এল একদিন। দেশভ্রমণ শেষ করে ছোট জোলিয়ন ফিরে আসছে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে। আইরিন মলিন হাসি হাসি হেসে বলল—"কাল থেকে আমার ছুটি তাহলে!"

বুড়ো জোলিয়ন বললেন—"কেন? কেন? ওরা এলেও তোমার অসুবিধা কী? তুমি হোলিকে গান শেখাবে, যেমন শেখাচ্ছ!"

আইরিন মাথা নাড়ল,—তারপর মাথা নীচু করে বলল—"না, জেঠা তা হয় না! একটা কথা ভাবুন। জুনের বাগ্‌দান হয়েছিল বসিনির সঙ্গে। সেই বসিনির নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িত হয়ে একটা কথা উঠেছিল। অনেকের ধারণা বসিনির মৃত্যুর কারণই আমি। এ ধারণার ভেতর সত্য কিছু আছে কিনা, তার বিচার করতে যাওয়া অবান্তর। জুন আমাকে ক্ষমা করবে না কোনদিন। সুতরাং আমাকে রোজ রোজ এখানে দেখলে সে কি কখনো খুশী হতে পারে?"

কিন্তু জোলিয়ন কিছুতেই বুঝবেন না। আইরিন যদি না আসে, তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাই শক্ত হবে। আনন্দ কাকে বলে, এক মাস আগে তিনি জানতেন না। সেই আনন্দের আস্বাদ একবার যখন পেয়েছেন, তখন তা থেকে নিজেকে কোনমতেই তিনি বঞ্চিত করতে পারেন না। আইরিনকে আসতে হবে, হবেই!

বৃদ্ধের অস্বাভাবিক জেদের সমুখে আইরিনকে নত হতে হলই। মমতাবশতঃই সে তার আকুতিকে বিমুখ করতে পারল না।

আইরিন আসবে। দুপুরবেলায় বুড়ো জোলিয়ন সেজেগুজে এসে একতলার চেয়ারটিতে বসেছেন। ওই পথ ধরে আইরিন আসবে, রোজ যেমন আসে। পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে আছে জোলিয়নের অন্তর।

ঘুম পাচ্ছে বসে বসে। পায়ের তলায় বেলশাজার শুয়ে আছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে জোলিয়ন চোখ বুজলেন। চোখ বুজে ভাবছেন--এইবার আসবে আইরিন—মমতাময়ী সৌন্দর্যময়ী আইরিন—আসছে সে! আসছে ওই!

সত্যিই আইরিন আসছে—

হঠাৎ বেলশাজার কেঁদে উঠল কেন? লাফিয়ে চেয়ারের দু হাতলের ওপর সমুখের দু পা তুলে দিয়ে প্রভুর মুখখানা শুঁকল কেন একবার? তারপর—আবার কান্না—বুকফাটা হাহাকার—

আইরিন দৌড়ে এল। নেই, জোলিয়ন নেই আর।

৩

কয়েক বৎসর পার হয়ে গিয়েছে।

বুড়ো জোলিয়নের উইল পড়ে সারা ফর্সাইটগোষ্ঠী তাজ্জব বনে গিয়েছিল। কারণ সে উইলে আইরিনের জন্য বরাদ্দ ছিল পনেরো হাজার পাউণ্ড, যার বার্ষিক উপস্বত্ব হল চারশো পাউণ্ডের ওপর।

তারই বলে আইরিন এখন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে, ছেলেমেয়েদের গান শিখিয়ে জীবিকানির্বাহ আর তাকে করতে হয় না।

উইলের একমাত্র অছি ছোট জোলিয়ন। কাজেই আইরিনের সাথে ছোট জোলিয়নের খানিকটা মেলামেশা করতে হচ্ছে বইকি! এদিকে জোলিয়নের দ্বিতীয়া স্ত্রী মারা গিয়েছেন, রবিন হিলের বাড়িতে গৃহিণী এখন জুন।

জুন আর বিবাহ করবে না। তার এক বাতিক আছে দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য করা। ঠাকুরদা তাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়ে গিয়েছেন, তাই দিয়ে সে তার এ শখ মেটায়। কোথায় কোন্ সাহিত্যিক খেতে পাচ্ছে না, কোথায় কে অপরিচিত চিত্রকর ছবির প্রদর্শনী খুলতে পারছে না, খুঁজে খুঁজে জুন তাদের কাছে গিয়ে হাজির হবে আর গাঁটের পয়সা খরচ করে, তাদের জন্য যা-কিছু দরকার সব করবে।

এই সময়ে বাধল বুয়র-যুদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকায়। বুয়রেরা বলে—"হটো ইংরেজ, আমাদের দেশে আমরা তোমাদের চাই না।"

ইংরেজ বলে—"তা কখনো হয়? তোমাদের দেশ আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে কতকগুলো। তাতে করে বাণিজ্যগত এবং অন্য অন্য রকম কতকগুলো সুবিধা আমাদের প্রাপ্য। সে দাবি ত্যাগ করতে পারি আমরা কখনো?"

বুয়রেরা বলে—"তোমরা প্রবল ছিলে, আমরা দুর্বল। সেই সুযোগে চুক্তি তোমরা চাপিয়ে দিয়েছিলে আমাদের ওপর। এখন আমরা আর তত দুর্বল নই। ও-সর্বনাশা চুক্তি আমরা মানব না। জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য, জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য আমরা লড়ব।"

ইংরেজ বলে—"লড়ে দেখ। আমরাও নিজের স্বার্থ বলি দিতে পারি না। যা পেয়েছি, তা ত্যাগ করব কেন?"

অতএব যুদ্ধ বাধল। জোলিয়নের একমাত্র পুত্র জোলি অক্সফোর্ডে পড়ে, সে ভলান্টিয়ার হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গেল। আর গেল—সোয়েমস-এর বোন উইনিফ্রেডের ছেলে ডার্টি। জোলিরই সমবয়সী ছেলে।

তারপর জুনও গেল দক্ষিণ আফ্রিকায় নার্স হয়ে। এবং একেবারে আশ্চর্য ব্যাপার, তার সঙ্গে গেল কিশোরী হোলি। নার্সগিরির অজুহাতেই গেল অবশ্য, কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য অন্য। সে ডার্টিকে বিবাহ করতে চায়। যুদ্ধ যতদিন চলে চলুক, ইতিমধ্যে ওইখানেই সে বিবাহটা সমাধা করে ফেলবে।

হয়েও গেল তা। কিছুদিন পরেই জোলিয়নের কাছে খবর এল—হোলির বিবাহ হয়ে গিয়েছে। বিবাহের পর ডার্টি চলে গিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে, হোলি চলে গিয়েছে সামরিক হাসপাতালে, নার্সগিরি করার জন্য।

আরও খবর এল। সে খবর একেবারে হৃদয়টা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল জোলিয়নের। জোলি মারা গিয়েছে। যুদ্ধে নয় টাইফয়েডে।

* * *

রবিন হিলের প্রাসাদপুরীতে জোলিয়ন একা। ছবি আঁকে। পটুয়া হিসাবে কিছু নাম তার হয়েছে। পয়সাও কিছু হয়। কিন্তু পয়সার অভাব তার নেই। বুড়ো জোলিয়ন তাকে চিরদিনের জন্য অভাবের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে গিয়েছেন।

আরও একটি কাজ করে গিয়েছেন বুড়ো জোলিয়ন। আইরিনের সঙ্গে একটি যোগসূত্র বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন তার। যোগসূত্রটি বড়ই ক্ষীণ, তিন মাস পরে পরে সুদের অর্থটা আইরিনের কাছ পৌঁছে দিলেই তার কর্তব্য শেষ। তার বেশী কিছু করবার কথা কোনদিন মনে হয় নি জোলিয়নের।

মনে পড়িয়ে দিল সোয়েমস।

সোয়েমস খাঁটি ফর্সাইট। ফর্সাইট কর্তারা সবাই পয়সা বানানোর ওস্তাদ ছিলেন: তাঁদের সবাইয়ের অর্থকরী প্রতিভা যেন একসাথে এসে মিলেছে সোয়েমস-এর ভেতরে। সে ধুলোমুঠো ধরলে তা সোনামুঠো হয়ে যায়। অগাধ অর্থ সে নিজে উপার্জন করেছে, রোজই করছে। তার ওপর, পিতা জেমস-এর অন্তিম অবস্থা, তাঁরও প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারী একা সোয়েমসই।

এখন কথা এই—এ রাজৈশ্বর্য ভোগ করবে কে? তার নিজের মনে হয়—বংশে একটি ছেলে দরকার। জেমসও মনে করেন সোয়েমস-এর একটি ছেলে দরকার। সোয়েমস-এর বয়স পঞ্চাশের বেশী হয় নি। সে আবার বিবাহ করুক।

বিবাহ? সোয়েমস ভাবে—আর একটা বিবাহ না করে যদি আইরিনকে ফিরিয়ে আনা যায়, মন্দ কী হয়? আইরিনের সাথে তার বিবাহবিচ্ছেদ তো কোনদিনই হয় নি! দুজনে আলাদা বাস করেছে আজ সতেরো বছর, কেউ কারও খবর রাখে নি। কিন্তু তাতে হয়েছে কী? একসাথে বাস করার অধিকার তো আর নষ্ট হয় নি তাতে! সোয়েমস উকিল মানুষ, আইন ভালই জানে।

আইরিন কোথায় থাকে, তা সে জানে না। কিন্তু খুঁজে বার করা সহজ। ওই জোলিয়ন তার আছে। ও নিশ্চয় তার ঠিকানা জানে।

সোয়েমস গিয়ে দেখা দিল জোলিয়নের বাড়িতে রবিন হিলে।

কত কথা মনে হয়। আইরিনকে নিয়ে বসবাস করবে—এই আশায় সোয়েমসই তৈরি করিয়েছিল এই সুরম্য ভবন। আছে—বাড়িটা আছে। কিন্তু কোথায় সোয়েমস, কোথায় আইরিন। বাড়ির পরিকল্পনাতে যারা তিলমাত্র অংশ নেয় নি, তারা এখন এর অধিকারী। আর সোয়েমস এসেছে সেই উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা অধিকারীর কাছে আইরিনের খবর নিতে।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দুজনে। সোয়েমস আর জোলিয়নে। খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাই। বয়সও দুজনের একই, পঞ্চাশের কাছাকাছি। এক্ষেত্রে বান্ধবতার সম্বন্ধই গড়ে ওঠা দরকার ছিল ওদের মধ্যে, তা কিন্তু গড়ে ওঠে নি, দুজনের প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য। সোয়েমস মনেপ্রাণে খাঁটি ফর্সাইট। মালিকানার দিকে আঠারোআনা লক্ষ্য। জোলিয়ন ফর্সাইট বংশের ছেলে হয়েও কেমন যেন ও-দলের বাইরে। শিল্পী ও। হা! হা! হা!—শিল্পী। হাস্যকর! যার বাইশটা কোম্পানির চেয়ারম্যান হওয়ার কথা, সে হয়েছে শিল্পী! সে ছবি আঁকে!

ছবি? সোয়েমসও ছবি ভালবাসে। অনেক ছবি সে কিনেছে। তার বাড়ির একটা বড় ঘর ছবিতেই ঠাসা। সোয়েমস সে-ঘরে গিয়ে বসে রোজই একবার। ছবি দেখে। ভালই লাগে ছবি দেখতে। কিন্তু আঁকা? ছবি আকবার কথা সে চিন্তা করতে পারে না। যেমন পারে না—পুডিং তৈরি করবার কথা চিন্তা করতে, যদিও খেতে সে ভালবাসে পুডিং। ওতে পয়সা নেই, ছবি আঁকতে বা পুডিং বানানোতে। অন্যে করুক এ-সব মাথা আর গতর

খাটিয়ে। সোয়েমস ততক্ষণ দেদার পয়সা রোজগার করে ফেলবে। রোজগারের পর তা থেকে দু-চার শিলিং অবহেলায় ছুড়ে দেবে, ছবিওয়ালা বা পুডিংওয়ালার দিকে, ব্যস, অন্যের সৃষ্টি তার নিজের হবে।

এক কথায় বলা যায়—সোয়েমস ভোগী, জোলিয়ন স্রষ্টা।

জোলিয়নকে দিতে হল আইরিনের ঠিকানা। কিন্তু দেবার পর থেকেই সে অস্বস্তি বোধ করতে থাকল। নিশ্চয় এ পাষণ্ডটা আইরিনকে কোন-না-কোন রকমে জ্বালাতন করার তালে আছে। আগে থেকে বেচারীকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত। জোলিয়ন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। এখনও ঘোড়ার গাড়ি বজায় রেখেছে জোলিয়ন। যদিও আশেপাশে সবাই মোটর চড়ছে আজকাল। জোলিযনও মাঝে মাঝে ভাবে—মোটর থাকলে কাজ করা যায় চটপট। তবে চটপট কাজ করার তাগিদ তার কদাচিৎই আসে—এজন্যই ঘোড়ার গাড়ি এখনও টিকে আছে তার বাড়িতে।

আইরিন খুশী হল জোলিয়নকে দেখে, ততোধিক ত্রস্ত হল সোয়েমস-এর ঘটনা শুনে। কী এর মানে? এতদিন পরে—সাতেরো বছর পরে এ আবার কী উৎপাত! সুখেই কাটছিল আইরিনের জীবন, আর বুঝি অত সুখ সইলো না।

সোয়েমস এল যথাসময়ে।

প্রথমে মিষ্টি আবেদন—"এসো ফিরে আমার ঘরে। ভুল বোঝাবুঝি কি হয় না? তার জন্য দুটো জীবন পঙ্গু হয়ে যাবে, এটা উচিত নয়। মিলেমিশে আবার সুখের নীড় বাঁধা যাক—"

আইরিন সাড়া দেয় না।

তারপর অধিকারের দাবি—"আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয় নি। হওয়ার মত কারণও নেই কিছু। আইনের চোখে আমরা এখনও স্বামি-স্ত্রী। স্বেচ্ছায় না এলে আমি তোমাকে জোর করে ধরে আনব আইনের সাহায্যে—"

আইরিন তবু অটল।

সোয়েমস একটা হীরের গয়না নিয়ে এল একদিন—আইরিনের জন্মদিনের উপহার। আইরিন ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে দিল সে গয়না। সোয়েমস রেগে গেল। রূঢ় ব্যবহার করল।

ফলে আইরিন লণ্ডন ছেড়ে চলে গেল প্যারি। ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে গেল জোলিয়নকে, কারণ তাকে তো সুদের অর্থ পাঠাতে হবে!

সুদের অর্থ নিয়ে জোলিয়ন নিজেই চলে গেল প্যারিতে। সেখানে আইরিনের সঙ্গে প্যারি শহর দেখে বেড়ালো। অনেকবারের দেখা জায়গা নতুন রকম লাগে আজ, আইরিন সঙ্গে আছে বলে।

একটি অপরিচিত মহিলা প্রায়ই বেড়াতে বেরোন ওদের পেছনে পেছনে। কোথায়

থাকেন তিনি—বোঝা যায় না। কিন্তু রাস্তায় বেরুলেই দেখা যায় তিনি অল্প দূরে অনুসরণ করছেন।

আইরিন বলে- "গোয়েন্দা লাগিয়েছে সোয়েমস! আমি কোথায় যাই, কী করি—"

আইরিন ফিরে আসবে—এ আশা ক্রমশঃ নৈরাশ্যে পর্যবসিত হচ্ছে। সোয়েমস ভাবল এবারে মামলার ভয় দেখিয়ে দেখা যাক কী হয়। জোলিয়নের নাম জড়িয়ে সে আইরিনের নামে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিস জারি করল। আইরিন তখন রিচমণ্ডে বাস করছে এক হোটেলে। রিচমণ্ড শহর আর রবিন হিল মাত্র তিন মাইল ব্যবধানে। মাঝে একটা বনভূমি। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে প্রায়ই বেড়িয়ে বেড়ায় জোলিয়ন আর আইরিন।

সোয়েমস-এর স্বপক্ষে এই সবই সাক্ষী। গোয়েন্দা লাগিয়ে লাগিয়ে দিনের পর দিন খবর নিয়েছে—আইরিন আর জোলিয়ন কোথায় যায়, কী করে। আইরিনকে ফিরে পাওয়া যখন গেলই না, তখন মামলাটা গুছিয়ে করতে হবে, বিবাহবিচ্ছেদের আদেশ বার করতেই হবে আইরিনের চরিত্রহীনতার অজুহাতে। সে-আদেশ বেরুলেই সোয়েমস আবার বিয়ে করতে পারবে। কনে সে ঠিক করেই রেখেছে, সোহো পল্লীর এক ফরাসিনী হোটেলওয়ালীর মেয়ে অ্যানেট। দেখতে শুনতে মেয়েটা ভালই। কিন্তু ওই পর্যন্ত। ভদ্রসমাজের বধূ হওয়ার উপযোগিতা অন্য কোন দিক দিয়ে তার নেই।

তা না থাক। সেদিকটা ভাবছে না সোয়েমস। তার চাই একটি ছেলে—বংশের অগাধ ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে, এমন একটি বংশধর। সে-বংশধরের মাতৃকুল নিয়ে কে আর মাথা ঘামাতে বসবে। পিতৃকুল যে ফর্সাইট, এইটিই হবে তার চরম গৌরব।

যথাসময়ে মামলার বিচার হল। জোলিয়ন তখন আইরিনকে নিয়ে ইতালি চলে গিয়েছে, ওদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তিই এল না বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্নে। আদেশ বেরিয়ে এল আদালতের— আইরিনের সঙ্গে সোয়েমস-এর আর সম্বন্ধ নেই কিছু।

বুয়র-যুদ্ধ শেষ হয়েছে! ফিরে এসেছে জুন আর হোলি আর হোলির স্বামী। এল না কেবল একজন্ জোলিয়নের একমাত্র পুত্র জোলি। নতুন করে বাজল পুরাতন শোক। কিন্তু এবার তাকে সান্ত্বনা দেবার লোক আছে। আইরিনের সঙ্গে জোলিয়নের বিবাহ হয়ে গেল।

ওদিকে অ্যানেটের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল সোয়েমস-এরও। মোটর কিনেছে দুজনেই—জোলিয়নও, সোয়েমসও।

জোলিয়ন বিশেষ করে পুত্র চায় নি। ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য পুত্র চাই-ই, এমন ধারা ধারণা তার কোনদিনই নেই। তবু তার পুত্র হল—নাম রাখা নিয়ে বাধল সমস্যা। সাধারণ রীতি অনুসারে পিতার নামেই পুত্রের নামকরণ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জোলিয়নের মৃতপুত্র জোলিরও আসল নাম ছিল জোলিয়ন। সেজন্য একে একটা ডাকনাম দেওয়া হল "জো"। পোশাকী নাম অবশ্য জোলিয়ন রাখতেই হবে।

ওদিকে সোয়েমস—যে এত করে একটি পুত্র কামনা করেছিল—নিয়তি বড় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করল তাকে। তার হল একটি কন্যা, এবং সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হল এই যে সন্তান জন্মের পর চিকিৎসকেরা মত প্রকাশ করলেন যে অ্যানেট আর কোনদিন অন্য সন্তানের জননী হতে পারবে না।

বেচারী সোয়েমস !

যেদিন তার কন্যা ফ্লুওর জন্মগ্রহণ করল, সেইদিনই মারা গেলেন তার পিতা জেমস, অষ্টাশি বৎসর বয়সে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"অ্যানেট ? খবর কী ওদিককার ?"

সোয়েমস বলল—"ভাল। ছেলে হয়েছে।"

ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য বংশধর এসেছে শুনে ঐশ্বর্যবান জেমস ফর্সাইট পরম পরিতৃপ্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

* * *

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়। জোলিয়নের পুত্র জো এখন আঠারো বৎসরের যুবা, সোয়েমস-এর কন্যা সুন্দরী ফ্লুওরেরও অঙ্গে অষ্টাদশ বসন্তের সুষমা।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হল। তাঁর সঙ্গে মৃত্যু হল ইংলণ্ডের সমাজজীবনের একটি বর্ধিষ্ণু যুগের। যে-ইংরেজ চাষ-সর্বস্ব জাতি ছিল, তারা ওঁরই রাজত্বকালের মধ্যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বণিক ও সামরিক জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইয়র্কশায়ারের খামারের মালিক লণ্ডনে এসে উপার্জন করেছে মিলিয়নের ওপরে মিলিয়ন পাউণ্ড। ক্ষুদ্র দ্বীপের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভেতরে যারা ঘরোয়াভাবে রাজনীতি করত, তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর। মাঝে মাঝে বুয়োর-যুদ্ধের মত ছোটখাট উৎপাত যে না ঘটেছে, তা নয়, কিন্তু তারা শুধু ইংরেজের অগ্রগামী বুভুক্ষাকে আরও উসকে দিয়ে গেছে।

কিন্তু এইবার ? দিকে দিকে যেন যুগান্তের বিদ্যুৎশিহরণ। সুখশয়নে ইংলণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্তারা চমকে উঠছেন। একটা প্রলয় ঝঞ্ঝার আশঙ্কায় বিশ্বপ্রকৃতি শ্বাসরুদ্ধ করে আছে যেন—

বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন, বলছে রাজনীতিকরা। সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকাচ্ছে জার্মানির নবীন নরপতি কাইজার উইলিয়মের দিকে—ও যেন বিশ্বধ্বংসের বিষাণ হাতে করেই দাঁড়িয়ে আছে, কবে তা মুখে তুলে ফুঁ দিয়ে বসে, কে জানে।

এমনি সময়ে একদিন—

জুন এক ছবির প্রদর্শনী খুলেছে। তার প্রতিপাল্য খোঁড়া হাঁসেদের ছবি দেখানো হয় এখানে। শিক্ষানবিস পটুয়াদের ব্যঙ্গ করে খোঁড়া হাঁস বলত শৌখিন ভদ্রব্যক্তিরা।

সেই প্রদর্শনীতে একদিন সোয়েমস ঢুকেছে ফ্লুওরকে নিয়ে। অবশ্য প্রদর্শনীটা যে

জুনের, তা না জেনেই সে ঢুকেছে, নিছক সময় কাটাবার জন্য। কারণ ইতিমধ্যে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছে সোয়েমসও। আর পয়সা সে রাখবে কোথায়?

একটু বাদেই সেখানে ঢুকল এক সুন্দর তরুণ।

ফ্লুওরের রুমালখানা হাত থেকে পড়ে গেল। অথবা সে কি ইচ্ছা করেই ফেলে দিল কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে? হবেও বা—নারীদের অশিক্ষিত-পটুত্বের কথা কবিরা শতমুখে কীর্তন করে গিয়েছেন।

রুমাল কুড়িয়ে নিয়ে ফ্লুওরের হাতে দিল সেই তরুণ যুবক। ফ্লুওর দিল ধন্যবাদ—পরিচয় দিল নিজের। যুবককেও নিজের পরিচয় দিতে হল। শুনে সোয়েমস মুখ বিকৃত করলেন। এ যুবক জোলিয়ন ফর্সাইটের পুত্র, জোলিয়ন এবং আইরিন ফর্সাইটের। অন্তরঙ্গ মহলে সবাই যাকে জো বলে ডাকে।

* * *

জোলিয়নের শরীর ভাল যাচ্ছে না! দীর্ঘজীবী ফর্সাইট বংশে কর্তারা অন্ততঃ আশি বছর বাঁচেন সবাই, কিন্তু জোলিয়ন সত্তর বছরেই কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই রোগে তার পিতারও দেহান্ত হয়েছিল, কিন্তু সে আরও অনেক বেশী বয়সে। জোলিয়ন ভাবে—"আমাকেই বা এত তাড়াতাড়ি যেতে হবে কেন?"

আইরিনকে কিছু বলেন নি, গোপনে ডাক্তার দেখিয়েছে। ডাক্তার বলেছে—খুব সাবধানে থাকতে। দৈহিক পরিশ্রম এবং মানসিক চাঞ্চল্য সমভাবে পরিহার করতে। ও দুটোই তাঁর পক্ষে বিষবৎ।

পরিশ্রম করেন না, করবার প্রয়োজন হয় না। চাঞ্চল্যও এতদিন আসে নি, কারণ আইরিনের নিশ্ছিদ্র সাহচর্যে দিন কাটছিল পরম শান্তিতে, অনাবিল আনন্দে। হঠাৎ—

কন্যা হোলি, জামাই ডার্টি ফিরে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। পল্লীঅঞ্চলে জমিজায়গা কিনে ঘোড়ার খাটাল বসিয়েছে। ঘোড়ার বাচ্চা হয়, বাচ্চারা বড় হয়, কতক রেখে দেওয়া হয় আরও বংশবৃদ্ধির জন্য,—কতক বেচে দেওয়া হয়। লাভের ব্যবসা, ভালই আছে তারা।

হোলি ভাইকে নিমন্ত্রণ করল খামারে। জো গেল।

হোলির স্বামী ডার্টি আবার ফ্লুওরের সাক্ষাৎ পিসতুতো ভাই। ডার্টির মুখেই ফ্লুওর শুনল যে খামারে একজন অতিথি এসেছে—নাম তার জো ফর্সাইট। ফ্লুওর অভিমান করে বলল—"রাজ্যের লোককে তোমরা নিমন্ত্রণ করতে পার, পার না কেবল আমায়?" ডার্টি বাধ্য হয়েই তাকে নিমন্ত্রণ করল, এবং পরদিন ফ্লুওর গিয়ে হাজির হল ডার্টির বাড়িতে।

ফিরে এল জো রবিন হিলে। মা বাবাকে জানাল—সে বিবাহ করতে চায়! কাকে? সোয়েমস ফর্সাইটের কন্যা ফ্লুওরকে।

কোন রকম চাঞ্চল্য ছিল না জোলিয়নের মনে। কিন্তু এখন?

জোলিয়ন তাকাল আইরিনের দিকে। আইরিন তাকাল জোলিয়নের দিকে। দুজনেরই দৃষ্টি নীরব ভাষায় মুখর হয়ে ওঠে—"এ হতে পারে না। সোয়েমস-এর মেয়ে এই ঘরে? হতেই পারে না।"



ফিরে এল জো রবিন হিলে। পৃষ্ঠা ৩৭

কিন্তু পুত্রকে বোঝাবেন কী বলে? "না, হবে না"—শুধু এইটুকু বললেই তো হবে না। তাতে ফল উলটো হবে। জো হয়ত বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, যেমন গিয়েছিল একদিন নিজে জোলিয়ন।

সংগত কারণ দেখাতে হবে—আপত্তিটা কোন্‌খানে। অর্থাৎ খুলে বলতে হবে আইরিনের পূর্ব ইতিহাস। আইরিন যে একদিন সোয়েমস-এরই স্ত্রী ছিল, তা বলতে হবে। একত্র বাস করতে না পেরে আইরিন গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হল। দীর্ঘ, সুদীর্ঘ দিন ভেসে বেড়ালো সংসারের উলটোপালটা স্রোতে, তারপর বিবাহবিচ্ছেদের মামলা, মুক্তি, এবং জোলিয়নের

সঙ্গে বিবাহ—ইত্যাদি সমস্ত তাকে জানাতে হবে। কী লজ্জা! কী কেলেঙ্কারি! কী দাগা বালক জো'র পক্ষে!

তবু তা করতেই হবে জোলিয়নকে। তবে মুখে এসব বলা অসম্ভব! চিঠি লিখে জানাতে হবে।

কলম সরছে না, ভাষা যোগাচ্ছে না, প্রতিটি লাইন লিখতে যন্ত্রণা হচ্ছে বুকের ভেতর। তবু দীর্ঘ পত্র শেষ করল জোলিয়ন অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে।

চিঠি শেষ করে উঠে দাঁড়াল জোলিয়ন। কিন্তু দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা! কী যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে ভেতরটাতে। জোলিয়ন ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারের কথা মনে হল—চাঞ্চল্য যেন না আসে।

কোনমতে দেয়াল ধরে ধরে ঘরের ভেতর এসে স্বর্গীয় পিতার চেয়ারে বসে পড়ল জোলিয়ন।

আইরিন যখন এল স্বামীর খোঁজে, স্বামী আর নেই!

চিঠিখানা জো পেল। তার শেষ কথা—"অতএব তুমি বুঝতে পারছ বাবা জো, ফ্লুওরকে বিবাহ করে এ-গৃহে আনার অর্থ তোমার মায়ের মনে অসহ্য কষ্ট দেওয়া! আমি জানি, তা তুমি করতে পার না।"

শোকের দিনগুলো কাটল আস্তে আস্তে। ফ্লুওর জোর করে বাপকে পাঠিয়ে দিল—বিবাহের কথাবার্তা ঠিক করে আসবার জন্য। সোয়েমসকে যদি কেউ আগুনের ওপর দিয়ে এক মাইল পথ হেঁটে যেতে বলত, এ লজ্জাকর কর্তব্য সম্পাদনের চাইতে তাও হত আনন্দের। কিন্তু ফ্লুওরকে সে এত বেশী ভালবাসে—তার কথার অবাধ্য হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

রবিন হিলে গিয়ে সে আইরিনকে বলল—"তোমার ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিবাহ দাও। আমি সব কথা ঠিক করে যাওয়ার জন্য এসেছি।"

আইরিন ভাবলেশহীন মুখে জবাব দিল—"আমার ছেলেকে ডেকে দিচ্ছি। সে যা বলে—তাই হবে।"

জো এল, এসে বলল—"ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ হবে না।"

কয়েক দিন পরেই সে মা-কে নিয়ে আমেরিকায় চলে গেল। ইংলণ্ডে শীঘ্র ফিরে আসার ইচ্ছা বিশেষ নেই।



জন গলস্‌ওয়ার্দি

● লেখক-পরিচিতি

বিশ্বসাহিত্যে জন গলস্‌ওয়ার্দি এক চিরস্মরণীয় নাম। নাটক এবং উপন্যাস—সাহিত্যের এই উভয় শাখায় অতুলনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তিনি। ইংরেজী সাহিত্য-গগনের এই প্রদীপ্ত ভাস্কর অস্তমিত হয়েছেন মাত্র উনচল্লিশ বৎসর পূর্বে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গলস্‌ওয়ার্দির জন্ম হয়। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হ্যারো ও অক্সফোর্ডে তিনি শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর বৃত্তি হিসাবে তিনি আইন-ব্যবসাকে গ্রহণ করেন—পিতার একান্ত অনুরোধে। কিন্তু ওর ওপর তাঁর আসক্তি কোন দিনই ছিল না। সাহিত্য ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, একান্তভাবে তারই সাধনায় তিনি নিজেকে নিযুক্ত করে দিলেন।

গলস্‌ওয়ার্দির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল ফর্সাইট সাগা। ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বহুমুখী অভ্যুদয় এবং ক্রমিক বিবর্তনের একটি রসোত্তীর্ণ আলেখ্য তিনি এঁকেছেন এই গ্রন্থে। মূলত ছয় খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট উপন্যাস বহু চরিত্রের সমন্বয়ে এবং বিচিত্র পরিস্থিতির সমাবেশে এপিক রচনার ধারা অনুসরণ করে চলেছে, সেই দিক দিয়ে এর "সাগা" নামকরণ সর্বাংশে সার্থক।

নাটক রচনাতেও তিনি সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর "জাস্টিস", 'স্ট্রাইফ' প্রভৃতি নাটক মঞ্চেও যেমন অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল, জনসমাজেও তেমনি লাভ করেছিল অকুণ্ঠ সমাদর। সবচেয়ে বড় কথা, এই সব রচনাই কালোত্তীর্ণ প্রসিদ্ধির অধিকারী। এদের উজ্জ্বলতা বা চিত্তহারিতা কোনদিনই ম্লান হবে, এমন কল্পনা করা যায় না।

ইওরোপীয় সাহিত্য-দিক্‌পালদের অন্যতম বলে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে। এর পর বৎসরই, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গলস্‌ওয়ার্দি মরধাম ত্যাগ করেন।



গুড আর্থ

ওয়াং-লাং বিয়ে করতে যাচ্ছে।

বাপের এক ছেলে ওই ওয়াং। মা মারা গেছে আজ ছয় বছর, বাড়িতে বুড়ো বাপ আর বছর কুড়ি একুশ বয়সের ওই ছেলে। একদিকে সংসারের কাজ, রান্না করা, কেশো রুগী বুড়োটাকে নাওয়ানো খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো, অন্যদিকে ক্ষেতের মেহনত—লাঙ্গল ঠেলা, নিড়োনো, কোপানো, বীজ বোনা, ফসল কেটে তোলা—সব ওয়াং এক হাতে করে। তাগড়া জোয়ান, খাটতেও পারে অসাধারণ। খাটুনির পুরস্কারও সে পায়, গাঁয়ের মাঝে তার খামারেই ফলন হয় সবচেয়ে ভাল, খেয়ে পরেও বাপ-বেটার ফী-বছরই বেশ দু-পয়সা জমে।

হাতে কিছু জমেছে বলেই বিয়ে করতে সাহস করছে ওয়াং। কিন্তু তাই বলে কষ্টের পয়সা দরাজ হাতে উড়িয়ে দেবার মতলব তার নয়। গেরস্তঘরের মেয়ে আনতে হলে যৌতুক লাগত, ওদিক দিয়েও সে বাপকে যেতে দেয় নি। ঘরে আনতে যাচ্ছে হোয়াং জমিদারদের একটা বাঁদীকে। জমিদারদের ওটা রীতি। খুব ছোট ছোট মেয়ে কিনে এনে সংসারে রাখা হয় আঠারো কুড়ি বছর পর্যন্ত তারা দাসীবৃত্তি করে, তারপর কোন গরিব মেহনতী মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়। যারা ও-বাড়ি থেকে কনে সংগ্রহ করতে চায়, তাদের গিয়ে দেখা করতে হয় জমিদার-গিন্নীর সঙ্গে। গিন্নী কনে বাছাই করে দেন দাসীদের ভেতর থেকে।

ওয়াংয়ের জন্যও ওইভাবে কনে বাছাই হয়ে আছে জমিদারবাড়িতে। সেই কনেকে সে আনতে যাচ্ছে আজ।

গাঁ থেকে শহর বেশ খানিকটা পথ। পথের দুধারে চষা ক্ষেত—শহরের সিং দরজা পর্যন্ত। শহরেরও অনেকটা ভেতরে ঢুকে তবে জমিদারবাড়ি পাওয়া যায়।

ক্ষেতের আল ধরে ধরে ওয়াং চলেছে খুব ভোরবেলাতেই। বাপকে এক বাটি জই-এর আটার মাড় খাইয়ে এসেছে। আর খাওয়া হবে সেই রাতের বেলায়, বউ এসে রেঁধে খাওয়াবে আজ। পড়শীদের দু-পাঁচ জনকে বলা হয়েছে খেতে, তাদের মধ্যে ওয়াং-এর কাকা তো আছেই।

শহরে ঢুকেই ওয়াং এক নাপিতের দোকানে বসে কামিয়ে নিল। শুধু দাড়িগোঁফ নয়, মাথাও। সব চুল ফেলে দিয়ে রেখে দেওয়া হল লম্বা টিকিটা। সেটা বেণীর আকারে ঝুলছে ঘাড়ের নীচে পর্যন্ত। নাপিত সেটাও কেটে নির্মূল করে দিতে চেয়েছিল। আজকাল টিকি না-রাখাই নাকি রেওয়াজ দাঁড়াচ্ছে ভদ্রসমাজে। কিন্তু ও আঁতকে উঠল সে প্রস্তাবে। সে ভদ্রও নয়, তার যে সমাজ সেখানে ও-রেওয়াজ চালুও হয় নি এখনো। বিশেষ তার বাবা, ওয়াংকে টিকিহীন দেখলে রেগে অনর্থ বাধাবে নিশ্চয়।

কামাবার পরে একটু চা খেলো। রোজ যে সে চা খায়, এমন নয়। অত বাবুগিরির পয়সা কোথায়? তবে আজ একটা বিশেষ দিন, দু-পয়সা বাড়তি খরচ করারই দিন। সুতরাং চা খেলো সে। তারপর করল বাজার। শুয়োরের মাংস, সয়াবীন, শুঁটকি মাছ—এমনি সব। বাঁধাকপি তার ক্ষেতেই আছে।

সওদা-ভরতি ঝুড়িটা কাঁধে নিয়েই তাকে এখন জমিদারবাড়ি যেতে হয়। রেখে যাবে কোথায়? ফেরার পথে বাজারটা করলে এ-ঝকমারিতে পড়তে হত না। সে কথা সে ভাবে নি যে, তাও নয়। ভেবেছিল, কিন্তু ফেরার সময় বউ থাকবে সঙ্গে। তাকে নিয়ে বাজার করতে যাওয়া কেমন যেন হয়! তা ছাড়া, অত বেলায় মনের মত জিনিস পাওয়া যাবে কি না দোকানে, সেও সন্দেহ।

অগত্যা কাঁধে ঝুড়ি নিয়েই নতুন বর চলেছে বউ আনতে। জমিদারবাড়িতে ঢুকল। দেউড়িতে দরোয়ান, সে তো হাঁকিয়ে দিতেই চায় যেন। অবশেষে এক ডলার ঘুষ নিয়ে তবে সে ওয়াংকে ভেতর মহলে যাবার অনুমতি দিল। শুধু অনুমতি নয়, নিজে সঙ্গে করে নিয়ে চলল তাকে। কী মুরুব্বীয়ানা চাল তার! বাঁ গালে তার বড় আঁচিল একটা, তাতে তিনগাছা লম্বা লম্বা চুল। লোকটার কেমন অভ্যাস, ক্রমাগত সেই চুল তিনগাছিতে পাক দেয়।

"বর এসেছে, বর এসেছে"—হাঁকতে হাঁকতে মহলের পর মহল পার হয়ে যায় দরোয়ান। চাকর দাসীরা চারধার থেকে উঁকি দিয়ে দেখে ঝুড়িওয়ালা বরকে, আর হেসে গড়িয়ে পড়ে। ওয়াং-এর প্রথমে হয় লজ্জা, তারপর হয় রাগ। কিন্তু বিয়ে করতে এসে রাগ করা চলে না, বিশেষ জমিদারবাড়িতে। তাই সে মনের রাগ মনে রেখেই গোমড়া মুখে চলেছে দরোয়ানের পিছু পিছু।

একটা ছোট ঘরে ঝুড়িটা নামিয়ে রাখল দরোয়ানের কথামত। ওটা কাঁধে নিয়ে ওপরতলায় রানীমার কাছে যাওয়া তো চলে না। অথচ রানীমা বর না দেখে কনে ছাড়বেন না।

ঝুড়িটা রেখে যেতে মন খুঁত খুঁত করছে ওয়াং-এর। মাছমাংসগুলো খোয়া যাবে না তো? দরোয়ান তার মনের ভাবখানা বুঝল, আঁচিলের চুলে একটা জোর পাক দিয়ে ঝাঁজিয়ে বলে উঠল—"তুমি কি ভাবছ বল তো চাষার পো? তোমার ও-ছাই খাবার এ-বাড়িতে কুত্তায়ও খায় না।"

মরমে মরে গিয়ে ওয়াং আর ঝুড়ির দিকে ফিরেও তাকাল না, দরোয়ানের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে পড়ল এক বিরাট হলঘরে। এত বড় যে একখানা ঘর হতে পারে, তা এর আগে কখনও ভাবতে পারে নি ওয়াং। তার নিজের বাড়ির মত সাতটা বাড়ি এই একখানা ঘরে পুরে ফেলা যায়। কী উঁচু তার ছাদ! কী জ্বলজ্বলে গিলটির কাজ তার থাম্বাগুলোতে! মেঝের মার্বেল পাথর এমন মসৃণ যে ওয়াং-এর পা কেবলই পিছলে যেতে চায়।

হলঘরের এক কোণে সাটিনের জামা-কাপড়ে সারা অঙ্গ ঢেকে এক বুড়ী বসে আছে চণ্ডুর নল মুখে দিয়ে। দরোয়ান দূর থেকে প্রণাম করে বলল—"রানীমা! সেই বরটা এসেছে—"

বুড়ি ঝিমোতে ঝিমোতে পাশের দাসীগুলোকে বলল—"ওরে, ওলানকে ডেকে দে—"

ততক্ষণে ওয়াংও দূর থেকে রানীকে একটা প্রণাম সেরে নিয়েছে।

একটি মেয়েকে নিয়ে এল দাসীরা। নীল পাজামা আর কালো জামা পরা লম্বা-চওড়া একটা মেয়ে, দেখেই মনে হয়—বেশ শক্তসমর্থ। বয়স ওয়াং-এর মতই হবে। মুখখানা দেখতে ভালো নয়, মুখের হাঁ বেজায় বড় আর নাকটা থ্যাবড়া মোটা। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগল ওয়াং-এর চোখে ওর পা দুখানা। চীনদেশে সৌন্দর্যের বিচার হয় পা দেখে। যার পা যত ছোট সে তত বেশী সুন্দরী। এ-মেয়ের দুটি পা যেন দুখানা কুলো।

রানী ততক্ষণে ওয়াংকে উদ্দেশ করে ক্ষীণস্বরে বলতে শুরু করেছেন—"ওলান এ বাড়িতে এসেছে দশ বছর বয়সের সময়। কাজকর্মে ওর জুড়ি নেই, আর মুখে নেই একটিও কথা। ও তোমার ঘরসংসার বেশ গুছিয়েই করতে পারবে। এইবার যাও, ছেলে হলে দেখিয়ে যেও।"

বলতে বলতে চণ্ডুর নল মুখে দিয়ে পেছনে হেলান দিলেন রানী, চক্ষু দুটি আপনা থেকেই বুজে এল। ওয়াং হল থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে ওলান, তার কাঁধে একটা টিনের বাক্স।

নীচের ঘরে এসে ওয়াং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—তার ঝুড়ির মাছমাংস কুত্তায়ও খায় নি। ওলানের বাক্সটা নিজের কাঁধে নিয়ে ওকে ইশারা করল ঝুড়িটা তুলে নিতে। তারপর জিজ্ঞাসা করল—"খিড়কির দরজা থাকে তো সেইদিকে চল। হাজার লোক হাঁ করে দেখবে। বিশ্রী লাগবে ভারী।"

ওলান তাই করল। একটা উঠান পার হয়ে গেল, যেটা আবর্জনা আর আগাছায় ভরতি।

তার পেছনে একটা ছোট লোহার গেট। ওলান গেট খুলে দিল, প্রথমে বেরুলো ওয়াং, তারপর ওলান। গেট আবার বন্ধ করে ওলান চলল স্বামীর ঘরে।

রাস্তার পাশে এক দোকান থেকে ধূপকাঠি কিনে নিল ওয়াং। শহরের সিংদরজা দিয়ে বেরিয়ে ক্ষেতের আল ধরে ধরে এসে পড়ল ওয়াং-এর নিজের ক্ষেতে। এর ভেতর এক জায়গায় একটি ছোট্ট মন্দির, মাথাসমান উঁচু। ইটের দেয়াল, টালির ছাদ। এর ভেতর আছেন ক্ষেত্রপাল দেবতা আর তাঁর বউ। মাটি দিয়ে গড়া মূর্ত এঁদের। এই ক্ষেতেরই মাটি দিয়ে ওয়াং-এর ঠাকুরদা এঁদের নিজের হাতে গড়েছিল, ওই মন্দিরও সেই ঠাকুরদার হাতের তৈরী।

মাটির ওপর চিত্রবিচিত্র রং করা, তার ওপর লাল কাগজের পোশাক। এ পোশাক বছর বছর বসন্তকালে পালটে দেওয়া হয়, এ-যাবৎ ওয়াং-এর বাবাই একাজ করেছে। বুড়ো আর পারবে না বোধ হয়। এবার থেকে কাজটা ওয়াংকেই করতে হবে।

কতকালের কত ধূপকাঠি পুড়ে পুড়ে ছাইয়ের গাদা হয়ে আছে, দেবতার সামনে। সেই ছাইয়ের ভেতর নিজের দুটি ধূপকাঠি বসিয়ে দিল ওয়াং। তারপর চকমকি ঠুকে জ্বালিয়ে দিল তাদের। ধূপের ধোঁয়া উঠতে লাগল ওপর পানে। আর ওয়াং দাঁড়িয়ে রইল দেবতার সামনে বধূকে পাশে নিয়ে। এইটিই হল বিবাহ। আর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ওদের দরিদ্র সমাজে দরকার হয় না। ধনীরা আরও অনেক কিছু করে বটে, কিন্তু সে শুধু ধনগৌরব জাহির করবার জন্য।

ওয়াং যখন বউ নিয়ে বাড়ি ঢুকল, তার বাপ দেয়ালে পিঠ দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। বউকে দেখেও দেখল না, দেখলে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল—"ওই যে মেঘটা দেখছিস ওই কোণে, ওইটেতেই বৃষ্টি হবে, দেখে নিস। আজ নয়, দু তিন দিন পরে। বীজটিজগুলো ঝেড়েঝুড়ে রেখেছিস তো? এইবার বুনতে হবে।"

রাতে ওলানের তৈরী খাবার খেয়ে নিমন্ত্রিতেরা খুব প্রশংসা করল। হবে না কেন, ওলান তো এতদিন রান্নার কাজই করেছে জমিদারবাড়িতে।

অতিথি বলতে জন পাঁচেক, আর ওয়াং-এর বাবা আর নিজে ওয়াং। প্রতিবেশী চিং আছে, আর আছে ওয়াং-এর কাকা। কাকাটি হিংসুটেপ্রকৃতির লোক। কারও ভাল দেখতে পারে না কোনদিন। সেই আজকের ভোজ খেয়ে এমন তৃপ্ত যে শতমুখে আশীর্বাদ করতে লাগল বাড়-বাড়ন্ত হোক ওয়াং-এর। ছেলের মত ছেলে হল ওয়াং। তার নিজের ছেলেটা একটা কুঁড়ের সর্দার, একটা অপোগণ্ড, একটা বখাটে, ঝাঁটা মারো অমন ছেলের মুখে।

এসব কথায় কান দেওয়ার দরকার মনে করে না কেউ, কারণ লোকটার প্রকৃতি কারও অজানা নয়। কিন্তু ওকে চটাতে সাহস পায় না কেউ, সকলেই কানাঘুষা করে—ডাকাতের দলে ওর নাম লেখানো আছে।

* * *

দিন, মাস বছর কেটে যায়। কেটে যায় বেশ ভালোভাবেই।

ক্ষেতখামারের কাজে আগে একা খাটত ওয়াং, এখন দোসর জুটেছে ওলান। ছোট সংসারটুকুতে কাজ আর কতই বা, সাত তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে ওলান কোদাল হাতে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়, সারাদিন সমানে খাটে তার সঙ্গে। আগে আগে ওয়াং লাঙ্গল চালিয়ে যায়, পেছনে আসছে ওলান ঢেলা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে। ঝপাঝপ ধান কেটে চলে যায় ওয়াং, পেছনে বসে আঁটি বাঁধছে ওলান। দিনের শেষে দুজনে একসাথে বোঝা বইছে ক্ষেত থেকে বাড়ি পর্যন্ত।

দিন যায়, বছর যায়, ছোট ছোট শিশুতে ঘর ভরে যায় ওয়াং-এর। পর পর দুটি ছেলে হয়েছে ওদের, একটি শোয় তার ঠাকুরদার ঘরে। মেটে বাড়িতে তিনখানি মাত্র ঘর ওদের। ক্ষেতের মাটি দিয়ে তৈরী, ক্ষেতের খড় দিয়ে ছাওয়া। তিনখানা ঘরই ফসলে ঠাসা। ধান, গম, বীন, পেঁয়াজ, রসুন, কী নয়? চালের বাখারি থেকে সারি সারি শিকে ঝুলছে, কোনটাতে শুয়োরের শুকনো ঠ্যাং, কোনটাতে ঘরের মুরগীর শুকনো ধড়।

লক্ষ্মী উপচে পড়ছে ওয়াং-এর বাড়িতে। পর পর তিনটি বছর কী ফসলটাই না হল! অন্য চাষীদের মত ওয়াং ফসল ওঠা মাত্র বেচে দেয় না। দেবে কেন? অন্যেরা বিক্রি করে অভাবের তাড়নায়, ওয়াং-এর অভাব নেই। সে মজুদ রাখে ফসল, বর্ষার দিনে চড়া দামে বেচে।

টাকা তার জমেছে বহু। দেয়ালের ভেতর গর্ত করে টাকা রাখে, মাটি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে লেপে দিলে কার সাধ্য বোঝে? গর্ত মেঝেতেও। লেপ-তোশকের তুলোর ভেতরও টাকার পুঁটুলি। কিছু আবার কলসিতে ভরে বাঁশবনে পুঁতে রেখে এসেছে।

ডাকাতের ভয় বড্ডো। সেই ভয়ের দরুনই কাকার অত তোয়াজ করে ওয়াং, যদিও দু-চক্ষে দেখতে পারে না কাকাকে বা খুড়ীকে। একদিন দশ দশটা ডলার নিয়ে গেল কাকা —মেয়ের বিয়ের নাম করে। বিয়ে তো দিলই না, মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে বেচে এল।

তা আসুক, মোটের ওপর কাকার একটু নেকনজর বোধ হয় আছে ওয়াং-এর ওপর। সেজন্যই বোধ হয় ডাকাত পড়ে না তার বাড়িতে। তা নইলে, দেখগে যাও, যারই দুটো পয়সা হয়েছে, ডাকাতে সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে তার, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, জানে মেরে গিয়েছে গেরস্তকেও।

হ্যাঁ, গোটা তিনেক বছর ভালই গেল। খুব ভাল। হোয়াং জমিদারদের কাছ থেকে কিছু জমিও কিনেছে ওয়াং, খাল ধারের জমি। এমন উর্বরা জমি হয় না। এ জমি যে কেন বেচল জমিদার, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না ওয়াং। সে নিজে তো এক হাত জমিও বেচবার কথা কল্পনা করতে পারে না।

ওলান বলল—"জমিদার বাড়ির বাইরের ঠাটটুকুই আছে এখনো, ভেতরে ঝাঁজরা। আয় অনেক বটে, কিন্তু ব্যয় আরও অনেক। জমিদারের পাঁচ ছেলেই বিদেশে, শহরে বসে

ক্রমাগত পয়সা ওড়াচ্ছে। জমিদারের দুটি মেয়ের বিয়েতে গা-মোড়া জহরত দিতে হয়েছে, অন্য যৌতুকও সেই অনুপাতে। তারপরে জমিদার বুড়োর নিজের এখনও বিলাসিতার শেষ নেই। নানা বদখেয়ালে জলের মত পয়সা উড়িয়ে যাচ্ছে। আর কর্ত্রী বুড়ীর চণ্ডুর খরচাই কী কম ?”

সে যাকগে—ওয়াং-এর দিন এই তিনটে বছর খুব ভালই গেল। গাঁয়ের লোক বলাবলি করে—বউয়ের পয়ে এসব হয়েছে। ওয়াং মনে মনে কথাটা বিশ্বাস করে।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না।

চতুর্থ বৎসরে আকাশ নিষ্করুণ হল, বৃষ্টি হল না একেবারে। উত্তর-পশ্চিম থেকে মরুভূমির গরম হাওয়া বইতে লাগল ঝড়ের বেগে। খাল বিল পুকুর শুকিয়ে গেল, ফেটে চৌচির হয়ে গেল চাষের জমি। বীজ বুনতেই পারল না কেউ। ওয়াং দু-চারখানা ক্ষেতে জল ঢেলেছিল বাঁকে করে জল বয়ে বয়ে। সেখানে বীজ ছড়াতেও পেরেছিল, চারাও উঠেছিল বইকি ! কিন্তু তারপর খাল বিলে আর জল নেই, সমস্ত চারা হলদে হয়ে শুকিয়ে গেল।

দেশে আকাল এল, কারও ঘরে এক দানা খাবার নেই। ওয়াং-এরও না। অন্য সবাইয়ের চাইতে কিছু পরে এল তার অন্নকষ্ট, কিন্তু এল ঠিকই।

তখন মনে হয়—ফসল না বেচে যদি গোলাজাত করে রাখা যেত গত বছর। কিন্তু তারপরই বোঝে, তা করলেও সেই গোলার ধান ভোগে লাগত না। যারা খেতে পাচ্ছে না তারাই কেড়ে নিয়ে যেত।

উপোস শুরু হয়েছে। প্রথমে এক বেলা, তারপর দু-বেলাই। বুড়োকে আর শিশু দুটোকে এক বেলা যা হোক কিছু দিতেই হয়, ওয়াং আর ওলান এক ধার থেকে উপোস চালিয়ে যায় তিন দিন, চার দিন।

ওয়াং-এর গায়ে অসুরের বল ছিল, আজ সে দু-পা হাঁটতে হলে ধুঁকতে থাকে। তবু সে হাঁটে বইকি। মাঝে মাঝেই শুকনো মাঠের ভেতরে এসে দাঁড়ায়, ক্ষেত্র-দেবতার সম্মুখে এসে আগুন চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন দেবতাকে ভস্ম করে ফেলতে চায়। বেটা দেবতা কেবল পূজো নেবার জন্য আছে, এক বিন্দু জল দেবার মুরোদ নেই।

যতদূর নজর চলে, চারদিকে ওয়াং-এরই জমি। কিন্তু এত জমি থাকা সত্ত্বেও ওয়াং না খেয়ে মরতে বসেছে। দেবতার ওপর ভক্তি সে রাখে কেমন করে ?

গাঁয়ের অনেকে জমি বেচে দিচ্ছে। শহর থেকে সুযোগসন্ধানী ধনীরা এসে জলের দামে কিনে নিচ্ছে জমি। ওয়াং-এর কাকা একদিন তিনটে খদ্দের নিয়ে এল ওয়াং-এর কাছে। ‘জমি বেচবে তো বেচতে পার। এরা কিনবে। একর প্রতি একশো পেনী দাম।’

ওয়াং চেঁচিয়ে ওঠে—“কী ? একশো পেনী ? ওর বিশগুণ দামে যে কিনেছি আমি !”

এক খদ্দের বলে—“তা তো কিনেছ। কিন্তু আকালের সময় কি সেই দামে কেনা বেচা হয় কখনো ?”

ওলান এসে বললে—"সেই দামে কিনতে চাইলেও আমরা জমি বেচব না। তোমরা যাও। তবে হ্যাঁ, আসবাবপত্র যা আছে—যদি কেনো তো কিনতে পার।"

ওরা তাতেও রাজী। শোবার খাট, টেবিল, বেঞ্চি, মায় রান্নার কড়াটা পর্যন্ত ওরা কিনে নিয়ে গেল মাত্র দু ডলার দিয়ে। রইল মাত্র একখানা লাঙ্গল, আর দুখানা কোদাল। চাষের হাতিয়ার ওয়াং বেচবে না।

কিন্তু বলদটা? না, তাকে রাখতে পারে নি ওয়াং। বেচারা বলদ খেতে পায় নি অনেক দিন ধরে। কী খাবে? মাঠে ঘাস নেই, ঘরে বিচালি নেই। যতদিন গাছে পাতা ছিল, তাই পেড়ে এনে ওকে খাইয়েছে ওয়াং। কিন্তু শেষে গাছের পাতাও ফুরিয়ে গেল। না খেয়ে মরতে যাচ্ছিল বলদটা—

ওলান বলল—"বলদটা মরবেই যখন—"

ওয়াং বলে—"কী বলতে চাইছ?"

ওলান বলল—"আমরাও মরতে বসেছি যখন, মানে বলদটার মাংসে কয়েকটা দিন বাঁচতে পারা যেত আর কি!"

ওয়াং রেগে উঠল—তারপর কেঁদে ফেলল। এ সংসারে আজ যতই অভাব হয়ে থাকুক,



ওয়াং বলে—"কী বলতে চাইছ?"

এতদিন তো লক্ষ্মীশ্রী ছিল! আর সে লক্ষ্মীশ্রী ওই বলদটারই দান তাকে আজ মেরে খাবে ওয়াং?

তবু তাই করতে হয়েছিল। ওয়াং তবু নিজের হাতে জল্লাদের কাজটা করতে পারে নি। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। কাজটা করেছিল ওলানই। তারপর সেই মাংস খেতে বসে কী কান্নাই কেঁদেছিল ওয়াং।

যাক্‌, সে সব মিটে গিয়েছে কয়েকদিন আগেই। এখন আর খাওয়ার মত কিছু নেই। দুটো ডলার যদিও হাতে আছে, খাদ্য পাবে কোথায় যে কিনবে? গাঁয়ে খাবার নেই। নেই শহরে। ধনীরা এ অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছে ঢের দিন আগে, গরিবও অনেক পালিয়েছে। গিয়েছে দক্ষিণদেশে, সেখানে নাকি অফুরন্ত খাবার। না খেয়ে মরার কথা সেখানে কল্পনাও করতে পারে না কেউ।

এই দুটো ডলার নিয়ে যদি ওয়াংরাও যায়? প্রস্তাবটা করতেই ওয়াং-এর বাবা সায় দিল তাতে। হ্যাঁ, তাই যাওয়া উচিত। আর, মাঝে মাঝে এ-রকম যাওয়া সবাইকেই যেতে হয় এ-দেশ থেকে। আকাল এই প্রথম নয়। ওয়াং-এর বাবা এর আগে আরও দুবার দক্ষিণ অঞ্চলে পালিয়েছিল প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

কিন্তু ওলান দু একদিন না গেলে যেতে পারছে না। তার আবার সন্তান হবে। দু একদিনের ভেতরই হবে।

ওয়াং ভাবে, শুকিয়ে হাড্ডিসার ওই দেহ, ও কি বাঁচবে এই ধকল সয়ে? এ-সময় যদি দুটো বীনের বীচিও চিবুতে পারত!

আপসোস করছিল পড়শী চিং-এর কাছে। চিং উঠে গেল আর এক মুঠো বীন এনে দিল একটু পরেই। তার শেষ সম্বল এটুকু, মাটির তলায় পুঁতে রেখেছিল নিজে না খেয়ে।

ওয়াং সেই বীন নিয়ে বুড়ো বাপকে দিল না, বাচ্চা ছেলে দুটোকে দিল না, দিল গিয়ে ওলানকে।

ওলান একটা একটা করে বীন চিবোয় শুয়ে শুয়ে।

পরের দিন একটা মেয়ে হল, তারপরের দিন ওয়াং সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। দরজায় শিকল তুলে দিয়ে ক্ষেত্রদেবতার মন্দিরের সামনে দিয়ে চলে গেল শহরে। বুড়ো বাপকে কাঁধে তুলে নিতে হল ওয়াং-এর। তার চলার শক্তি নেই।

শহরে গিয়ে রেলগাড়িতে চড়ল। ভাড়া? হ্যাঁ—দু ডলার আছে তার পকেটে।

২

গাড়ির সবগুলো যাত্রীই দক্ষিণদেশে যাচ্ছে। এমন অনেক লোক আছে তাদের মধ্যে যারা আগেও গিয়েছে ওদেশে। বছর বছর যাতায়াত করে, এমন লোকেরও অভাব নেই। হবে না কেন? মাত্র তো একশো মাইল রাস্তা! কতক্ষণ লাগে আর গাড়িতে চড়ে বসলে?

এই এক তাজ্জব কাণ্ড! বাড়িতে থাকতে ভয়েই সারা হচ্ছিল ওয়াং—অথর্ব একটা বুড়ো আর সদ্যপ্রসূতা এক নারীকে নিয়ে কেমন করে কতদিনে সে দক্ষিণের কোন শহরে পৌঁছোবে। ভেবেছিল—ছয়টা প্রাণীর গোটা তিনেককে হয়ত পথেই কবর দিয়ে যেতে হবে। রেলগাড়ি বলে একটা



একরাশি জহরৎ এনে ঢেলে দিল ওয়াং-এর সামনে



সঙ্গে সাক্ষাৎ রানীর

জিনিসের হালে আমদানি হয়েছে দেশে, এ খবরটা আগে কখনও শুনে থাকলেও সেটা মাথায় ছিল না ওয়াং-এর। বাড়ি ছেড়ে শহরে আসতে তখন অন্য দশজনের দেখাদেখি সেও গাড়িতে চড়ে বসল।

দক্ষিণদেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল দু-একজন অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছিল গাড়িতে। ওখানে পৌঁছে নতুন লোকদের কীভাবে চলা উচিত, তারই উপদেশ। গিয়েই সর্বপ্রথম কাজ হল একটা কুঁড়ে বেঁধে ফেলা।

কী দিয়ে বাঁধবে? সোজা উপায় হল—কয়েকখানা চাটাই কিনে নেওয়া। সেই চাটাই ধনুকের মত বাঁকিয়ে মাটির ওপর বসিয়ে দিলেই ঘর হয়ে গেল। জমি? রাস্তার ধারে, কোন বড় মানুষের পাঁচিলের গায়ে, যেখানে কয়েক হাত খালি জায়গা দেখবে, তুলে ফেলবে ঘর। কেউ নিষেধ করবে না, কেউ তাড়াবে না।

ঘর তৈরী হয়ে গেলে বাটি হাতে করে বেরিয়ে পড়। শহরে অনেক লঙ্গরখানা আছে, সেখানে এক পেনীতে এক বাটি ভাত মেলে। দলে দলে লোক যাচ্ছে লঙ্গরখানায়, পথ চিনতে কষ্ট হবে না। ব্যস, ভাত কিনে ওইখানে বসেই খেয়ে নাও, বাড়ি নিয়ে আসতে দেবে না। তারপর মরদেরা বেরোও কাজের খোঁজে, মেয়েরা আর বাচ্চারা বেরোও ভিক্ষেতে। দুটোই অঢেল পাওয়া যায়।

আগে থাকতে এই সব হদিশ পেয়ে যাওয়াতে সত্যিই ওয়াং-এর সুবিধা হয়ে গেল খুব। একশো মাইলের মাথায় একটা বড় শহরের টিকিট তাকে দিয়েছিল গার্ড। সব কয়জনের টিকিট কিনেও দু ডলারের ভেতর কিছু ফেরত পেল ওয়াং। কতকটা নিশ্চিন্দি। চাটাই কেনার আর দু একদিনের ভাত কেনার পয়সা তার এখনও আছে।

গন্তব্য শহরে নেমেই সে নিজের লোক কয়টিকে নিয়ে জায়গার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। খালি জায়গা পেলেই ঘর বাঁধা যাবে, শোনা আছে তার। বেশ কিছুদূর গিয়ে সে দেখে—রাস্তা থেকে একটু তফাতে বরাবর চলে গিয়েছে একটা লম্বা পাঁচিল, পেল্লায় উঁচু, ভেতরে কী আছে, তা কোনমতেই চোখে পড়ে না। সেই পাঁচিলের গায়ে গায়ে খোলা জায়গাটুকুতে চাটাইয়ের কুঁড়ে রয়েছে সারি সারি। তারই মত উদ্বাস্তুরা মাথা গুঁজে আছে সেই কুঁড়েগুলিতে।

আর এগুবার দরকার কী? এইখানেই ডেরা বাঁধা যাক। একটুখানি ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে ওলানের জিম্মায় বুড়োকে আর বাচ্চাগুলোকে সেইখানে বসিয়ে দিল ওয়াং, তারপর নিজে ছুটলো চাটাই কিনতে। খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর গিয়ে চাটাইপট্টি পাওয়া গেল। সারি সারি কেবলই চাটাইয়ের দোকান সেখানে। পাহাড়সমান চাটাই এক এক দোকানে। সে চারখানা চাটাই কিনল, দুই পেনী করে এক একখানা।

চাটাই নিয়ে যদিও এল, ও দিয়ে কেমন করে ঘর তৈরী হবে, তা বুঝে উঠতে পারে না ওয়াং। বাঁশ নয়, কাঠ নয়, দড়িদড়া নয়, শুধুই খানকতক চাটাই। ধনুকের মত বাঁকাতে হবে শুনেছিল গাড়িতে। বাঁকানোর কায়দাই পায় না ওয়াং। ভয় হয়, বাঁকাতে গেলেই ভেঙে যাবে।

● গুড আর্থ

দেখিয়ে দিল ওলান। উদ্বাস্তুজীবন তার এই প্রথম নয়। হোয়াং জমিদারবাড়িতে আশ্রয় পাবার আগে ছোট্ট ওলানকে বাপ মায়ের সঙ্গে এমনি দেশদেশান্তরে ঘুরতে হয়েছিল ক্ষুধার তাড়নায়। তখন চাটাইয়ের ঘরে বাসও করেছে মাঝে মাঝে। বাপকে দেখেছিল ঘর বাঁধতে, ওর তা মনে আছে এখনও। সুকৌশলে চাটাই বাঁকিয়ে ফেলল ধনুকের মত করে, তারপর দু প্রান্ত বসিয়ে দিল মাটিতে। দু ধারে ইট আর মাটির ঢেলা সাজিয়ে দিল, যাতে চাটাই ঠিক জায়গামত খাড়া হয়ে থাকতে পারে, ছিটকে বেরিয়ে না যায়।

হামা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কোনমতে উঁচু হয়ে বসা যায়, এমনিধারা কুঁড়ে তৈরি হল একখানা। দুখানা চাটাই গেল ঘরের জন্য। পেছন দিকে পাঁচিল, সমুখ দিকটাতে আচ্ছাদন দেওয়া হল একটা চাটাই খাড়া করে। বাকী রইল একখানা, সেইটে মাটিতে পেতে দেওয়া হল বুড়োর আর বাচ্চাদের জন্য।

ঘর বেঁধে রেখে সবাই দল বেঁধে বেরুলো লঙ্গরখানার খোঁজে। একজনের পায়ে পায়ে আর একজন, মিছিল করে বেরুলো ওরা। প্রত্যেকের হাতে বাটি আর কাঠি। বাটিতে করে ভাত নেবে। দু হাতে দুটো কাঠি ধরে তাই দিয়ে ভাত তুলে তুলে খাবে। ইওরোপের সাহেবরা খায় কাঁটাচামচ দিয়ে, চীনের সাহেবরা খায় দুটো কাঠির সাহায্যে, আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অসভ্যতা।

শত শত লোক লঙ্গরখানার দিকেই চলেছে। কী ভিড় সেই লঙ্গরখানায়! ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি, সবাই আগে ভাত পেতে চায়। পাচকেরা আশ্বাস দেয়—"ঠাণ্ডা হয়ে লাইনে দাঁড়াও, সব্বাই পাবে, বিস্তর ভাত আছে।" তা আছে সত্যিই। বিরাট বিরাট উনুন, বিশাল বিশাল কড়া, প্রত্যেকটাতে ভাত ফুটছে টগবগ করে। মেঝেতে চাটাই পেতে মজুদ রাখা হয়েছে, সেও এক ভাতের পাহাড়।

লাইনে দাঁড়িয়ে এক একজন করে ভাত নিচ্ছে। এক বাটি ভাত, তার সাথে এক হাতা মাড়। দাম এক পেনী। কী চমৎকার সাদা ভাত! কী সুন্দর গন্ধ! লাইন থেকে বেরিয়েই ওইখানে বসেই খেতে হবে। ওয়াং নিজের ঘরে নিয়ে খেতে চেয়েছিল। এক পুলিস পাহারা ছিল, সে বলল তা হবে না। সে-রকম নিয়ম নেই। এখানে যে ভাত এক পেনীতে পাওয়া যাচ্ছে, বাইরে গেলেই তার দাম চার পেনী। বাইরে নিয়ে যাবার হুকুম থাকলে অনেক দুষ্ট লোক তো ভাতের ব্যবসা শুরু করে দেবে! একবারের ভাত খেয়ে নিল, তারপর ঘুরে ঘুরে এসে লাইনে দাঁড়াল দশবার, তিন দশে ত্রিশ পেনী রোজগার হয়ে গেল। কে আর মুখ চিনে রাখছে বল!

* * *

আবার জীবনযাত্রায় একটা শৃঙ্খলা এসে গেল। সকালে উঠেই লঙ্গরখানা। এক বাটি ভাত খেয়ে নিয়ে ওয়াং বেরিয়ে পড়ে রিকশা টানতে, বাদবাকী সবাই ভিক্ষে করতে। ফিরে আসে সবাই সন্ধ্যের পরে। তারপর আবার লঙ্গরখানা, তারপর ঘুম।

একখানা রিকশা ভাড়া নিয়েছে ওয়াং, দৈনিক আধ ডলার তার ভাড়া। প্রথম প্রথম দু-চার দিন লাভ কিছু থাকত না, কোনমতে ভাড়ার পয়সাটা রোজগার হত ওয়াং-এর। কিন্তু দু-দিনেই ব্যবসার কায়দাগুলো রপ্ত করে নিল ওয়াং। নিজের পাওনাগণ্ডা আদায় করে নিতে শিখল। কোন্ লোকের সঙ্গে আগে দর-কষাকষি করে নেওয়া দরকার, কোন্ লোকের সঙ্গে তা আদবেই করতে নেই, তাও সে বুঝতে শিখল।

বিদেশী সাদা চামড়ার সাহেব মেম হাত নেড়ে ইশারা করলেই সে এখন ছুটে গিয়ে রিকশা নামিয়ে দিয়ে সেলাম করে, মজুরির কথাটি মুখে আনে না। জানে যে এ খদ্দের আশাতীত পারিশ্রমিক দেবে, একটা ডলারের কম কখনোই নয়। একদিন তো এক মেম তাকে ঝকঝকে দুটো ডলার বকশিশ দিয়ে দিল একেবারে। ওয়াং-এর স্বপ্নের অতীত।

এদিকে ওলান চুপ করে বসে নেই। সেই ছেলেবেলার আকালে ভিক্ষের হাতেখড়ি হয়েছিল তার। কায়দা কৌশলগুলো একটুখানি চেষ্টা করতেই মনে পড়ল আবার। ছেলেদের সে শিখিয়ে পড়িয়ে ওস্তাদ করে নিল ক্রমে। তারা এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চমৎকার ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদে—"হেই জমিদারবাবু, একটা পেনী দিয়ে যাও বাবু, বাচ্চা ছেলে কাল থেকে কিছু খাই নি বাবু, খিদেয় পেটটা জ্বলে যাচ্ছে বাবু, তোমার তো দয়ামায়া আছে! নিজের ছেলের কথা মনে করে একটা পেনী দিয়ে যাও বাবু! কর্তাদিকে কত পয়সা যাচ্ছে বাবু—আমায় দুটি ভাতের দাম দিয়ে যাও বাবু—"

একদিনেই যে পাকা ভিক্ষুক হতে পারল তারা, তা নয়। ছেলেরা তো মায়ের শিক্ষামত কাঁদুনি গাইতে গেলে প্রথম প্রথম মাঝপথে হেসে ফেলত। তখন আড়ালে ডেকে এনে ওলান কী মারই দিত তাদের! মার খেয়ে খেয়ে তারা ভিক্ষে তো শিখলই, ছোট ছেলেটা আবার চুরিও শিখল। ওয়াং যেদিন টের পেল চুরির কথাটা, সে আবার বেদম মারল ছোট ছেলেকে।

ভিক্ষে করতে পারে না শুধু বুড়ো বাবাটা। সে এখন একেবারেই জবুথবু হয়ে পড়েছে যেন। ওলান তাকে হাতে ধরে রাস্তার পাশে এক জায়গায় রোদ্দুরে বসিয়ে দিয়ে যায়, সে চুপ করে সেইখানে বসে থাকে আর অতীত দিনের স্বপ্ন দেখে কখনো জেগে, কখনো ঘুমিয়ে। সন্ধ্যার আগে ওলান এসে দেখে—বুড়োর সামনে কোনদিন দু একটা পেনী পড়ে আছে, কোনদিন কিছু না।

যা হোক, দিন চলে মোটামুটি একরকম। ওয়াং-এর মনটা ভেতরে ভেতরে গুমরে মরে শুধু। ভাবে তার বাড়ির কথা, তার স্বর্ণপ্রসূ ক্ষেতগুলির কথা। দক্ষিণের আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, এ মেঘ কি তার ক্ষেতেও বর্ষাবে না? যদি বর্ষায়, সেখনে চাষ দেবার কেউ নেই আজ, কতগুলো আগাছা জন্মাবে শুধু। সে যদি আজ বাড়ি যেতে পারত!

কিন্তু তারপরই বাস্তবের জ্ঞান ফিরে আসে অভাগার। বাড়ি গেলেও সে এখন কিছুই করতে পারবে না। খালি ক্ষেত থাকলে কিছু হয় না, লাঙ্গল গোরু দরকার, বীজ শস্য দরকার, কোদালি

নিড়ানি মই-টই কত কী যে চাই চাষের কাজে! কিছু নেই! একটা গোরু কিনতেই দেড়শো দুশো ডলার লেগে যাবে। কোথায় তা?

তবে কি সারা জীবন এই বিদেশে পড়ে সে রিকশাই টানতে থাকবে? আর তার স্ত্রীপুত্র রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইবে একটা করে পেনী, লঙ্গরখানায় ভাত কেনবার জন্য?

"হায় দেবতা! আমার সব নিলে একেবারে?"—এই বলে কোন্ এক সময় অভাগা ওয়াং কপালে করাঘাত করেছিল রাস্তায় বসে। ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। বসে ছিল রিকশার ছায়াতে।

একটা লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সে ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত একরকম হাসি হেসে সে বলল—"তোমার একারই নেয় নি দেবতা, নিয়েছে আমাদেরও। নিয়েছে দুনিয়ার চৌদ্দ-আনা মানুষের। তবে দেবে, আবার ফিরিয়ে দেবে। সে দিন আসছে।"

ওয়াং চিনল, এ তারই প্রতিবেশী। চাটাইকুঁড়ের বস্তিতে এ তার দুখানা কুঁড়ের পরেই থাকে।

"চোখ কান খোলা রাখো। বড়দের দিন ফুরিয়েছে—চোখ কান খোলা রাখো—" আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল লোকটা।

সত্যিই চোখ কান খোলা রাখল ওয়াং সেই থেকে। মাঝে মাঝে রাস্তায় এক একটা লোক দেখতে পায়, চট্ করে হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যায়। কাগজে কী সব লেখা। ওয়াং আপসোস করে—সে লিখতে পড়তে শেখে নি। সে অন্য রিকশাওলাদের বলে—"ভাই, এতে কী লেখা আছে?"

পড়তে কম লোকেই পারে। তবু তারা অজ্ঞ নয় ওয়াং-এর মত। তারা বলে—"বিপ্লব আসছে। সব সমান হয়ে যাবে। বড়দের পয়সার বখরা আমরাও পাব। সেই সব লেখা আছে ওতে।"

ওয়াং চমৎকৃত হয়। বড়দের পয়সার বখরা? তা পেলে তো বড় ভাল হয়! ওয়াং তত বেশীও চায় না। একটা বলদ আর কিছু বীজশস্যের দাম। তা পেলেই সে দেশে ফেরে।

* * *

আগে শুধু ইস্তাহার বিলি হত, এখন বক্তৃতা শোনা যায়। রিকশা নিয়ে ছুটতে ছুটতে ওয়াং একদিন দেখতে পায়—কোন চৌমাথায় হয়ত একটা টবের ওপর দাঁড়িয়ে বেণী-কাটা কোন যুবক চেঁচিয়ে বলছে—"ভাই সব! জাগো! জাগবার দিন এসে গিয়েছে। যারা তোমায় আমায় শুষে খেয়েছে এতদিন, তাদের রক্ত আবার আমরা শুষব, তার দিন এসে গিয়েছে। চোখ কান খোলা রাখো —ভাই সব!"

বক্তৃতা বেশীদূর এগুতে পায় না। হল্লা করে পুলিস আসে। বক্তা সময় থাকতে পালাতে না পারে যদি, তবে তাকে বেঁধে নিয়ে যায় কয়েদখানায় পোরবার জন্য।

একটা বছর কেটে গিয়েছে। বর্ষা হয়েছিল, অন্ততঃ এদিকে হয়েছিল। ওয়াং ভাবে তার উত্তর অঞ্চলেও হয়েছে। জমিগুলো বন্ধ্যা পড়ে রইল, সে বেঁচে থাকতেও তার জমিতে চাষ পড়ল না। সে এখানে রিকশা টানছে, তার স্ত্রী পুত্র ভিক্ষা করছে এই বিদেশে পথে পথে—হায়রে নিষ্ঠুর দেবতা!

একদিন সে রিকশা নিয়ে বসে আছে রাস্তায়, হাজার লোক চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। হঠাৎ সব লোক ছুটতে লাগল। এলোপাতাড়ি দৌড়। সবাই গলি ঘুঁজিতে ঢুকতে চায়, কোনো অচেনা বাড়ির দরজা খোলা দেখতে পেলে, জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ঢুকে পড়ে তার ভেতর।

ওয়াং ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে—"কী হল? ছুটছ কেন?" অনেকেই উত্তর দেয় না। দৌড়ে পালায়। একজন শুধু ছুটতে ছুটতে বলল—"পালাও, পালাও, পল্টন আসছে, ধরে নিয়ে যাবে। বাঁচতে চাও তো পালাও—"

পল্টন? পল্টন তো লড়াই করে! এখানে লড়াই কোথায়? কিন্তু সবাই পালাচ্ছে যখন, তখন ভয়ের কারণ আছেই কিছু। ওয়াং রিকশাখানাকে একটা গলির ভেতর ঠেলে দিয়ে তড়াক করে এক দোকানে ঢুকে পড়ল। দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করে নি, কারণ সে নিজে বুড়ো তাকে কেউ ধরবে না।

সে ইশারায় ওয়াংকে লুকোতে বলল এক রাশ বস্তার পেছনে। তারপর শব্দ শোনা যেতে লাগল—বহু বুট-পরা পায়ের শব্দ—দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌! মাটি কাঁপছে সে-শব্দে।

পল্টন এল, গেল। ওয়াং বেরিয়ে পড়তে চায়, বুড়ো দোকানী নিষেধ করে—"আর একদল তো থাকতে পারে পেছনে! এখন রাস্তায় যেও না।"

ওয়াংকে সব বোঝাতে লাগল বুড়ো। যুদ্ধ বেধেছে। সৈন্য সব যুদ্ধে যাচ্ছে। মজুর দরকার, হাজারে হাজার। রাস্তা করবার জন্য, বোঝা বইবার জন্য। শক্তসমর্থ খেটে-খাওয়া লোক দেখলেই ধরছে। ধরাই চিরদিনের রীতি। বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাবে, দূরদূরান্তরে, হাজার দু-হাজার মাইল দূরে। বেঁচে ফিরবে খুব কম লোকই। এ সময় ওয়াং-এর মত যুবকদের রাস্তায় বেরুনোতে বিপদ আছে।

সেই দিনই রিকশা নিয়ে মালিকের কাছে জমা দিয়ে এল ওয়াং, সে আর রিকশা টানবে না। দিনের বেলা সে ঘরের বাইরে আসবে না।

ওয়াং কয়েকদিন রাতের বেলায় গাড়ি বোঝাইয়ের কাজ করল। তারপর সে-কাজ গেল বন্ধ হয়ে, কারণ যুদ্ধ লেগেছে। ব্যবসা মন্দা, মাল আর চালান হয় না। ওয়াং-এর কাজ বন্ধ। রোজগার বন্ধ।

ওলানেরাও ভিক্ষে পায় না। রাস্তায় লোক চলাচলই নেই। ভিক্ষে দেবে কে? যা দু-চার ডলার জমেছিল, তাই ভেঙে লঙ্গরখানার খরচ চলতে লাগল। তারপর একদিন শহরের সব লঙ্গরখানাই বন্ধ

হতে লাগল একটা একটা করে। যেসব ধনীর পয়সায় চলত লঙ্গরখানাগুলি, তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কারণ যুদ্ধে হার হচ্ছে। শত্রু কখন শহরে এসে পড়ে ঠিক নেই।

একদিন রাত্রে চাটাই-ঘরে শুয়ে আছে ওয়াং-এরা, তখনও ঘুমোয় নি। হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে হাজার মানুষের চিৎকার. সে কী দানবীয় কোলাহল!

ওয়াং-এর কুঁড়ের পাশ দিয়ে সেই লোকটা ছুটে যায়, সেই যে প্রতিবেশীটা ওকে সেদিন রাস্তায় বলেছিল—"চোখ কান খোলা রাখো!"

ছুটে যেতে যেতে সে ডাক দিয়ে যায়—"ওরে কুড়ের সর্দার! ওঠ্, ওঠ্! বখরা নিবি তো আয়, দিন এসে গিয়েছে!"

ছুটে বেরুলো ওয়াং, ছুটে বেরুলো ওলানও, কুঁড়ের ঝাঁপ টেনে দিয়ে। যে পাঁচিলের গায়ে ওদের বস্তি, তারই ওদিককার দেউড়িতে কোলাহল। ওরা মোড় ঘুরে গিয়ে দেখে—

বড় দেউড়ি ভেঙে পড়েছে, পিলপিল করে লোক ঢুকছে ভেতরে। পাঁচিলের ভেতরে যে কী আছে, এতদিন ওয়াং জানত না. আজ দেখে, বড় বড় গাছে ঘেরা এক বিশাল রাজপুরী সেখানে! লোকগুলো "মার-মার" করতে করতে সেই পুরীতে ঢুকে পড়ল। আসবাবপত্র টেনে বার করতে লাগল, টেনে নিয়ে যেতে লাগল। যে যা হাতে পাচ্ছে, ছাড়ছে না কিচ্ছু।

ওয়াং চোর নয়, ডাকাতও নয়। লুটতরাজ সে পছন্দ করে না। এভাবে বখরা নেবার কথা সে কোনদিন ভাবে নি। সে লুটেরার দলে মিশল না। সোজা চলে গেল মহলের পর মহল পেরিয়ে একেবারে অন্দরে। ওলান যে তার পেছনে ছিল, সেকথাও তখন তার মনে নেই।

অন্দরে জনপ্রাণী নেই। রাজপুরীর সব পালিয়েছে। একটা লোক শুধু পালাতে পারে নি এখনও, সে সমুখে পড়ে গেল ওয়াং-এর। ওকে দেখেই সেই সাটিনের জামা পরা ধুমসো মোটা লোকটা কেঁদে বলল—"আমায় প্রাণে মেরো না বাবা, যা আছে সব দিচ্ছি।"

"দে"—বলে হুংকার দিল ওয়াং। সে যে ডাকাত নয়, তা আর তার মনে নেই তখন।

রাত্রে যখন সে বাড়ি ফিরল, তখন তার গা আদুড়। গায়ের কোর্তায় বেঁধে এনেছে সে গাদা গাদা মোহর। সোনা! সোনা! সোনার মোহর গাদা গাদা!

পরদিন সকালের গাড়িতেই ওয়াং-এরা দেশে ফিরল।

৩

নিজের শহরে নেমেই সকলের আগে যে জিনিসটা ওয়াং-এর চোখে পড়ল, সে হল এক জোড়া বলদ। রাস্তার ধারেই মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছিল এক চাষা। কী চমৎকার বলদ দুটি তার! অমন বলিষ্ঠ, তাজা, তেজী বলদ এর আগে কখনও দেখে নি ওয়াং। তার দুর্দম বাসনা হল—এই বলদ জোড়াটি সে কিনবেই।

পথ থেকে মাঠে নেমে দেশের হাল-চাল জিজ্ঞাসা করল ওয়াং। গল্প করতে পেলে চীনেরা আর কিছু চায় না। অবশ্য কাজ করতে করতেই গল্প করে। গল্পের খাতিরে হাত-পাকে বিশ্রাম দেয় না।

"না, গেল বছর বৃষ্টি হয় নি তো! তিন বছর বাদে এবারই দেবতার দয়া হয়েছে এ তল্লাটে। তিন বছর বাদে বলদ নামিয়েছি মাঠে।"—বলে লোকটা।

বলদ দৌড়োয়, চালক দৌড়োয়, ওয়াং পাশে পাশে দৌড়োয়। "বলদজোড়াটি বেচলে আমি কিনতাম"—বলে কোন ভূমিকা না করে।

চাষী একবার পরিহাসের দৃষ্টিতে তাকায় ওয়াং-এর দিকে—"বেচলে তো! আমার এমন কিছু দরকার পড়ে নি যে গোরু বেচতে হবে। তাছাড়া, আমার নিজের ক্ষেত-গুলো চষতে হবে না বুঝি?"



"দে"—বলে হুংকার দিল ওয়াং।   পৃঃ—৫৪

"আরে তুমি আর এক জোড়া কিনে নাও না! এমন দাম দেব যে নতুন বলদ কিনেও বেশ কিছু মুনাফা তুমি ঘরে তুলতে পারবে।"

চাষী শক্তই ছিল, ক্রমে নরম হল। নগদ পাঁচশো ডলারে বলদ জোড়া বেচল। কথা ঠিকই। দুশো ডলার এ থেকে সে সরিয়ে রাখতে পারবে অনায়াসে। এত ভাল গোরু না হলেও চলবে তার। মোটামুটি কাজ চালাবার মতন এক জোড়া জন্তু তিনশো ডলারেই হবে।

শহরে ঢুকেও কিছু সওদা করবার আছে ওয়াং-এর। বীজ! ধান গম বীন ভুট্টা পেঁয়াজ রসুন কপি শালগম—সব রকমের বীজ। উৎকৃষ্ট বীজ ছাড়া সে কিনবে না।

বস্তা বোঝাই বীজ বলদের পিঠে চাপিয়ে বাড়ি গিয়ে ঢুকল ওয়াং। বাড়ির কী শ্রী হয়েছে। চালে খড় নেই। দেয়াল থেকে মাটি খুলে খুলে পড়ছে। রক্ষা যে বর্ষা হয় নি গত বছর। এবারও

এই সবে বর্ষার শুরু। খড় কিনে এনে চাল মেরামত করতে হবে এক্ষুনি। খড়ের দাম বেশী? তা যতই বেশী হোক, ওয়াং-এর আটকাবে না।

পড়শীদের ভেতর যারা বেঁচে আছে, তারা এসে দেখা করল। কী চেহারা তাদের! হাড়গুলো নড়বড় করছে চামড়ার খোলসের ভেতরে। চিং এল. ওয়াং তার হাত ধরে বলল—"কী খেয়ে বেঁচে ছিলে ভাই?"

"কী না খেয়েছি, তাই বরং জিজ্ঞাসা কর"—বলে চিং। তার মেয়েটা মারা গিয়েছে, বউও মারা গিয়েছে। সংসারে সে একা, এখন বাঁচা মরা সমান তার পক্ষে।

"মরবে কেন? দিন ফিরবে এবার। চাষ-বাস কর, আবার সংসার জমে উঠবে।"

"চাষ করব? কী দিয়ে চাষ করব? গোরু নেই, বীজ নেই—"

"বীজ আমি দেব, আমার গোরু দিয়ে আগে তোমার জমি চষে দেব. তারপর চষব নিজের জমি"—

আসন্নপ্রসবা ওলান যখন অনাহারে মরছিল, এক মুঠো বীন দিয়ে তার জীবনটা বাঁচিয়েছিল এই চিং, তা ওয়াং ভোলে নি। কোনদিন পারবে না ভুলতে। সেই এক মুঠো বীনের ঋণ সে শোধ করতে চায় এবার।

চাষ শুরু হল। গাঁয়ের অন্য কৃষকেরাও চাষ করতে চায়। গোরু কারও নেই, বীজও না। সবাই ধার চায় ওয়াং-এর কাছে। কারণ ওয়াং যে দক্ষিণদেশ থেকে নগদ বেশ কিছু নিয়ে এসেছে, তা তো ওর হালচাল দেখেই বোঝা যায়।

ধার ওয়াং দিল না। তবে বলল—"দু এক একর করে জমি বেচে দাও আমার কাছে, নগদ টাকা নিয়ে বাকী জমি চাষ কর।"

পরামর্শ মন্দ নয়। ঋণের যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা। ও-দায় ঘাড়ে করার চেয়ে এক একর দু একর জমি বেচে দেওয়া ভাল।

অনেক জমি ওয়াং-এর ছিল। আরও অনেক হল। ও এখন মস্ত-বড় ভূস্বামী। চাষ হল, ফসল হল ষোল আনা। তিন বছরে পতিত জমি এবার হেসে উঠল সোনার শস্যে। ওয়াং-এর ঘরে ফসল যা উঠল, তা রাখবার জায়গা নেই। নতুন একটা মহলই সে তুলে ফেলল বাড়িতে, শুধু ফসল রাখবার জন্য।

একা এত ফসলের তদ্বির করা যায় না। চিংকে সে নিজের সাথে জুটিয়ে নিল। তার জমিগুলো কিনে নিল উচিত দামে, তারপর নিজেরই সংসারভুক্ত করে নিল তাকে। সে ওয়াং-এর সব চাষবাস দেখবে, মাইনে পাবে, খেতে পাবে।

ওয়াং মাইনে করে মজুর রেখেছে আরও। ওলানকে আর সে মাঠে খাটতে দেয় না। দুটি ছেলেকে ইস্কুলে দিয়েছে।

কেবল ওই মেয়েটা তার যত দুঃখের কারণ। তিন বছর বয়স ওর, ওর দাঁত ওঠে নি, কথা বলতে পারে না। একেবারে হাবা, কোন কিছু বোঝে না, খিদে পেলেও কাঁদে না। কারও দিকে

চোখ পড়লেই অর্থহীন একটা হাসি ফোটে তার মুখে। বিশেষ করে বাবার দিকে তাকালে। ওয়াংকে সে সব চাইতে বেশী চেনে, সব চাইতে বেশী ভালবাসে।

ওয়াং বুঝতে পারে না, তার ষোল আনা সুখের সঙ্গে দেবতা কেন এই একটুখানি দুঃখের খাদ মিশিয়ে দিয়েছেন।

* * *

গ্রামে ফিরে অবধি ওয়াং তার কাকার আর কোন খবর পায় নি। পড়শীরা বলেছে—সে নাকি দুর্ভিক্ষের শুরুতেই গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তারপর আর তাকে দেখা যায় নি। বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে—কেউ বলতে পারে না।

হঠাৎ সেই কাকা একদিন এসে হাজির, একা নয়, সঙ্গে তার স্ত্রী আছে এবং তার পুত্ররত্নও। এদের নিজের বাড়িঘর ভেঙেচুরে গিয়েছে। জমিজমা এরা বেচে খেয়েছে অনেকদিন আগে। সুতরাং এরা এসে এখন একেবারে ওয়াং-এর বাড়িতে কায়েমী ভাবেই উঠে বসল।

ওয়াং-এর এখন দেদার পয়সা, তিনটে লোক বসে খাবে, তাতে তার গায়ে লাগবে না কিছু। কিন্তু অঙ্গ জ্বলে যায় ওদের ব্যবহারে। দাবির আর জুলুমের অন্ত নেই এদের। এটা দাও, ওটা না হলে চলবে না—এই তাদের মুখের বুলি। এক এক সময় ওয়াং-এর ইচ্ছে হয়—দূর করে দেয় ঘাড় ধরে। কিন্তু পারে না। কারণ, কাকা ডাকাতের দলের লোক। আজকাল ওয়াং-এর নাম রটে গিয়েছে বড়লোক বলে। কাকা যতদিন বাড়িতে আছে, ততদিন কোন ভয় নেই ওয়াং-এর। ওকে তাড়ালে পরদিনই ডাকাত পড়ে তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে যাবে। জানও মেরে দিয়ে যেতে পারে। থাকুক কাকা।

তবে একটা ফন্দি বাতলে দিল ওর বড় ছেলে নাং-এন। ছোকরার মাথা খুব সাফ। বলল—"ওরা থাকুক। কিন্তু ওদের আফিংয়ে বুঁদ করে রাখো। যাতে কোন উৎপাত করতে না পারে।"

তাই করল ওয়াং। প্রথম প্রথম তামাকে আফিং মেখে সেই তামাক খেতে দিত। তারপর ধরিয়ে দিল চণ্ডু। এখন কাকা আর খুড়ী দুজনই চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটায়। কোন ঝামেলা নেই ওদের নিয়ে।

কাকার ছেলেটা যুদ্ধে চলে গেল।

সত্যই ওয়াং-এর কাকার কল্যাণে এ-বাড়িতে ডাকাতের উৎপাত হয় নি কোন দিন। ওয়াং ছাড়া কোন্ বড়লোকটা ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এদেশে? অমন যে ডাকসাইটে হোয়াং জমিদারেরা—তাদেরও বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল আকালের সময়। টাকাপয়সা আসবাবপত্র কিছু আর রেখে গেল না ডাকাতেরা। লোকে বলে বাড়ির চাকরেরাও ডাকাতের দলে ছিল। সেই যে দরোয়ানটা—যার মুখে আঁচিলের ওপর তিনটে চুল, সে তো ছিলই। তার ওই আঁচিল দেখেই চিনেছিল লোকে।

যা-ই হোক, সেই থেকে হোয়াংদের অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেরা বিদেশে থাকে। এখানে

আছেন শুধু বুড়ো জমিদার। একটা দাসী তাঁর দেখাশোনা করে। কর্ত্রী ঠাকুরানী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন চণ্ডু খেতে না পেয়ে! চণ্ডুর খরচা দারুণ খরচ, কে তা যোগাবে এই পড়তি দশায়?

বুড়ো জমিদার জমিজমা সব বেচে ফেলার চেষ্টায় আছেন। এ পরামর্শ দিয়েছে ওই দাসী। নগদ পয়সার আমদানি হলে সেটার কিছু অংশ এখন সেই হাতিয়ে নিতে পারবে, কারণ জমিদার এখন তার হাতের পুতুল হয়ে পড়েছেন।

অনেক অনেক অর্থের দরকার হোয়াংদের সব জমি কিনতে। খন্দের জুটছে না সেজন্যই। ওয়াং বলাবলি করে—যদি টাকা থাকত কিছু জমি অন্ততঃ সে কিনত। জমি ওর প্রচুর হয়েছে, কিন্তু জমির ক্ষুধা মেটে নি ওর।

শুনে শুনে ওলান একদিন আশ্চর্য কাণ্ড করল একটা। এক রাশি জহরত এনে ঢেলে দিল ওয়াং-এর সামনে। হীরে, মানিক, মুক্তো! ঘরখানা যেন সূর্যের আলোকে ঝলসাতে লাগল।

"এ সব কোথায় পেলে?"—অবাক্ হয়ে ওয়াং জিজ্ঞাসা করে।

"তুমি যেখানে মোহর পেয়েছিলে, সেইখানেই। দক্ষিণের সেই রাজপুরীতে। লুটেরা-গুলো দেখতে পায় নি। আমি পেয়েছিলাম। বড় একখানা ঘরে দেয়ালের ইট আলগা ছিল একখানা। হোয়াং-বাবুদের বাড়িতে আমি দেখেছিলাম তো! জানি যে বড়লোকেরা দেয়ালের ভেতর গর্ত করে ধনরত্ন লুকিয়ে রাখে। ওই ইটখানা সরাতেই পেয়ে গেলাম এইগুলি—"

দুটো মুক্তো শুধু ওলান রেখে দিল। বাকী সব জহরত নিয়ে ওয়াং চলে গেল জমিদারবাড়িতে। দরদস্তুর ঠিকমত হল না। কারণ জমির দামও জমিদার জানেন না, জহরতের দামও ওয়াং জানে না। তা না জানুক, জহরতগুলো দেখে দাসীটার লোভ হল নিদারুণ। তারই উত্তেজনায় পড়ে জমিদার বিক্রি-দলিল লিখে দিলেন। তাঁর যেখানে যত জমি আছে সব।

বলা বাহুল্য, জহরতগুলি দাসীটার হাতেই চলে গেল।

* * *

দীর্ঘ দিন কেটে যায় একটানা সমৃদ্ধির মাঝে। মাঝে একবার বানে ভেসে গিয়েছিল সারা দেশ, ওয়াং-এর সব মাঠে মাথা সমান জল। চাষ হল না, কিন্তু ওয়াং-এর তাতে কী? তার টিলার মাথায় বাড়ি, সেখানে মরাইয়ে মরাইয়ে তিন বৎসরের খাদ্য মজুদ।

তারপর একবার পঙ্গপালে ছেয়ে গেল সারা দেশ। ওয়াং মাঠের মাঝে মাঝে এক একখানা শস্যভরা ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দিল। গমের গাছ জ্বলতে থাকে আর পঙ্গপালেরা এসে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইভাবে কিছু ক্ষেত জ্বালিয়ে দিয়ে বাকী ক্ষেতগুলি রক্ষা করল ওয়াং। লোকসান যতটা হতে পারত, হল তার অর্ধেক।

সমৃদ্ধির গাঙে একটানা জোয়ার। শত শত মজুর ক্রমাগত চষে যাচ্ছে। খবরদারি করে চিং।

ওয়াং এক একদিন এক এক মাঠে গিয়ে দেখে শুনে আসে। ক্ষেত্রদেবতার মন্দিরে ধূপকাঠি জ্বালায়, এখন ওর দেবতার ওপর বড় ভক্তি।

এদিকে বুড়ো বাবা মারা গেল—আর, সবচেয়ে দুঃখের কথা—মারা গেল ওলান। মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে সে বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল অনেক আগে থেকেই।

কাকা মারা গেল, চিং মারা গেল। সবাইকে সমারোহের সঙ্গে কবর দিল ওয়াং। বড় জমিদারদের মত সে একটা পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সে স্থান। শুধু ওয়াং পরিবারের লোক ছাড়া কারও সমাধি সেখানে হবে না।

হোয়াং জমিদারও মারা গিয়েছেন। তাঁর বাড়িটা বিক্রি হবে। সেই শত-মহলা পুরী, যেখান থেকে একদিন ওয়াং এনেছিল ওলানকে একটা টিনের বাক্সসমেত। বড় ছেলে নাং-এন এসে বাবাকে বলল—"বাড়িটা আমরা নিই না কেন!"

নিল ওয়াং বাড়িটা। অতবড় বাড়ির উচিত দাম তো ওখানে হতে পারে না! সস্তাতেই পাওয়া গেল। অবশ্য মেরামত করতে, নতুন আসবাবপত্র কিনে ওকে সাজাতে, আরও হাজার হাজার ডলার ব্যয় হল বইকি! তা ওয়াং-এর তো অভাব নেই!

সবাই উঠে এল শহরে, জমিদারবাড়িতে বাস করতে। দেশের লোকের কাছে ওয়াং-এর নাম এখন জমিদারবাবু। কিন্তু কি জানি কেন, এখানে বাস করে শান্তি পায় না ওয়াং। ঘর-ভরা নাতি-নাতনী. তাদের সঙ্গ মন্দ লাগে না, তা ঠিক, কিন্তু মনটা মাঝে মাঝেই হুহু করে ওঠে তার সেই গাঁয়ের বাড়ির জন্য. যেখানে দিগন্তবিসারী মাঠে হাওয়া বইছে পাকা ফসলের গন্ধে মাতাল হয়ে।

শেষ জীবনে ওয়াং এখন গ্রামের সেই মেটে বাড়িতেই বাস করতে চায়। বয়স হল পঁয়ষট্টি। দেহ হয়েছে জরাজীর্ণ, কয়দিন আর বাঁচবে? একটি মাত্র দাসী আর হাবা-বোবা মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াং এসে সেই মেটে বাড়িতে উঠল আবার।

থাকে থাকে মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়, থাকে থাকে কবরখানায় গিয়ে আপনার জনদের কবরগুলি দেখে। এদেরই মাঝখানে নিজের কবরের জন্য একটা জায়গা সে বাছাই করে রেখেছে। একটা কফিন কিনিয়ে এনেছে বড় ছেলেকে দিয়ে। সে কফিন তার শোবার ঘরেই থাকে।

মাঝে মাঝে ছেলেরা আসে তাকে দেখতে। তাকে দেখার পর তারা মাঠ দেখতে যায়। ছোট ছেলে নাং-ওয়েন ধান-চাল চালান দেওয়ার ব্যবসা খুলেছে একটা। জমিজমার চাইতে ব্যবসাবাণিজ্য সে বোঝে ভাল, জানে চাষের চাইতে বাণিজ্যে লাভ বেশী।

একদিন দু ছেলে বাপকে দেখেটেখে মাঠের দিকে চলে গিয়েছে। পেছনে পেছনে ওয়াংও গেল। ছেলেরা তাকে দেখে নি, নিজেদের আলোচনাতেই মশগুল।

● গুড আর্থ

পেছন থেকে নিকটে গিয়ে দাঁড়াতেই ওয়াং শুনতে পেল—ছোট ছেলে বড়কে বলছে—"এই জমিগুলো বেচে দিয়ে টাকাটা ব্যবসায় খাটানো যাক, অনেক বেশী লাভ দাদা, অনেক বেশী লাভ!"

বড় ছেলে সায় দিল—"তা লাভ যখন, বেচেই দেব।"

ওয়াং-এর বুক চিরে একটা আর্তনাদ বেরুলো—"কী? কী? জমি বেচবি? জমি বেচবি? আমার কলিজার হাড়, ধমনীর রক্ত, মাটি-মাকে বেচবি তোরা? জানিস না—এই মাটির দৌলতেই আমার সব?"

বলতে বলতে থরথর করে কেঁপে বৃদ্ধ ওয়াং মাটিতে বসে পড়ল দু হাতে মাটি চেপে ধরে।

দু ছেলে তাড়াতাড়ি এসে ধরল তাকে—"না বাবা! না বাবা! কেন বেচব? তুমি ভুল শুনেছ। জমি কেন বেচব?"

ওয়াং বসে আছে। তার মাথার ওপর দিয়ে দু ভাই এ ওর মুখের পানে চায়, দু-জনেরই মুখে কুটিল চাপা হাসি।

● লেখক পরিচিতি



পার্ল বাক

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পার্ল বাক জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল সিডন-স্টিকলার। লসিং বাক ছিলেন তাঁর প্রথম স্বামী। যদিও ইনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, পূর্ব স্বামীর নামেই এখনও ইনি পরিচিত। এই দ্বিতীয় স্বামীর নাম রিচার্ড ওয়াল্শ। পার্লের অধিকাংশ পুস্তকেব ইনিই প্রকাশক। এ'রই সহযোগিতায় ইনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ওয়েলকাম হাউস নামে শিশু-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রাচ্যের শিশুদের এনে মার্কিন পরিবেশে লালন কববার জন্য।

পার্ল বার্ক বহু দেশ পর্যটন করেছেন। চীনদেশের নানকিং শহরে বসেই তিনি রচনা করেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'গুড আর্থ'। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এ-বই প্রথম প্রকাশিত হয়। সেইদিন থেকে এর বিশ্বজোড়া দিগ্বিজয় চলেছে অব্যাহত ভাবে। ওই বৎসরই মার্কিন সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত হয় এই বই, এবং লেখিকা বহু আকাঙ্ক্ষিত পুলিটজার পুরস্কারে সম্মানিত হন। হাওয়েলস মেডালও যথাসময়ে তিনি লাভ করেন, সাবা দেশের পঞ্চবার্ষিক বিচারে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের রচয়িত্রী হিসেবে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্মান নোবেল প্রাইজ।

একুশটি ভাষায় এ-যাবৎ অনুবাদ হয়েছে গুড আর্থ-এব। মূল ইংরেজী বইখানি যুগপৎ প্রকাশিত হয়ে চলেছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে, বৎসরের পর বৎসব, তবু এর জনপ্রিয়তা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পাচ্ছে ক্রমশঃ।

পার্ল বাকের অন্যান্য বই হচ্ছে ড্রাগন সীড, হাউস ডিভাইডেড, আদাব গডস্ প্রভৃতি। গুড আর্থ-এর মত অতখানি না হলেও, এসব বইয়েরও প্রভূত জনপ্রিয়তা বয়েছে।

মানবজাতির অশেষ সৌভাগ্য, এই মহামনস্বিনী লেখিকা আজও নরদেহে বিবাজমানা, পবিপূর্ণ সৃজনী প্রতিভার অধিকার নিয়ে। তাঁর লেখনী থেকে আজও কালজয়ী সৃষ্টির প্রত্যাশা আছে মানুষের।

ইদানীং তিনি ভারতভ্রমণ করে গিয়েছেন, ভারতীয় পরিবেশে তাঁর কোন এক কাহিনীর চিত্ররূপ তুলবার ব্যবস্থা করবার জন্য।

পার্ল বাক দীর্ঘজীবিনী হোন।



কিডন্যাপড

সন্ধ্যা তখনও হয় নি। টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চোখে নীচের বাড়িখানার দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড।

ওই বাড়িতেই তাকে যেতে হবে। লোকে বলছে—ওইটিই শো-এর জমিদারবাড়ি। কিন্তু এ কী রকম জমিদারবাড়ি, তা কে জানে। বাড়িটা বড় বটে, চারদিকে জমিজায়গাও আছে অনেক, কিন্তু এ-রকম হতচ্ছাড়া চেহারা কেন এর? দোতলা থেকে শুরু করে পাঁচতলা পর্যন্ত গোটা পশ্চিম দিকটাই বিলকুল খোলা। সারা উপত্যকায় সাঁঝের আঁধার ইতিমধ্যেই ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু ওপরদিকের পশ্চিমের কুঠরিগুলো হাঁ করে আছে অস্তসূর্যের আলো আঁজলা ভরে গেলবার জন্য। ভেতরের দেয়াল দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ির কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে একটা, পাল্লাবিহীন জানালাদরজার ফোকর দিয়ে উপত্যকার পূর্বাংশ দেখা যাচ্ছে আঁধারকালো, রহস্যভরা।

পথ চলতে চলতে অনেক লোকের কাছেই খবর নিয়েছে ডেভিড, এই বাড়ির সম্বন্ধে। বাড়ির প্রসঙ্গে বাড়ির মালিকের কথাও উঠে পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। একবাক্যে সবাই বলেছে—মালিকটি অতি অসৎ লোক। কী তার দোষ, তা কেউ স্পষ্ট করে বলে নি। কিন্তু প্রত্যেকে সরল,

জোরালো ভাষায় পরামর্শ দিয়েছে ডেভিডকে—'যেও না বাপু সেখানে, ও-লোকের সংস্রবেই যেও না।' একটা স্ত্রীলোক তো আঙ্গুল মটকে অভিশাপই দিয়েছে শো-এর জমিদারকে. বলেছে—এমন দিন যায় না যেদিন সে তাকে ঠিক ওইরকমভাবেই অভিশাপ না দেয়।

সব দেখে শুনে ডেভিডের মনে বিতৃষ্ণা জেগেছে দারুণ। উপায় থাকলে সে এক্ষুনি আবার ইসেনডিনে ফিরে যেত। সেখানে বাবা, মা আর বেঁচে নেই বটে, কিন্তু পাদরি ক্যাম্বেল এখনও রয়েছেন, তাঁর কাছে ডেভিড আশ্রয় পাবে, স্নেহও পাবে।

কিন্তু উপায় নেই, ওই বাড়িতে না গিয়ে ডেভিডের উপায় নেই। তার বাপ মৃত্যুকালে একখানি আঁটা চিঠি তার হাতে দিয়ে গিয়েছেন, ওই শো-এর জমিদারের নামে সে-চিঠি। চিঠি তাকে নির্দিষ্ট স্থানে পেঁাছে দিতেই হবে, তার পিতার শেষ আদেশ পালন করতেই হবে তাকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাহাড় থেকে নামতে লাগল ডেভিড। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় একমাত্র লোকালয় ওই ভাঙা রাক্ষুসে বাড়িটা। নামতে নামতে ডেভিড দেখছে—দোতলা থেকে আলো নিবে যাচ্ছে—তারপর তেতলা থেকে—তারপর চারতলা, পাঁচতলা থেকেও। বাড়ীটা যেন যক্ষপুরী. কোন দিক থেকে একটি আলোর রেখা চোখে পড়ে না।

অতি সরু পায়ে-চলা পথ। এত বড় বাড়িতে ঢোকবার এই রকম রাস্তা? ডেভিডের মনে পড়ল—পথে এক গাড়োয়ান বলেছিল—বর্তমান জমিদার এবেনেজারের বাবা এই বাড়ি তৈরি করতে করতে মারা যান। সর্বাঙ্গসুন্দর করে সম্পূর্ণ করবার মত অর্থ তাঁর মজুদই ছিল, কিন্তু এবেনেজার আর সে পথে গেলেন না। বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির কাজ বন্ধ করে দিলেন। তারই ফলে—এখন মাত্র একতলার ঘরগুলিই বাসযোগ্য, আর দোতলার দু তিনখানা। বাদ বাকী সমস্ত কুঠরিই অকেজো।

যে-বাড়ির বেশির ভাগ ঘরই সম্পূর্ণ হয় নি. তার রাস্তা আর কত ভাল হবে? ডেভিড সাবধানে সেই সরু পথরেখা ধরে অগ্রসর হতে লাগল। বাড়ির সমুখে দুই বৃহৎ স্তম্ভ, এখানে সিংহদ্বারে তৈরি হতে হতে আর হয় নি। আগড় দিয়ে আটকানো। তারই পাশ দিয়ে গলে ডেভিড বাড়ির দরজায় পেঁাছোল।

এতক্ষণে একখানা জানালার ফাঁক দিয়ে একটু ক্ষীণ আলোক-রেখা দেখতে পাওয়া গেল। ভেতরে যেন একটা লোক চলে ফিরেও বেড়াচ্ছে।

কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই দরজাজানালা সবই বন্ধ কেন? একটা চাকরদাসীও বাইরে নেই কেন? সে কথা মনে হতেই কিন্তু হাসি পেলো ডেভিডের। রাস্তার লোকগুলো বলেছিল বটে—জমিদারমশাই এমন কৃপণ যে বাড়িতে তাঁর ভৃত্যজাতীয় কোন জীব নেই. কোন দিনই ছিল না।

ডেভিড দরজায় ঘা দিল। প্রকাণ্ড দরজা. মোটা ওককাঠের পাল্লার ওপরে ঘন ঘন গজাল বসানো। একদল ডাকাতও যদি এসে এ বাড়িতে চড়াও হয়, সহজে এ দরজা ভাঙতে পারবে না।

ডেভিড ঘা দিচ্ছে, ভেতর থেকে কোন সাড়া নেই। তবে ভেতরের লোকটার চলা-ফেরার শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয় কান খাড়া করে শুনছে। ডেভিড রেগে গেল—ভয় পাবার কী আছে? এই সন্ধ্যেবেলায়? সে আরও জোরে জোরে দরজা পিটোতে লাগল।

হঠাৎ একটা শব্দ হল ঠিক ডেভিডের মাথার ওপরে। একটা জানালা খোলার শব্দ। দু-পা হটে এসে ডেভিড ওপরপানে তাকাল। আবছা-আঁধারে দেখা গেল—জানালাটা খুলে তার ভেতর দিয়ে দুটো জিনিস একসাথে বেরিয়ে এসেছে—একটা মানুষের মাথা আর একটা বন্দুকের নল।

"কে তুমি? কী চাই তোমার?" একটা প্রশ্ন এল কর্কশকণ্ঠে।

"আমি একটা চিঠি নিয়ে এসেছি"—উত্তর দেয় ডেভিড।

"চিঠি? তা বেশ, চিঠি দরজার নীচে রেখে নিজের পথ দেখ।"

ডেভিড রেগে উঠে বলল—"মোটেই না। আমার বাবা আমাকে বলে দিয়েছেন—এবেনেজার ব্যালফুরের নিজের হাতে চিঠি দিতে।"

"বাবা? কে তোমার বাবা?" একটা বিস্ময়ের সুর গৃহস্বামীর কথায়।

"আমার বাবা আলেকজাণ্ডার ব্যালফুর ইসেনডিনের স্কুলমাস্টার।"

এক মুহূর্ত ওপরের লোকটা একেবারে নিশ্চুপ। তারপর সে ধীরে ধীরে বলল—"আলেকজাণ্ডার বুঝি মারা গিয়েছে?"

এবার বিস্ময় বোধ করবার পালা ডেভিডের। এ লোকটা কী করে অনুমান করল যে তার বাবা মারা গিয়েছেন? তবে সে-প্রশ্ন না করে সে জবাব দিল—"হ্যাঁ, বাবা মারা গিয়েছেন আজ তিন হপ্তা হল। আপনি তাঁকে চিনতেন তাহলে?"

লোকটা বলে উঠল—"আমার নিজের ছোট ভাইকে আমি চিনব না? তুমি দাঁড়াও, আমি নেমে এসে দরজা খুলছি।"

কয়েক মিনিট পরে দরজা খোলা পেয়ে ডেভিড ভেতরে ঢুকল, তার মাথা কেমন গুলিয়ে গিয়েছে এই জমিদারমশাইয়ের কথা শুনে। এ তার বাবার ভাই? কই, তার বাবা তো কোনদিন ঘুণাক্ষরেও একথা তাকে জানতে দেন নি যে তাঁর কোন ভাই আছে? এমন কি, মরণকালেও না? মায়ের মুখ থেকেও তো সে এ-বিষয়ের কোন ইঙ্গিত পায় নি কোন দিন! এ কী রহস্য!

দরজার তালা, আগল এবং লোহার শিকল যথাযথ পুনরায় লাগিয়ে বেশ কয়েক মিনিট পরে এবেনেজার মুখোমুখি দাঁড়াল ডেভিডের। মুখোমুখি বটে, কিন্তু মুখের দিকে না তাকিয়ে। ডেভিডের—কী জানি কেন—মনে হল যে পিতৃব্য তার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

"দেখি চিঠি!"—অবশেষে বলল এবেনেজার।

চিঠি পড়ছে এবেনেজার। ডেভিড একবার এবেনেজারকে দেখছে, একবার দেখছে ঘরখানা। কী গরিবানা ব্যবস্থা! একটু সরু মোমবাতি মিটমিট করে জ্বলছে, তাতে সমস্ত ঘরখানা আলো

হয় নি। বড় বড় কয়েকটা দেরাজ ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। একটা দেরাজেরই মাথায় খানিকটা সুরুয়া আর এক গেলাস এল। এল হল সেইজাতীয় সুরা, যাকে সুরা না বলে জলই বলা উচিত।

সেই সুরা এবং সেই সুরুয়ার অর্ধেক ডেভিড খেলো, বাকী অর্ধেক এবেনেজার। তারপর—

এবেনেজার বলছে—"তুমি যখন আমার আপন ভাইপো, তোমায় আমি অবশ্য বলতে পারি একটু সাহায্য করবার জন্য। সিঁড়ির মাথায় চিলেকুঠুরিতে একটা বাক্সে দরকারী কিছু কাগজপত্র আছে আমার। তুমি যদি তা এনে দাও! বুড়োমানুষ, পাঁচতলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা খুবই কষ্ট। আমাকেই যেতে হত, তুমি হঠাৎ এসে না পড়লে।"

ডেভিড বলল—"আমি যখন এসে পড়েছি, তখন আপনাকে কষ্ট করতে হবে কেন? একটা আলো দিন, আর ঘরের চাবি।"

"চাবি এই নাও, কিন্তু আলো পাব কোথায়? ওই মোম ছাড়া আর কোন আলো আমার নেই। কিন্তু মোম জ্বালিয়ে বাইরে তো এক পা চলতে পারবে না। শুনছ না, ঝড় উঠেছে!"

সত্যিই কান পেতে শুনতে পেলো ডেভিড—বাইরে উঠেছে তুমুল ঝড়। বৃষ্টিরও যেন শব্দ পাওয়া যায়! ঘরের ভেতর বসে কিছু সে বুঝতে পারে নি।

ডেভিডকে সাহস দেবার জন্য এবেনেজার আবার বলল—"সিঁড়িতে আলোর দরকারই বা কী? একটার পর আর একটা টকাটক উঠে যাবে। নিরেট পাথরের সিঁড়ি—এবড়ো নয়, খেবড়ো নয়। সোজা উঠে যাবে, বাঁ হাত দেয়ালে রেখে। ডান দিকে রেলিং নেই—ওই বিষয়ে একটু হুঁশ রেখো, ব্যস্!"

ডেভিড কথা দিয়ে ফেলেছে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসা কেমন যেন লাগে। তা নইলে ভয় পাওয়ার কারণ সে অনেক দেখতে পাচ্ছে। অন্ধকারে পাঁচতলা পর্যন্ত সিঁড়ি উঠতে হবে, সে-সিঁড়ির ডান দিকটাতে অতলস্পর্শ গর্ত, এবং ঝড়ের ঝাপটায় যে-সিঁড়ি থেকে উলটে গর্তে পড়া যে-কোন মুহূর্তে সম্ভব, কারণ রেলিং বলে কোন জিনিস নেই।

চিন্তা করলেই ভয় আসে, সুতরাং চিন্তা সে করল না। চাবি হাতে করে উঠে দাঁড়াল, এবেনেজার সঙ্গে গেল সিঁড়ির তলা পর্যন্ত। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আলোর সত্যিই দরকার নেই। আর কী ঝড়! কী মুষলধারে বৃষ্টি! সিঁড়িতে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ডেভিড। ঝড়টা পেছন থেকে ঠেলছে বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছাট এখানে লাগছে না গায়ে, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে না বিদ্যুতের ঝলকে।

একটা একটা করে সে উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি। বাঁ দিকে দেয়াল। হাত রেখেছে সেই দেয়ালের ওপরে। সিঁড়ি এমন কিছু চওড়া নয়। ডান পা পাশে বাড়ালেই সিঁড়ির শেষ প্রান্ত নাগাল পাওয়া যাচ্ছে। অতল গর্ত! বিলকুল ফাঁকা! পা ফসকালেই হয়েছে আর কি! ডেভিড বাঁয়ে সরে দেওয়ালের সাথে চেপটে যেতে চায়।

একটা জিনিস কেবল সে ভাবছে। বাক্স নিয়ে সে কেমন করে নামবে। শুধু হাতে উঠতেই প্রাণান্ত। নামবার সময় একটা হাত দিয়ে বাক্সটা কাঁধের ওপরে ধরেই রাখতে হয় যদি, প্রাণ বাঁচাবার জন্য সম্বল রইল মাত্র একখানি হাত। ভাববার কথা।

ভাবতে ভাবতে অনেক, অনেক ওপরে সে উঠে এসেছে। প্রায় পাঁচতলার কাছাকাছি বলেই মনে হয় যেন। আবার বিদ্যুতের চমকানি চোখে পড়ছে। এবার ওপর থেকে। অর্থাৎ ছাদ আর বেশী দূর নয়।

পা ফেলতে যাবে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল। আর ডেভিডের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খেলে গেল যেন সেই বিদ্যুতেরই শিহরন। আপনার অজানতেই তার উঠন্ত পা নিজে থেকেই সড়াক করে পিছিয়ে এল। কী সর্বনাশ! কিসের ওপর পা ফেলতে যাচ্ছে সে? কিছু না! স্রেফ অতল ফাঁকা। সিঁড়ির যে ধাপে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার পরে আর ধাপ নেই। এক চুলের জন্য সে বেঁচে গিয়েছে। ওই বিজলীটা যদি না চমকাত, এতক্ষণ একশো ফুট নীচে গড়াগড়ি যেত তার হাড়গোড়-ভাঙা রক্তাক্ত দেহ!

* * *

নেমে এসে ডেভিড দেখল সেই মুষলধার বৃষ্টির ভেতর ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে এবেনেজার। লোকটার হয়ত হুঁশই নেই যে সে ভিজছে। সে জেনেশুনে একটা মানুষকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছে, বিবেকের ভর্ৎসনা ছাড়া অন্য কিছু তার মনোযোগ আকর্ষণ করতেই পারছে না এই মুহূর্তে।

ডেভিড তাকে ডাকল না। আঁধারে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। মোম জ্বলছিল। তারই আলোকে সে পিতৃব্যের বন্দুকটা হস্তগত করল, খুঁজে খুঁজে একখানা ছোরাও বাগাল। আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত সে এইবারে। কী জানি, কৌশলে তাকে হত্যা করতে না পেরে পিতৃব্য হয়ত এবার সামনাসামনি খুনই করতে চেষ্টা করবে তাকে।

এবেনেজার এল টলতে টলতে। এসেই সে চমকে উঠল, যেন চোখের সামনে কী এক বিভীষিকা দেখেছে। ডেভিডকে জ্যান্ত ডেভিড বলে সে কখনোই ভাবতে পারে নি প্রথমটা। নিশ্চয় এ ডেভিডের প্রেত! নিশ্চয় সে এবেনেজারের ঘাড় মটকাবার জন্যই এসেছে এবার!

সে ভুল ভাঙতে অবশ্য দেরি হল না। তখন সে মুষড়ে পড়ল একেবারে। আশাভঙ্গের জন্যও বটে, ডেভিড এখন কী ভাবে সাজা দেয় তাকে, সে আতঙ্কেও বটে। তার হাতিয়ারপাতি ডেভিড আগেই হস্তগত করেছে এখন ডেভিডের করুণা ছাড়া তার আর বাঁচবার উপায় নেই।

সে একবার বিড়বিড় করে বলতে গিয়েছিল—"ও একটা ঠাট্টা করছিলাম শুধু, আর কিছু নয়"—কিন্তু ডেভিড এমন কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল যে আর বেশী কথা তার মুখ দিয়ে বেরুলোই না।

খানিকটা বাদে সে উঠে দাঁড়িয়ে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল ডেভিডের পানে—"আমি শুই গে যাই।" ডেভিড তার পেছনে গেল এবং সে ঘরে ঢোকবার পরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল দরজায়।

পরদিন সকালে কিন্তু বাধ্য হল দরজা খুলে এবেনেজারকে বাইরে আনতে। একটা ছোকরা এসেছে চিঠি নিয়ে, এবেনেজার ব্যালফুরের নামে।

চিঠি পড়ে এবেনেজার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, কী যেন ভাবল মনে মনে। তার পর ডেভিডকে ডেকে বেশ স্বাভাবিক স্বরেই বলল—"ডেভিড! আমায় এক্ষুনি কুইন্সফেরি যেতে হচ্ছে। সেখানে নোঙর ফেলেছে 'কভেনান্ট' জাহাজ! ওই জাহাজের কাপ্তেন হোসিয়াসন আমার বিশেষ বন্ধু। কতকগুলি বৈষয়িক আলোচনা সে করতে চায় আমার সঙ্গে। তুমিও চল না! কুইন্সফেরি ছোট বন্দর হলেও বেশ চমৎকার জায়গা। আর তা ছাড়া পাঁচটা লোকের সঙ্গে আলাপ হবে সেখানে।"

প্রস্তাবটা লুফে নিল ডেভিড। এই পচা গর্তে এই বুড়ো শয়তানের সঙ্গে এক মুহূর্তও সে কাটাতে চায় না। যে-কোন জায়গায় যেতে পারলে সে বাঁচে। সে রাজী হয়ে গেল।



ঘরের মধ্যে ঢুকেই এবেনেজার চমকে উঠল। [পৃষ্ঠা ৬৬

কাপ্তেন হোসিয়াসনের ভৃত্য সেই বালক র‍্যান্সম, এবেনেজার আর ডেভিড তিনজনে যাত্রা করল, বাড়িটা আষ্টেপৃষ্ঠে তালা বন্ধ করে। ছোট ছোট পাহাড় আর বড় বড় প্রান্তর। এঁকেবেঁকে চড়াই উতরাই ভেঙে ভেঙে তিনজন ক্রমাগত পথ চলছে। কথাবার্তা যা হচ্ছে র‍্যান্সম আর ডেভিডে। এবেনেজার চিন্তায় মগ্ন। র‍্যান্সম নাবিক জীবনের লোমহর্ষণ বর্ণনা দিচ্ছে ডেভিডের কাছে।

বেলা দুপুরে পেরিয়ে গেল কুইন্সফেরি পৌঁছুতে। একটা হোটেলের ওপরতলায় ডেরা

ফেলেছেন কাপ্তেন হোসিয়াসন। এবেনেজার সোজা সেইখানে উঠে গেল। ডেভিড নীচে বসে গল্প জমাল হোটেলওয়ালার সাথে।

"কী বললেন? আপনার নামও ব্যালফুর? বাবার নাম?"—হোটেলওয়ালার প্রথম প্রশ্নই এই।

"আলেকজান্ডার ব্যালফুর।" উত্তর দিল ডেভিড।

"কী? কী? মিস্টার আলেকজান্ডারের পুত্র তুমি? তা হলে তো শো-এর জমিদারির মালিকই তুমি!"

"বাঃ! তা কী করে হবে? পিতৃব্য এবেনেজার তো আমার বাবার বড় ভাই? বড় ভাইয়েরই তো জমিদারি পাওয়ার কথা!"

"এবেনেজার বড় ভাই? ওই বুড়ো শয়তান বলেছে বুঝি? না মশাই, না, আমি তোমার ঠাকুরদার আমল থেকে জানি তোমাদের পরিবারকে। তোমার বাবাই বড় ভাই। কী জানি কেন জমিদারিটা ছোট ভাইকে দিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি যাও উকিল রেনকিলরের কাছে। তিনি চিরদিনই তোমাদের পরিবারের উকিল, লোকও ভাল। তিনি তো আর তোমাকে ঠকাবেন না! সব কথা জানতে পারবে তাঁর কাছে।"

এই পর্যন্ত বলেই হোটেলওয়ালা সট্ করে সরে গেল। ডেভিড মুখ ফিরিয়ে দেখল—এবেনেজার আসছে একটা লম্বা-চওড়া লোককে সঙ্গে নিয়ে।

এসেই হাসি-হাসি মুখে এবেনেজার বলল—"এস ডেভিড, আমার বন্ধু কাপ্তেন হোসিয়াসনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোমার। এমন সুদক্ষ নাবিক, এমন মহাশয় ভদ্রলোক তুমি কোথাও দেখতে পাবে না।"

হোসিয়াসন এসে ডেভিডের করমর্দন তো করলই, একেবারে গলা জড়িয়ে ধরল তার—"বন্ধু ব্যালফুর মশাইয়ের ভাইপো তুমি, আমারও আপন জন। তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করব ভাল করে—এমন সময়টুকুও হাতে নেই। তা চল, ব্যালফুর তো জাহাজে যাচ্ছেন আমার সঙ্গে! তুমিও চল, যেতে যেতে যতটা পারি কথাবার্তা বলি। তারপর ওঁর সঙ্গে তুমিও চলে আসবে।"

জাহাজে ওঠার, জাহাজ দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনও হয়নি ডেভিডের। সে সাগ্রহে রাজী হয়ে গেল।

জাহাজঘাটা পর্যন্ত সবটা পথ হোসিয়াসন কেবলই বকে চলেছে সাত সাগরের যত সব আশ্চর্য জিনিসের কথা শোনাচ্ছে তাকে। ডেভিড কথা বলবার বা চিন্তা করবার সময় পাচ্ছে না।

ঘাট থেকে অনেক দূরে নোঙর করে আছে জাহাজ। নৌকোয় চড়ে রওনা হল সবাই জাহাজের পানে।

জাহাজে উঠে কাপ্তেন ডেভিডের হাত ধরে তাকে নিয়ে চলল এদিক-ওদিক দেখাতে। একটা

মাটা মাস্তুলের আড়ালে যেই সে এসেছে, অমনি হঠাৎ তার মাথার পাশটাতে পড়ল একটা প্রচণ্ড আঘাত। বোধ হয় কোন লোহার ডান্ডার বাড়ি একটা। ডেভিড সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল পাটাতনের ওপর।

২

জ্ঞান যখন হল, তখন ডেভিড দেখল জাহাজের অন্ধকার খোলের ভেতর সে পড়ে আছে হাত পা বাঁধা অবস্থায়। কানপিঠে একটা কাজ-চলা-গোছের ব্যান্ডেজ বাঁধা, তার তলা দিয়ে তখনও রক্ত গড়াচ্ছে।

ব্যাপারখানা এই—শ্রদ্ধেয় পিতৃব্যমশাই ডেভিডকে আমেরিকায় পাচার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। হোসিয়াসন ওই অঞ্চলেই যাচ্ছে জাহাজ নিয়ে। তুলোর আবাদে ক্রীতদাসরূপে সে বিক্রি করে দেবে ডেভিডকে। দামটা সে-ই নেবে। এবেনেজারও অবশ্য কুড়ি পাউন্ড পারিশ্রমিক তাকে আগাম দিয়েছে। শাঁখের করাতের মত আসতে যেতে দু-দিকেই মুনাফা হোসিয়াসনের।

জাহাজের দ্বিতীয় মেট মিস্টার রিয়াক এই জাহাজের দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত। একটুখানি বুদ্ধি বিবেচনা দয়াধর্ম তাঁর আছে। তা ছাড়া, ডাক্তারি না জানলেও এ-জাহাজের ডাক্তার তিনিই, ডেভিডের মাথায় ব্যান্ডেজ তিনিই বেঁধেছেন।

একটু বাদেই আলো হাতে তিনি এলেন, এবং পরীক্ষা করলেন ডেভিডকে। নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধলেন এবং কাপ্তেনকে ডেকে এনে বললেন—"ছেলেটাকে মেরে ফেলে কোন লাভ হবে না আপনার। যদি বাঁচাতে হয়, একে ওপরের ডেকে নিতেই হবে।"

নীচে ফেলে রাখলে এর মৃত্যু অনিবার্য, বারবার এই কথা শুনতে শুনতে ভয় পেয়ে গেল হোসিয়াসন। সত্যিই, মরে গেলে তো আর বিক্রি করা যাবে না। ঘোর অনিচ্ছাতেও সে হুকুম দিল, ডেভিডকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ডেভিড বন্দী হওয়ার পরেই জাহাজ খুলে দিয়েছে হোসিয়াসন। কুইন্সফেরি ছাড়িয়ে জাহাজ খোলা সমুদ্রে পড়েছে, চলেছে উত্তর মুখে, স্কটল্যান্ডের পূর্ব উপকূলকে পশ্চিমে রেখে।

সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় আধমরা ডেভিড যেন জীবন ফিরে পেল আবার। মিস্টার রিয়াক মাঝে মাঝে ব্যান্ডেজ পালটে দেন, নাবিকেরা বিশেষ খারাপ ব্যবহার করে না, হোসিয়াসনও এমন ভাব দেখাল যেন ও ভাল হয়ে উঠলেই খুশী হয় সে। খুশী না হওয়ার কথাই বা কী! ওর জীবনের দাম যে অনেক আর সে-দামটা পাবে হোসিয়াসনই।

ডেভিড আস্তে আস্তে সুস্থই হয়ে উঠল।

আর তখনই ঘটল এক ভয়াবহ ঘটনা। প্রথম মেট শুয়ান লোকটা ভীষণ গোঁয়ার। মাতাল হয়েই আছে প্রায় সর্বদা, আর মাতাল হলেই সে আর মানুষ থাকে না। র‍্যান্সম ছেলেটাকে প্রায়ই ধরে ধরে বেদম মারে। একদিন তাকে একেবারে মেরেই ফেলল।

অপরাধ? হ্যাঁ, অপরাধ ছিল বইকি! নোংরা গেলাসে মদ ঢেলে দিয়েছিল র‍্যান্‌সম।

যাহোক, র‍্যান্‌সম মারা গেল। মুশকিল হল কাপ্তেনের। কারণ ওই ছেলেটা ছি[l] কাপ্তেনের এবং মেটদের খাস ভৃত্য। কাপ্তেন বেশির ভাগ সময়ই গোল-ঘরে বসে থাকে, আর ত[l] ফরমাইশ খাটবার জন্য ছোকরা-চাকরটাকে ক্রমাগত জাহাজের এমাথাওমাথা, ওপরনীচ ছুটোছ[l] করতে হয়। এখন সে-কাজ করে কে?

হোসিয়াসনের মাথায় এল ডেভিডকে এই কাজে বহাল করা যাক।

ডেভিড তো বেঁচে গেল। কাজ না থাকলে মানুষ বাঁচে কেমন করে? যত ছোট কাজই হো[ক] কাজ তো! সময় কেটে যাবে তো! তা ছাড়া ভাল মন্দ খাবার পাওয়া যাবে। ভাল ভাল খাদ্য পানী[য়] গোলঘরে থাকে, তার চাবি কাপ্তেনের কাছেই থাকবার কথা বটে, মাঝে মাঝে খানসামার হাতে[ও] এসে পড়ে। সুতরাং ডেভিড কার্যতঃ ভাণ্ডারী হয়ে বসল জাহাজের।

জাহাজ স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব কূল ছাড়িয়ে এখন উত্তর কূল দিয়ে চলেছে। সোজা পশ্চি[ম] মুখে চলে যাবে অতলান্তিক পেরিয়ে, কারণ এই পথ দিয়ে গেলে পথটা সংক্ষেপ হয়, অতলান্তিকে[র] বিস্তার এখানে তত বেশী নয়।

কিন্তু হোসিয়াসনের দুর্দৈব, এই সময়ে একদিন উঠল প্রচণ্ড ঝড়। সে-ঝড় কভেনা[ন্ট] জাহাজকে ঠেলে বিপথে নিয়ে গেল। ওর যাওয়ার কথা পশ্চিম মুখে, ও ঘুরে গেল দক্ষিণে[।] স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম কূল ঘেঁষে ছুটে চলল অন্ধ বেগে।

সবচেয়ে বিপদ এই যে এই উপকূলটা চোরাপাহাড়ে ভর্তি। সমুদ্রের ভেতরে অনেকদূ[র] পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে রয়েছে। ঝড়ের মুখে ছুটতে ছুটতে জাহাজ যদি ওইরকম কোন পাহাড়ে[র] গায়ে ধাক্কা খায়—তবেই সর্বনাশ!

পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা অবশ্য খেলো না জাহাজ, কিন্তু ধাক্কা দিয়ে বসল একখানা ছো[ট] নৌকোকে। নৌকো তো দু-টুকরো হয়ে ভেঙে গেল, লোক ছিল আট দশ জন—নিমেষের মধ্যে[ই] অদৃশ্য হয়ে গেল উত্তাল ঢেউয়ের তলায়।

কেবল একটা লোক—আশ্চর্য ক্ষমতা তার—একেবারে পেছনে ছিল নৌকোর, লাফ দিয়ে উ[ঠে] ধরে ফেলল জাহাজের একগাছা দড়ি, আর তাই বেয়ে বাজিকরের মতই অক্লেশে উঠে এল ওপরে[।]

বেঁটেখাটো একটি লোক, কাপড়জামা বেশ শৌখিন রকমের, কিন্তু বেশ পুরোনো। কোমরে দুটো পিস্তল, আর একখানা লম্বা তরোয়াল। টুপি হাতে নিয়ে সপ্রতিভভাবেই এসে কাপ্তেনে[র] সামনে দাঁড়াল।

"নৌকোখানা ভেঙে গেল বলে আমি দুঃখিত—" কাপ্তেন সম্ভাষণ জানাল এই বলে[।]

"চুলোয় যাক নৌকো, যে-মানুষগুলো তলিয়ে গেল, তাদের জুড়ি এদেশে মেলা ভার—" জবাব দিল আগন্তুক—"ওরা জনে জনে আমার জন্য প্রাণ দিতে তৈরী ছিল, দিয়েছেও তাই।"

● রবার্ট লুই স্টিভেনসন

"আপনার জন্য হামেশাই নানা লোকের প্রাণ দেওয়ার দরকার হয় বুঝি?" কাপ্তেনের প্রশ্নে ব্যঙ্গ আর সন্দেহ সমানভাবে মিশে আছে।

"ঠিক আমার জন্য নয়, আমাকে উপলক্ষ করে অন্য একজনের জন্য"—এই বলে আগন্তুক শিস দিয়ে একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগল।

কাপ্তেন কান খাড়া করল। এ গান জ্যাকোবাইটদের গান।* তাহলে এ ব্যক্তি বিদ্রোহী, হয়ত পলাতক! ঠিক। পলাতক না হলে এই দারুণ দুর্যোগে নৌকো বেয়ে ও কোথায় যাচ্ছিল সমুদ্রপথে?

রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর পাত্র হোসিয়াসন নয়, যেদিকে দু পয়সা রোজগারের সম্ভাবনা দেখা যাবে, সেইদিকেই চলবে ও। এ লোকটা যদি পালাতে চায়, হোসিয়াসন পারে সাহায্য করতে, অবশ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা যদি এর থাকে।

প্রথমে ইশারায় ইঙ্গিতে, তারপর খোলাখুলি আলোচনায় স্থির হল যে লোকটিকে ফরাসী উপকূলে পৌঁছে দেবে কাপ্তেন, ষাট গিনির বিনিময়ে।

কিন্তু কাপ্তেন তর্ক তুলল তারপরই, "তোমার যে ষাট গিনি দেবার ক্ষমতা আছে, তা কেমন করে জানব আমি? নিজের বান্দরগায় পৌঁছে যদি তখন তুমি বল—'অর্থ নেই'?"

এ-কথার উত্তরে আগন্তুক বিরক্ত হয়ে বলল—"আমি স্টুয়ার্ট রাজবংশের লোক, নাম আমার অ্যালান ব্রেক, আমাকে স্কটল্যান্ডের সবাই জানে। অর্থ আমার কাছে আছে, অবশ্য আমার নিজের নয়। রাজা জেমসের ভক্ত প্রজা আমি, তাঁরই জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি এদেশ থেকে। কিছু ও থেকে খরচ করতে পারি, যাতে বাকীটা নিরাপদে ফ্রান্সে পৌঁছোয়।"

এই বলতে বলতে কোমর থেকে একটা গেঁজে বার করে টেবিলের ওপর সেটা উপুড় করে ধরে অ্যালান, আর হুড়মুড় করে মোহর পড়তে থাকল তা থেকে। ষাট গিনি? অন্ততঃ ছয়শো গিনি যে অ্যালানের আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

লোভী হোসিয়াসনের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। ডেভিডকে বলল—"ভদ্রলোককে কিছু খেতে দাও, আমি আসছি।" এই বলেই সঙ্গীদের ইশারায় ডেকে নিয়ে সে গোলঘর থেকে বেরিয়ে জাহাজের ও-মাথায় চলে গেল।

অ্যালান খেতে খেতে বলল—"ওহে ডেভিড, এই এক গেলাস মদে আমার কী হবে? ষাট ষাটটা গিনি দিচ্ছি, একটু ভালো করে খাওয়াতে চাও তো আমাকে? একটা বোতল এনে আমার সামনে রাখো।"

ডেভিড বলল—"তা হলে আপনি খেতে থাকুন, আমি কাপ্তেনের কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে আসি। মদ এই ঘরেই আছে—আলমারিতে বন্ধ।"

* নির্বাসিত রাজা জেমস-এর পক্ষভুক্ত লোকদের বলা হত জ্যাকোবাইট। দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের চোখে এরা ছিল বিদ্রোহী।

এমন এই গোলঘরটি হল জাহাজের দুর্গ। ডেক থেকে অন্ততঃ ছয় ফুট উঁচুতে তৈরী, একটিমাত্র দরজা আর একটিমাত্র জানালা। কাপ্তেন এখানে থাকে, মেটরাও। জাহাজের সব বন্দুক আর গুলিবারুদ এই ঘরেই থাকে, তরোয়াল অবশ্য থাকে অন্য জায়গায়।

এখন ডেভিড গেল চাবি আনতে। গিয়ে দেখে—কাপ্তেন তার দুজন মেট এবং মাতব্বর কয়েকজন নাবিককে নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। আগন্তুকের কাছে যখন এত এত গিনি রয়েছে, তখন তাকে মেরে ফেলে মোহরগুলো দখল করে নিতে ক্ষতি কী? কী দরকার তাকে ফরাসী দেশে পোঁছে দেবার? অতখানি মেহনতের বিনিময়ে মাত্র ষাটটি গিনি রোজগার?

বলা বাহুল্য, এ-প্রস্তাবে একটি লোকেরও আপত্তি হয় নি।

এখন জটলা চলছে—কী উপায়ে গোলঘর থেকে একটা বন্দুক আনিয়ে নেওয়া যায়। বন্দুক পেলে এইখান থেকেই গুলি করে লোকটাকে নিকাশ করে দেওয়া যায়। কিন্তু সামনাসামনি বন্দুক আনতে গেলে হয়ত সন্দেহ করতে পারে লোকটা। ওর পিস্তল আছে, তরোয়াল আছে, সন্দেহ হলে দু একজনকে ও ঘায়েল করতেও পারে, নিজে মরবার আগে।

ডেভিডকে দেখে কাপ্তেনের মাথায় ফন্দি এল। "ডেভিড! তুমি গিয়ে ওকে মদ বার করে দাও, আর তারপরই একটা বন্দুক আর কিছু গুলিবারুদ নিয়ে আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা কেউ আনতে গেলে ও সন্দেহ করবে। তোমার মত ছেলেমানুষ কী করছে না-করছে ও খেয়ালই করবে না হয়ত। যদি জিজ্ঞাসা করে, বলবে যে বন্দুক চালানো অভ্যাস করবে তুমি।"

"হুঁ, হুঁ"—বলে সায় দিয়ে ডেভিড তাড়াতাড়ি ফিরে এল গোলঘরে। ওর একমুহূর্ত লাগে নি মতলব স্থির করে নিতে। এরা এই আগন্তুককে খুন করতে চাইছে, ডেভিড কি খুনীদের দলে ভিড়বে? সে না একটা সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর? সে গোলঘরে এসে মদের বোতল বার করতে করতে মৃদুস্বরে বলল—"অ্যালান ব্রেক, তুমি কি খুন হতে চাও?"

অ্যালান চট্ করে মাথা তুলে বলল—"কী? কী?"

ডেভিড সব কথা খুলে বলল তাকে। একথাও বলল যে সে নিজে ওই কাপ্তেনের লোক নয়। তাকে চুরি করে ধরে এনে বন্দী করে রাখা হয়েছে জাহাজে, আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। যতটা সাধ্য, অ্যালানের সাহায্য সে করবে।

অ্যালান বলল—"তাহলে এক কাজ কর। বন্দুক আমার দরকার নেই, কারণ প্রথমে আমি আক্রমণ করব না। যতগুলি পিস্তল এখানে আছে, গুলি ভরে ফেল, আর বেছে নাও একখানা তরোয়াল। জানালা দিয়ে বা ওপরের ওই আলো আসবার ফোকর দিয়ে যদি কেউ ঢোকবার চেষ্টা করে, গুলি করবে তাদের পিস্তল দিয়ে।। দরজা আগলাবার ভার আমার।"

এদিকে বন্দুক নিয়ে ডেভিড আসে না দেখে তরোয়াল নিয়েই কাপ্তেন সদলে এগিয়ে পড়েছে।

ওদিকে পনেরোটা নাবিক তরোয়াল হাতে নিয়ে তেড়ে আসছে, এদিকে একা অ্যালান। কী

দুর্জয় সাহস লোকটার! একটুও সে ঘাবড়ায় নি। কিন্তু তাকে তারিফ করবার সময় আর জুটল না ডেভিডের, লড়াই শুরু হয়ে গেল। একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল কাপ্তেনের দল, কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে সব কয়জন তো আর একসাথে এগিয়ে আসতে পারে না! বড় জোর--দুজন। কাজেই অ্যালানকে খুব একটা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হল না।

সে যে অস্ত্রবিদ্যায় চৌকস, তাতে ডেভিডের আর সন্দেহ রইল না। প্রথম মেট শুয়ান—সেই বালকভৃত্য র‍্যান্সমের হত্যাকারী—সে প্রথম চোটেই মারা পড়ল অ্যালানের হাতে। মারা পড়ল আরও চারজন ক্রমে ক্রমে। এদিকে ওপরের আলোর ফোকর দিয়ে নামবার চেষ্টা করতে গিয়ে ডেভিডের গুলিতে নিহত হল আরও দুজন।

বাদবাকী সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল গোলঘর থেকে।

আর তারপরেই জাহাজখানা আচমকা ধাক্কা খেলো এক ডুবোপাহাড়ে। সেই ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—ডেভিড দাঁড়িয়েছিল রেলিংয়ের ধারে—একেবারে ছিটকে পড়ল সমুদ্রে। ডুবতে ডুবতে একখানা তক্তা সে ধরে ফেলল। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে যখন তক্তাসমেত ভেসে যাচ্ছে, সেইসময় শুনতে পেল শোরগোল নাবিকেরা নৌকো নামাচ্ছে জাহাজ থেকে। ডেভিড কয়েকবার ডাকল তাদের, তারা তা শুনতে পেল না।



তরোয়াল উঁচিয়ে এল কাপ্তেনের দল।

তারপর সে কী অসহ্য কষ্ট তিন চার দিন পর্যন্ত! এক জনশূন্য ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে উঠল ডেভিড, সেখানে একটা গাছ পর্যন্ত নেই—যার তলায় মাথা গুঁজে দাঁড়ানো যায়। শামুক গুগলি খেয়ে আর বর্ষাই হোক রৌদ্রই হোক—ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর পড়ে থেকে—প্রতি মুহূর্তে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হল ডেভিডকে। চার দিনের দিন তার ভাগ্য মুখ তুলে চাইল। সে আবিষ্কার করল

যে পূর্বদিকের সমুদ্রশাখাটা ভাটার সময় একদম শুকিয়ে যায়। সে হেঁটে পার হয়ে গিয়ে ওপাড়ে উঠল, এটা আর দ্বীপ নয়, স্কটল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডের অংশ।

ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে নাবিকেরা নেমে অন্য দিক দিয়ে চলে গিয়েছে। অ্যালানও তাদের সঙ্গেই নেমেছিল। ডাঙায় পা দেওয়ামাত্রই কাপ্তেন তাকে ঘিরে ধরে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভয়েই হোক বা বৈরাগ্যবশতঃই হোক—নাবিকেরা আর তাতে উৎসাহ বোধ করে নি।

অ্যালান এই পথ দিয়েই গিয়েছে। প্রতি বাড়িতে ডেভিডের বর্ণনা সে রেখে গিয়েছে। সেইসব বাড়িতে ডেভিড যখন গেল, তখন যথাসম্ভব গরিবের আতিথ্য তো সে পেলই, উপরন্তু পেল পথের নির্দেশ। কোন্ পথে গেলে অ্যালানের সঙ্গে সে মিলতে পারবে, তা স্থির করতে বেগ পেতে হল না তাকে।

কিন্তু অ্যালানের সঙ্গেই বা সে মিলিত হবে কেন? অ্যালান তো তার বন্ধু নয়! সামান্য পরিচয়। আর সেই সামান্য পরিচয়েতেই ডেভিড জেনেছে যে অ্যালান রাজদ্রোহী নির্বাসিত জেমসের অনুরক্ত, দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের চোখে সে বিদ্রোহী, ধরা পড়লে তার ফাঁসি হবে।

তবু অ্যালানের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। স্কটল্যান্ডের এ অংশে অন্য পরিচিত লোক কেউ নেই তার। পকেটে তার অর্থ নেই, তার নিজের জায়গা ইসেনডিন বা কুইন্সফেরী বা এডিনবরাতে পৌঁছোতে হলে তাকে গোটা স্কটল্যান্ড দেশটা পার হতে হবে পশ্চিম থেকে পূবে। কপর্দকহীন অনভিজ্ঞ বিদেশী বালকের পক্ষে সে কাজ কি সহজ? স্কটল্যান্ডের এই পার্বত্য অঞ্চল তো একটানা পাহাড় আর জঙ্গল আর তৃণবহুল মহাকান্তারে ভরা। মানুষ এখানে যারা বাস করে—তারা অর্ধসভ্য পাহাড়িয়া, তায় রাজদ্রোহী। তাদের ভাষা ডেভিড জানে না, আচারে ব্যবহারে ডেভিডের সঙ্গে তাদের এতটুকু মিল নেই। কীভাবে তাদের কাছ থেকে তিলমাত্র সহানুভূতি বা সাহায্য সে পেতে পারবে, তা মাথায় এল না ডেভিডের।

সুতরাং অ্যালানের সন্ধানেই সে চলেছে।

একদিন এক পাহাড়ের পাদদেশে চারজন অশ্বারোহীর সঙ্গে তার দেখা। অগ্রবর্তীকে সে জিজ্ঞাসা করল—জেমস স্টুয়ার্টের বাড়ি যাবে কোন্ পথে। সেইখানেই অ্যালানের দেখা পাবে ডেভিড এইরকম আশ্বাস সে পেয়েছিল।

ডেভিড কথা কইছে অশ্বারোহীর সঙ্গে, হঠাৎ পাহাড়ের মাথা থেকে একটা বন্দুকের শব্দ হল, আর গুলিবিদ্ধ হয়ে সেই অগ্রবর্তী অশ্বারোহী পড়ে গেল মাটিতে। বাকী অশ্বারোহীরা চেঁচিয়ে উঠল—"ধর, ধর ছোকরাকে, ও নিশ্চয়ই হত্যাকারীর সহকারী।"

শুনেই ডেভিড দ্রুত পাহাড়ে উঠতে লাগল দারুণ ভয় পেয়ে। পেছনে তাড়া করেছে অনেক লোক। পাহাড়ের মাথায় উঠেও ডেভিড ছুটতে লাগল। একটা ছোট জঙ্গলের ভেতর ঢুকতেই সে যাকে দেখতে পেলো, সে আর কেউ নয়, অ্যালান ব্রেক।

৩

অ্যালানের সঙ্গে তার আত্মীয় জেমস স্টুয়ার্টের বাড়িতেই এসেছে ডেভিড।

না এসে উপায় কী? তার পেছনে সরকারী হুলিয়া ঘুরছে। সারা দেশ চষে ফেলছে রাজসৈন্য—তাকে ধরবার জন্য। অজানা দেশে অজানা পরিবেশে নিজে পথ করে চলবার ক্ষমতা তার কোথায়?

যে লোকটাকে গুলি করে মারা হয়েছে, সে একটা কেউকেটা নয়, রীতিমত গণ্যমান্য লোক, সরকারী তহশিলদার। নাম তার অ্যাপিন, লোকে ডাকে লাল শিয়াল বলে কারণ তার মাথার চুল ছিল লাল। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জ্যাকোবাইটেরাই মেরে ফেলেছে তাকে। ডেভিডের বরাত মন্দ, যে-ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই, তাইতেই সে জড়িয়ে পড়েছে একান্ত আকস্মিক ভাবে।

প্রথমে সে ভেবেছিল অ্যালানই বুঝি হত্যাকারী। কিন্তু পরে তার ভুল ভাঙল। দূর থেকে হত্যাকারীকে সে এক পলক দেখতে পেয়েছিল। তার পরনে ছিল কালো কোট, হাতে ছিল বন্দুক। অ্যালানের পরনে সে দেখতে পেল আগেকার সেই বাদামী ওভারকোট, হাতে বন্দুক নয়, মাছ-ধরা ছিপ।

তবে, নিজে অ্যালান হত্যাকারী না হলেও আসল দোষীকে সে যে জানে—তা পাকেপ্রকারে সে একরকম স্বীকার করে নিয়েছে বইকি! অ্যালান জানে, কিন্তু মরে গেলেও তার নাম প্রকাশ করবে না। সে করবে না, জেমস করবে না, করবে না পার্বত্য অঞ্চলের কোন পুরুষ বা নারী। লাল শিয়াল মারা যাওয়াতে প্রত্যেকে খুশী। লাল শিয়ালের হত্যাকারীকে আড়াল করে রাখবার জন্য যে-কোন পাহাড়িয়া জ্যাকোবাইট অনেক কষ্ট নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত।

জেমস নিজেও বিপন্ন। হত্যাকারীর সঙ্গে যোগসাজশ আছে—এই সন্দেহে সরকারী ফৌজ যে-কোন দিন তাকে গ্রেফতার করতে পারে। আর ওরকম সন্দেহে একবার গ্রেফতার হলে তার মৃত্যু অনিবার্য। নিহত লাল শিয়াল ছিল ক্যাম্বেলগোষ্ঠীর লোক। এ-অঞ্চলের সর্বময় শাসক আর্গাইলের ডিউক সেই গোষ্ঠীরই গোষ্ঠীপতি। সুতরাং অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবিচার কতখানি পাবে, তা বোঝাই যায়।

জেমস নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। তল্লাশী যদি হয়, অনেক কিছু বেরিয়ে পড়তে পারে। কাগজপত্র, বন্দুক তরোয়াল। বাড়িতে ও-জাতীয় জিনিস যা কিছু ছিল, সরিয়ে ফেলা হচ্ছে জঙ্গলের ভেতরে। সবাই তটস্থ।

তবু অ্যালান আর ডেভিডকে সাদরে গ্রহণ করল জেমস। ডেভিডের পোশাকটা বদলে দিল তারা, যাতে হুলিয়ার বিবরণ তার বর্তমান পরিচ্ছদের সঙ্গে না মেলে। পোশাক পালটে নিল অ্যালানও। তার নিজের ফরাসী ধরনের পোশাক আগে থেকেই জেমসের বাড়িতে ছিল, তাই পরল

সে, অবশ্য ওভারকোটটি সে ছাড়ল না। ওর রৌপ্য বোতামগুলি তার বাবার ছিল একসময়, অ্যালানের চোখে খুব মূল্যবান।

সামান্য কিছু জই-এর আটা আর লোহার কড়া একটা সঙ্গে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলে আশ্রয় নেবার জন্য। শত শত জঙ্গল পাহাড় আর ঘাসে ভরা প্রান্তর পেরিয়ে তবে তারা পৌঁছুতে পারবে সেই পূর্ব উপকূলে। ডেভিডের সেখানে বাড়ি আর অ্যালান সেইখান থেকে জাহাজ পাবে ফরাসী দেশে পৌঁছোবার।

সৈন্য ছুটেছে পেছনে। কতবার যে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল! লাফিয়ে ঘাসের ভেতর শুয়ে পড়ে আছে প্রচন্ড রোদ্দুরে। মাথা তুললেই দেখতে পাবে রাজসৈন্য, তারা পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহারা দিচ্ছে।

খাওয়া? জই-এর আটা জলে ভিজিয়ে তাই গেলা। আগুন জ্বালাতে সাহস হয় না। যদি কখনও কোন অতিনিভৃত জঙ্গলে আগুন করা সম্ভব হল, কোন খরগোশ মেরে বা নদীর মাছ ধরে পুড়িয়ে নেওয়া গেল—তাহলে তো সেদিন রীতিমত ভোজ।

এই ভাবে পথ চলতে চলতে অসুখে পড়ে গেল ডেভিড। সে আর হাঁটতে পারে না। অ্যালান তাকে ধরে নিয়ে চলতে লাগল, কখনও বা বহন করতে লাগল পিঠে করে। অবশেষে আশ্রয় মিলল এক অপরিচিত পাহাড়িয়া পল্লীতে।

এরাও স্টুয়ার্টগোষ্ঠীর লোক—অ্যালানের সমগোত্রীয়। যদিও অ্যালানের বাড়ি এখান থেকে বহু, বহু দূরে, যদিও অ্যালান আগে কখনও এ-অঞ্চলে আসে নি, বা এ-অঞ্চলের কেউ কখনও অ্যালানের গ্রামে যায় নি, তবু বংশটা তো একই! স্টুয়ার্ট নাম শুনেই অ্যালানকে সাদরে ডেকে নিল এ-গ্রামের লোক, তার বন্ধুর জন্য পেতে দিল বিছানা, ব্যবস্থা করল যথাসম্ভব চিকিৎসার।

গ্রামের প্রত্যেকে আন্দাজ করেছে যে এই পীড়িত ছেলেটাই সেই লোক—লাল শিয়ালের হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে যাকে সন্দেহ করেছে সরকারী লোকেরা, হুলিয়া বার করেছে যার নামে। আন্দাজ করেছে, কিন্তু আভাসেও প্রকাশ করছে না সে-কথা, ধরিয়ে দেওয়ার চিন্তা করা তো দূরে থাকুক। গোটা পল্লীটাই জানে গোপন কথাটা, কিন্তু পুরস্কারের লোভেও কেউ সরকারী দপ্তরে খবর দেবে না। অথচ, এদের মত গরিব ইওরোপের অন্য কোন দেশে কোথাও নেই।

একমাস পরে ডেভিড বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। তখন আবার পথে নেমে পড়া। তবে পূর্ব উপকূল আর বেশীদূর নয়। অচিরেই ক্লাইড নদী পাওয়া গেল, এরই মোহনাতে কুইন্সফেরী বন্দর। নতুন আশায় সজীব হয়ে উঠল দুই পথচর।

নদীর কূল ধরে ওরা চলেছে। অবশেষে একদিন চোখে পড়ল ক্লাইডের ওপরে সেতু। এই সেতু পেরুতে পারলে, অ্যালান না হোক, ডেভিড নিরাপদ্। অ্যালান রাজদ্রোহী, সে-রাজা ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড উভয় দেশেরই রাজা। সুতরাং ওর পরিচয় পেলে ইংলন্ডের পুলিসও ওকে ধরবে।

ডেভিডের কথা আলাদা। তার নামে যে হুলিয়া বেরিয়েছে, তা স্কটল্যাণ্ডের পুলিসের ব্যাপার। তার কোন দাম নেই ইংল্যাণ্ডে! কাজেই ক্লাইডের দক্ষিণ কূলে পেৌঁছোতে পারলে তার আর কোন ভয় নেই।

গভীর রাত্রে সেতুর উত্তর পারে লুকিয়ে আছে দু বন্ধু। হঠাৎ সেতুর ওপর উঠবে না। কী জানি যদি পাহারাওয়ালা থাকে! থাকলেই সে পরিচয় চাইতে পারে। কাগজপত্র তলব করতে পারে প্রয়োজন বুঝলে।

হ্যাঁ, আছেই প্রহরী। এক বুড়ী যাচ্ছিল সেতুর ওপর লাঠি ঠকঠক করে করে। প্রায় মাঝামাঝি পেৌঁছে গেছে। হঠাৎ বাজখাঁই গলায় কে হেঁকে উঠল—"যায়?" না, হল না। সাহস করা চলে না। ডেভিড আর অ্যালানের মত দুটো লোককে এত রাত্রে পুলের ওপর দেখলে অতি বড় নির্বোধ প্রহরীরও মনে সন্দেহ জাগবে এবং সন্দেহ জাগলেই অনর্থ ঘটবে।

হতাশ হয়ে তারা পুল ছেড়ে সরে এল, হাঁটতে লাগল কূল ধরে। এই জলস্রোতটার ওপারেই তারা নিরাপদ্ হতে পারে, কিন্তু ওপারে যাওয়ার উপায় নেই। সেতু আছে, সে সেতুতে ওঠবার অধিকার তাদের নেই। সাঁতার? সাঁতার ডেভিড সামান্য জানে, অ্যালান একদম জানে না। এখন একমাত্র উপায় নৌকো। যদি রাত্রির অন্ধকারে নৌকোয় পেরিয়ে যাওয়া যায়, তবেই রক্ষা। কিন্তু নৌকো পাওয়া যাবে কোথায়?

পরের দিন কুইন্সফেরীর ঠিক উলটো দিকে একটা ছোট হোটেলে তারা ঢুকল কিছু খেয়ে নেবার জন্য। হোটেলওয়ালা অনুপস্থিত, একটিমাত্র মেয়ে উপস্থিত রয়েছে খরিদ্দারদের ভোজ্য-পানীয় যোগাবার জন্য।

অ্যালান লক্ষ্য করে দেখল মেয়েটিকে। তারপর ডেভিডকে বলল—"মেয়েটির দয়াধর্ম আছে বলে মনে হয়। ওর দয়া যাতে হয়, তারই চেষ্টা করব।"

তখনকার মত তারা বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে, কিন্তু ফিরে এল দুপুরবেলায়, হোটেল যখন জনশূন্য।

মেয়েটি তাদের আবার আসতে দেখে আশ্চর্য হল। আরও আশ্চর্য হল, অ্যালান যখন শুরু করল তাকে দুঃখের কাহিনী শোনাতে। নিজের কাহিনী মোটেই নয়, ডেভিডেরই কথা সব। সত্য মিথ্যায় জড়িয়ে। ডেভিড বড় বংশের ছেলে, ওই দক্ষিণ মুলুকের। উত্তর অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে মিথ্যা বদনামের ভাগী হয়েছে রাজদ্রোহী বলে। আসলে ও রাজা জর্জের ভক্ত প্রজা, কিন্তু জ্যাকোবাইট সন্দেহে ওর নামে হুলিয়া বার করা হয়েছে। এখন যদি ও এ-কূলে ধরা পড়ে, নিশ্চয় ফাঁসি যাবে।

কথা শেষ করল উকিল রেনকিলারের নাম করে—"তুমি নিশ্চয় জান কুইন্সফেরীর বিখ্যাত জমিদারি।"

মেয়েটির মনে সন্দেহ জাগে নি, উপরন্তু জেগেছে দয়া। এমন সুন্দর ছেলেটি যদি বিনা দোষে বেঘোরে মারা যায়, বড় দুঃখের কথা। সে মিষ্টস্বরে বলল—"আমি রাজী আছি তোমাদের সাহায্য করতে। কী তোমাদের দরকার, তাই বল।"

"দরকার একখানা নৌকো। কেউ একজন রাত্রির অন্ধকারে নৌকোয় করে আমাদের ওপারে রেখে আসবে অতি গোপনে—আমাদের একমাত্র প্রয়োজন এইটিই। জানো এমন কোন দয়ালুকে, যে দুটো অভাগার জন্য এই কষ্টটুকু স্বীকার করবে?"

"জানি। অর্থাৎ আমিই করব। আরও খানিকটা ভাটিতে তোমরা ছোট একটা বন দেখতে পাবে ঠিক নদীর ওপরেই। ওইখানে গিয়ে অপেক্ষা কর তোমরা যথাসম্ভব গোপনে। একটু বেশী রাত্রে আমি নৌকো নিয়ে আসব তোমাদের কাছে।"

সারাটা দিন সে কী গভীর উৎকণ্ঠা! হবে কি হবে না, মেয়েটি পারবে কি পারবে না! এইভাবে নদীর ধারে আর দু একদিন যদি ঘোরাফেরা করতে হয়, ধরা পড়ে যেতে হবে। আজই দু একজন লোক কী জানি কেমন ভাবে ওদের দিকে চাইতে চাইতে গিয়েছে!

মেয়েটা শেষকালে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে না তো?

না, তা সে যায় নি।

রাত দুপুরে সে ঠিক নৌকো নিয়ে এসেছে। তুলে নিয়েছে অ্যালান আর ডেভিডকে। ওরা ধন্যবাদের কথা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সে নিষেধ করেছে—"একদম চুপ করে থাকো। যত নিঃশব্দে কাজ শেষ করা যায়, ততই ভাল। রাতের কথা অনেকদূর যায়।"

নিঃশব্দে নৌকো বেয়ে সে কুইন্সফেরীর উজানে এক নির্জন জায়গায় ওদের নামিয়ে দিল। আর ওরা একটি কথা উচ্চারণ করবার আগেই আবার নৌকো ভাসিয়ে দিল গভীর জলে। দুটি অপরিচিত মানুষকে জীবন দান করে বালিকা নিঃশব্দে তাদের সামনে থেকে সরে গেল, একটিও ধন্যবাদের প্রতীক্ষা না করে।

রাতটা নদীর ধারেই পড়ে থাকতে হল। প্রভাত হলেই ডেভিড রওনা হল উকিল রেনকিলরের উদ্দেশে। অ্যালান লুকিয়ে রইল নদীর ধারেই একটা গর্তের ভেতরে।

রেনকিলরের বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত হল না। ভদ্রলোক তখন কাজে বেরুচ্ছিলেন, হঠাৎ ডেভিড সামনে গিয়ে বলল—"আমি আপনার সঙ্গে দুটো কথা কইতে চাই, আমার নাম ডেভিড ব্যালফুর।"

রেনকিলর চমকে উঠলেন—"তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? তোমার খোঁজ করবার জন্য ইসেনডিনের পাদরি কাম্বেল যে সেদিনও আমার কাছে এসেছিলেন। অথচ তোমার কাকা—তা থাকুক সে কথা। কোথায় ছিলে তুমি, সব খুলে বল।"

সব খুলেই বলল ডেভিড। এবং রেনকিলর সব কথা বিশ্বাসও করলেন। তারপর তিনি

বললেন—"মামলা করলে পৈতৃক জমিদারিটা তুমি পেয়ে যাবে, কারণ বড় ভাই আলেকজান্ডারই ছিলেন জমিদারির মালিক। বিশেষ কারণে তিন ছোট ভাইকে সেটা ভোগ করতে দিয়েছিলেন বলে তাঁর অধিকার নষ্ট হয় নি, বা তোমার উত্তরাধিকারও বিলুপ্ত হয় নি। কিন্তু মামলা করলে অনেক ঝামেলা। অনেক সময় লাগবে, অনেক অর্থ অকারণে অপব্যয় হয়ে যাবে। তার চেয়ে, সহজে যদি কাজ উদ্ধার করা যায়, সেই চেষ্টা করা যাক।"

সেইদিন সন্ধ্যার পর রেনকিলর রওনা হলেন শো-এর বাড়ির দিকে। সঙ্গে তাঁর কেরানী টোরান্স, আর ডেভিড ও অ্যালান। অ্যালানকে তিনি অনেক কথা বললেন চুপি চুপি।

শো-তে পৌঁছে অ্যালান গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল, অন্য তিনজন লুকিয়ে রইলেন দেউড়ির স্তম্ভের পেছনে। দরজায় শব্দ শুনে এবেনেজার ওপরের জানালা খুলল—জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল তার মুখ এবং বন্দুকের নল।

অ্যালান বলল—"আমি ডেভিডের খবর নিয়ে আসছি। নীচে এসে কথা বলুন আমার সঙ্গে। ডেভিডকে আমরা ছেড়ে দেব, না আটকে রাখব, তাই বলুন।"

কথার ভঙ্গীটাই এমন যে এবেনেজার সহসা তা উড়িয়ে দিতে পারল না। পাপীর মন তো! ভাবল কী জানি কোথায় কী বিপদ্ বাধল আবার। সে নেমে এসে অ্যালানকে ভেতরে ডাকল। কিন্তু অ্যালান বলল—"আপনার মত সাংঘাতিক লোকের ঘরের ভেতর আমি ঢুকব না। এইখানে বাইরে বসে, যা বলবার, তা বলছি।"

"কভেনান্ট জাহাজে আপনি তো তুলে দিলেন ডেভিডকে, হোসিয়াসনকে ঘুষ দিয়ে—"

"না, না, আমি কেন? আমি কেন ঘুষ দেব?" তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ এল।

কথার ভঙ্গীটাই এমন যে এবেনেজার সহসা তা উড়িয়ে দিতে পারল না। পাপীর মন তো! শুনুন, কভেনান্ট জাহাজ তো ডুবল, ডেভিড কূলে উঠল বটে, কিন্তু উঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তাকে তুললাম আমরা, নিয়ে গেলাম আমার বাড়িতে, সেইখানে সে আছে। মানে আমরা আটকে রেখেছি, আপনার কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায় করবার আশায়। কত দেবেন বলুন! যদি না দেন, তাকে ছেড়ে দিই ; সে তো বলছে খালাস হয়ে সে রেনকিলরের সাহায্যে সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারবে, আপনার কাছ থেকে।"

এবেনেজার ভাবতে লাগল। ভেবে ভেবে শেষকালে বলল—"আমি যদি তোমাকে খুশী করতে পারি, তুমি ওকে সারাজীবন আটকে রাখবে?"

"আটকেও রাখতে পারি, মেরেও ফেলতে পারি।" অম্লানবদনে বলে অ্যালান।

"না, মেরে ফেলার দরকার নেই। আটক রাখলেই হবে। হোসিয়াসনের হাতেও ওকে দিয়েছিলাম—ওই দূরদেশে নিয়ে আটক রাখবার জন্যই।"

"শুভ সন্ধ্যা, মিস্টার ব্যালফুর"—এগিয়ে এলেন উকিল।

"শুভ সন্ধ্যা, মিস্টার ব্যালফুর"—এগিয়ে এল উকিলের কেরানী।

"শুভ সন্ধ্যা, কাকা এবেনেজার"—এগিয়ে এল ডেভিড।

এবেনেজার যেন পাথর বনে গেল।

রেনকিলর তাকে বোঝালেন—তাঁর এবং টোরান্সের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণ হবে যে হোসিয়াসনের হাতে ডেভিডকে তিনি সঁপে দিয়েছিলেন—তাকে দূরদেশে নিয়ে আটক রাখবার জন্য। এটা গুরুতর অপরাধ, এর জন্য এবেনেজারের দীর্ঘ কারাবাস অবশ্যম্ভাবী।

ভয় পেয়ে এবার এবেনেজার বলল—"তার দরকার নেই। আপনি রফা করিয়ে দিন।"

রেনকিলর দলিল তৈরি করিয়েই এনেছিলেন। এবেনেজার সই করে দিল। দলিলের শর্ত হল এই যে এবেনেজার যতদিন বাঁচবে, জমিদারির এক-তৃতীয়াংশ আয় সে রেখে বাকীটা ডেভিডকে দেবে, এবং তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তিটাই হবে ডেভিডের।

আর কি! ডেভিড রাতারাতি ধনী হয়ে গেল। রেনকিলর তার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা করিয়ে দিলেন। অচিরেই অ্যালানের ফরাসী দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এডিনবরা থেকে ছাড়ছে সে জাহাজ। এডিনবরার পেছনে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দু বন্ধু পরস্পরকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সম্ভাষণ জানাল—"বিদায় বন্ধু!"

● লেখক পরিচিতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে দিক্‌পাল সাহিত্যরথীদের প্রতিভার আলোকে ইংরেজী সাহিত্য ভাস্বর হয়ে উঠেছিল, রবার্ট লুই স্টিভেনসন তাঁদের অন্যতম।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা শহরে তাঁর জন্ম হয়। পিতা টমাস স্টিভেনসন সচ্ছল অবস্থার লোক ছিলেন, কাজেই পুত্রের শিক্ষার জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থাই করেছিলেন তিনি। কিন্তু লুইয়ের ক্ষীণস্বাস্থ্য হল উচ্চশিক্ষার প্রতিবন্ধক। তবু তিনি আইন অধ্যয়ন করে

● রবার্ট লুই স্টিভেনসন



টেবিলের ওপর সেটা উপুড় করে ধরতেই ঝুড়ঝুড় করে মোহর পড়তে লাগল তা থেকে



ইঞ্জুন জো চোখের পলকে সেই ছোরা বিঁধিয়ে দিল ডাক্তারের বুকে

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ করবার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন এক সময়। সে-চেষ্টা যে ফলবতী হয় নি, সাহিত্যানুরাগীদের সেটা সৌভাগ্য। যে-কোন ব্যবসাতে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকলে সাহিত্যসৃষ্টিতে এমন উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যাওয়া তাঁর পক্ষে হয়ত সম্ভব হত না।

সারা স্কটল্যান্ড দেশটাতে এমন উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না, যেখানে লুই স্টিভেনসন পর্যটন করেন নি। স্বদেশের হ্রদ পর্বত কানন প্রান্তর তাঁর স্বর্গাদপি প্রিয় ছিল, যে বহুবিচিত্র সৌন্দর্য সুষমা তিনি তাদের ভেতর দেখতে পেয়েছিলেন, তা বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'কিড্ন্যাপ্‌ড' উপন্যাসে।



লুই স্টিভেনসন

অসংখ্য উপন্যাস তিনি রচনা করে গিয়েছেন, যার প্রত্যেকটিই আজও পর্যন্ত পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট, অভিভূত করে ফেলবার ক্ষমতা রাখে। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী রচনায় তাঁর মত শক্তিধর লেখক বিশ্বসাহিত্যেই কম আছেন। "ট্রেজার আইল্যান্ড", "গ্রেট নর্থ রোড" প্রভৃতি এখনও সারা পৃথিবীতে অতুলনীয় জনপ্রিয়তার দাবি রাখে। সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতীয় রসসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে "ডাক্তার জেকিল ও মিস্টার হাইড"ও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস।

কিডন্যাপ্‌ড পুস্তক রচিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার যে অতি সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ এই সংকলনে সংযোজিত হল, তা থেকেই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসখানির চিত্তাকর্ষণশক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

চিরজীবন ভগ্নস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্টিভেনসন দেশত্যাগ করেন এবং সুদূর সামোয়া দ্বীপে গিয়ে বাস করতে থাকেন চিকিৎসকের পরামর্শে। সেইখানেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।



কেনিলওয়ার্থ

সরাইখানাটার নাম হল ব্ল্যাক বেয়ার—কালো ভালুক। অক্সফোর্ড শহর থেকে তিন চার মাইলের ভেতরেই। অনেক দিনের নামী সরাই এটি, মালিক গাইল্‌স গস্‌লিং এর দৌলতে দু-পয়সা রোজগার করে ইদানীং এ-অঞ্চলে বেশ একজন কেউকেটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বিনা-মাইনের সরকারী পদও কী-যেন-একটা জুটেছে তাঁর বরাতে।

সেদিন—অর্থাৎ রানী এলিজাবেথের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে—কোন একদিন অপরাহ্ণে একটি পথিক এসে ঢুকল কালো ভালুকের গুহায় অর্থাৎ খাওয়ার ঘরে। এসেই গস্‌লিংকে বলল —"কী মামা? চিনতে পার? আমি তোমার ভাগনে মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ন।"

চেহারার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তবু গস্‌লিং চিনল। চিনে খুশী হল না। মাইকেল ছেলেটা ছিল অতি দুর্বৃত্ত, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাইকে জ্বালিয়ে মেরেছে—যতদিন দেশে ছিল। আট দশ বছর আগে ও যখন আমেরিকায় চলে গেল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দেশের লোক।

সেই মাইকেল আবার এসেছে। এই কয়েক বছরে আগের চেয়েও বেপরোয়া বদমাইশ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়। আবার জ্বালাতে শুরু করবে গস্‌লিংকে। একান্ত অপ্রসন্ন মনেই ভাগনেকে স্বাগত জানাল সে।

গস্‌লিং-এর অনুমান যে অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল, তা অচিরেই প্রমাণ হয়ে গেল। খেতে

বসেই নিজের চরিত্রটি ষোল-আনা উদ্‌ঘাটিত করে ফেলল মাইকেল! সে যে কোন অসৎ কর্মেই পিছপা হয় না, ফাঁসি যাওয়ার ভয়কেও সে যে তিলমাত্র গ্রাহ্য করে না, পুরুষের জীবন এবং নারীর মর্যাদাকে এক দামড়ি মূল্যও যে দেয় না সে. টেবিলে তার পাশে বসে যারা পানভোজন করছিল, তারা দু-দণ্ড তার কথা শুনতে শুনতেই সে পরিচয় পুরো মাত্রায় পেয়ে গেল।

পূর্ব পরিচিত প্রত্যেকের খবরই একে একে নিচ্ছে মাইকেল। এই ভাবেই উঠে পড়ল অ্যাণ্টনি ফস্টারের কথা। ভূতপূর্ব রানী মেরীর আমলে, প্রোটেস্টাণ্টদের যখন ধরে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারা হত, তখন এই ফস্টার ছিল ও-কর্মের উৎসাহী কর্মী একজন। স্বহস্তে বিশপ রিডলির গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ওই ফস্টারই। এ-যুগে, স্বয়ং রানী এলিজাবেথই যখন প্রোটেস্টাণ্ট. তখন তো অবশ্যই পাষণ্ড ফস্টার ফাঁসির দড়িতে পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়েছে?

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্? মোটেই তা নয়। মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ন শুনে অবাক্ হল যে সে-যুগের মুর্দাফরাস ফস্টার এ-যুগে রীতিমত গুছিয়ে বসেছে। ভোল পালটে সে এখন নিষ্ঠাবান প্রোটে-স্টাণ্ট বনে গিয়েছে, আগেকার ক্যাথলিক ধর্ম-যাজকদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত-করা কামনর প্লেসের প্রকাণ্ড বাড়িখানার মালিকই হয়ে দাঁড়িয়েছে ফস্টার।

খাওয়ার টেবিলেই নান্য জনে নানা কথা বলতে শুরু করল ফস্টারের সম্বন্ধে। গোল্ডথ্রেড লোকটা পশমী-রেশমী কাপড় ফিরি করে বেড়ায়. তার কাছে পাওয়া গেল চমকপ্রদ খবর। সে নাকি সবে কাল কামনর প্লেসের হাতার ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছিল, পথ সংক্ষেপ করবার জন্য। বাড়িটার দোতলায় খোলা জানালায় সে নাকি হঠাৎ দেখতে পেয়েছে পরমাসুন্দরী এক যুবতীকে। ভাল করে দেখার সুযোগ হয় নি, কারণ তাকে নীচের বাগানে দেখতে পেয়েই সুন্দরী সরে গিয়েছিল জানালা থেকে।

মাইকেল টিটকারি দিয়ে উঠল—"অমনি তুই পালিয়ে এলি, আর কোন খোঁজখবর নেবার চেষ্টা না করে? তুই একটা কাপুরুষ!"

গোল্ডথ্রেড মুখ গোমড়া করে বলল—"কী করে খবর নেব শুনি? ফস্টার টের পেলে আমার জান বার করে দেবে না একটি গুলিতে?"

"হুঃ! ফস্টার! জান বার করে দেবে? দিক তো আমার জান বার করে! আমি কাল সকালেই গিয়ে মেয়েটার সম্বন্ধে সব খবর নিয়ে আসব দেখিস! ফস্টারের বাড়িতে সুন্দরী মেয়ে? যে মানুষের সামনে বেরোয় না, এমন মেয়ে? নিশ্চয় এর ভেতর ভয়ানক কোন রহস্য আছে। আমি সে রহস্য ভেদ করবই।"

"রহস্যভেদ করতে গেলেই বন্দুকের গুলি তোমারও বক্ষ ভেদ করবে"—শুনিয়ে দিল গোল্ডথ্রেড।

"বাজি রাখো! বিশ পাউন্ড বাজি ধরছি আমি। যদি খবর নিয়ে আমি নিরাপদে ফিরে আসতে না পারি, তবে বিশ পাউন্ড হারব।"

"আমিও!" ঘরের দূরতম কোণ থেকে একটি লোক বলে উঠল—"ওই বাজিতে আমারও ভাগ রইল। বিশ পাউন্ড বাজি আমিও ধরছি।"

সকলে অবাক্ হয়ে তাকাল এই লোকটির দিকে। এ-অঞ্চলে একেবারেই অপরিচিত ও! আজ তিন-চার দিন হল কে জানে কোথা থেকে এসে এই হোটেলে বাসা বেঁধেছে। একা একা এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন, খাওয়ার সময়টিতে ফিরে এসে ওই নিরালা কোণটিতে একা বসে খেয়ে নেয় খাবারটুকু, মদ-টদের ধার দিয়েও যায় না কখনও। শত-শত লোক আসছে রোজ এখানে, কারও সঙ্গে ও আলাপ করে নি. ওর নামটাও গস্‌লিং ছাড়া অন্য সবাইয়ের অজানা। হ্যাঁ, গস্‌লিংকে বাধ্য হয়েই সব খরিদ্দারের নাম জানতে হয়, এর নাম হল এডমণ্ড ট্রেসিলিয়ান।

ট্রেসিলিয়ান হঠাৎ মাইকেল ল্যাম্‌বোর্নের মত বাউন্ডুলে লোকের কাঁধে কাঁধ মেলাতে গেল একটা মাথামুণ্ডবিহীন বাজির ব্যাপারে, এতে সবচেয়ে বেশী অবাক্ হয়ে গেল সরাইওয়ালা গস্‌লিং। বলতে গেলে, এই স্বল্পভাষী, মিতাহারী, অথচ দরাজহাতে পয়সা-দেনেওলা বিদেশী যুবকের ওপরে এই কয়দিনে বেশ একটু পক্ষপাতই এসে পড়েছে তার। সব খরিদ্দার যদি এমনি কম খেতো, আর বেশী পয়সা দিত, তাহলে তো হোটেলের ব্যবসা হতে পারত সব ব্যবসার সেরা!

সেই রাত্রিতে গস্‌লিং গিয়ে ট্রেসিলিয়ানকে ধরল তার শোবার ঘরে। "কেন আপনি আচমকা এই পাগলামি-ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলেন? ওই অ্যান্টনি ফস্টার অতি ভয়ানক মানুষ। তার ওপর, তার পেছনে আছে শক্তিমান সব লোক। লোকে জানে যে কামনর প্লেসের বাড়িটা ফস্টারেরই নিজস্ব। কিন্তু আমি ভেতরের কথা জানি। বাড়িটার আসল মালিক কোন বড় জমিদার, নিজের নাম-ধাম গোপন করে ওই ফস্টারের বেনামীতে যত বে-আইনী নষ্টামি করে বেড়ায়। ফস্টার যে সুন্দরী মেয়েটাকে আগলাচ্ছে ওই বাড়িতে, সে নিশ্চয় সেই প্রচ্ছন্ন বড় লোকটার বন্দিনী। আপনি হয়ত নিছক খেয়ালের বশে ওখানে যাবেন, ফস্টার কিন্তু ভাববে—আপনি ওই সুন্দরীর খোঁজেই গিয়েছেন। তারপর সে মোটেই ইতস্ততঃ করবে না গুলি চালাতে, কারণ সে জানে যে তার বড়লোক মুরুব্বীর হস্তক্ষেপে নরহত্যার দায় থেকেও সে অনায়াসে রেহাই পাবে।"

ট্রেসিলিয়ান খুলেই বলল সব কথা গস্‌লিংকে। নিছক খেয়ালের বশে সে যাচ্ছে না কামনর প্লেসে। একটি অপহৃতা যুবতীর সন্ধান করতেই সে বেরিয়েছে গৃহ ছেড়ে। এই অঞ্চলেই কোথাও তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে—এ খবর পেয়েই সে এসেছে ব্ল্যাক বেয়ারে। এতদিন কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিন্তু গোল্ডথ্রেডের গল্প শুনে তার ভরসা হয়েছে যে হয়ত

এইবার সন্ধানের একটা সূত্র হাতে পাওয়া গিয়েছে। এ-অবস্থায় কি মাইকেলের সঙ্গ নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় আছে তার?

গস্‌লিং আর কথা কইতে পারল না। যে-লোক অপহৃতা আত্মীয়ার খোঁজে বেরিয়েছে, তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা একেবারেই অনধিকারচর্চা। সে শুধু ট্রেসিলিয়ানকে আর একবার মনে করিয়ে দিল যে ফস্টার সাংঘাতিক লোক। তার সাথে যেকোন রকম কারবার করতে হলে হুঁশিয়ার হয়েই করা দরকার।

পরের দিন সকালেই মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ন আর এডমন্ড ট্রেসিলিয়ান বেরিয়ে পড়ল তাদের অভীষ্ট স্থানের উদ্দেশে। ট্রেসিলিয়ান চলেছে কর্তব্যের আহ্বানে, আর মাইকেল চলেছে উচ্চাশার তাড়নায়। অসৎ লোকের উচ্চাশা অসাধু পন্থা অবলম্বন করেই নিজেকে সার্থক করার চেষ্টা করে। ল্যাম্‌বোর্ন চায় রাতারাতি বড়লোক হতে। তার জন্য যে-কোন গুণ্ডামি, যে-কোন অপরাধ করতে সে প্রস্তুত। কামনর প্লেসে লুক্কায়িত সুন্দরীর গল্প শুনে সে বুঝতে পেরেছে—এখানে কোন গুরুতর রহস্যই নিহিত আছে নিশ্চয়। রহস্যের আড়ালে বসে যে-শক্তিমান ব্যক্তি কলকাঠি নাড়ছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়াই উদ্দেশ্য ল্যাম্‌বোর্নের। সে ব্যক্তিটিও সৎলোক নন, তা তো তাঁর কার্যেই প্রকাশ। সুতরাং ল্যাম্‌বোর্ন তাঁর কাজে লাগতে না পারবে কেন? শক্তিমান অসৎ বড়লোকদের তো ল্যাম্‌বোর্নের মত বিবেকহীন দুঁদে লোকদের সাহায্য হামেসাই দরকার হয়! ল্যামবোর্ন অর্থ পেলে তো যে-কোন সাহায্য করতে রাজী!

গ্রাম থেকে বেশ কিছু দূরে ওই বাড়িটা, কামনর প্লেস। বিস্তীর্ণ হাতার ভেতরে পুরোনো বাড়ি। অ্যাবিংডনের অ্যাবি ছিল এটি, ক্যাথলিকদের প্রভুত্বের সময়ে। প্রোটেস্টান্ট এলিজাবেথের আমলে অ্যাবি এখন অতীতের স্মৃতিমাত্র, ধর্মযাজকেরা নির্বাসিত, মূল্যবান সম্পত্তিটার সত্যিকার মালিক যে কে, তা সাধারণ লোকে জানে না। তারা অ্যান্টনি ফস্টারকেই সেখানে দেখতে পায় এবং স্বভাবতঃই ভাবে যে ফস্টারই মালিক।

প্রাচীরে ঘেরা বাগান, তার আড়ালে সুবৃহৎ ভবন। কোথাও একতলা, কোথাও দুতলা, কোথাও তিনতলাও। কত যে ঘর তাতে, কত যে গুপ্ত মহল তাতে, তা ফস্টার নিজেও জানে না হয়ত।

ট্রেসিলিয়ান আর ল্যাম্‌বোর্ন গিয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ল। একটা বুড়ী দাসী এসে দরজার গায়ের ছিদ্রপথে ভাল করে দেখল তাদের। তারপর জিজ্ঞাসা করল—কী চায় তারা।

ল্যাম্‌বোর্নই জবাব দিল—"ফস্টারকে বল গিয়ে, তার পুরোনো বন্ধু মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ন দেখা করতে এসেছে। দেখা হবে না বললে আমি শুনব না। সুতরাং ঝামেলা না বাড়িয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে বল।"

অল্পক্ষণ পরেই ঘড়াংঘড় শব্দে দরজা খুলে দেখা দিল ফস্টার অতি বিরসমুখে। "তুমি

সত্যিই সেই ল্যাম্‌বোর্ন? ফাঁসিকে ফাঁকি দিয়েছ এতদিন ধরে? তা বেশ, এখন আমার কাছে কেন?"

ল্যামবোর্ন বলল—"সে কথা নিরিবিলিতে বলব। আমার সঙ্গীটি এখানে এই ঘরেই বসুক, আমায় তুমি অন্য ঘরে নিয়ে চল।"

ল্যাম্‌বোর্নকে নিয়ে ফস্টার চলে গেল অন্য ঘরে। ট্রেসিলিয়ান বসে ভাবতে লাগল—অতঃপর কী করা যায়! ল্যাম্‌বোর্নের সঙ্গ নিয়ে দৈত্যের অন্দরে সে ঢুকেছে। এখন দৈত্যপুরে বন্দিনী রাজকন্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কেমন করে?

তারপর এক গুরুতর সন্দেহ—এই বন্দিনীই তো তার অপহৃতা বাল্যসঙ্গিনী এমি রবসার্ট? তা তো নাও হতে পারে? এই মুহূর্তে ইংলন্ডের কত কুমারী কন্যা অত্যাচারী লম্পটদের হাতে বিভিন্ন স্থানে বন্দিনী হয়ে আছে, তা কি কেউ জানে?

এখানকার এই বন্দিনী মেয়েটিই এমি কি না, তা জানতে হলে তো প্রথমে তাকে চাক্ষুষ দেখা দরকার। এই বিশাল সাত-মহলা ভবন এর কোন্ অংশে সে থাকে—তা তো কিছুই জানে না ট্রেসিলিয়ান! খুঁজে কি পাওয়া যাবে? যাক্ বা না যাক, খুঁজতে তো হবেই। না যদি খুঁজবে, তাহলে সে এসেছে কেন? আর খুঁজতে যদি হয় তো এই তার অবসর। যতক্ষণ ল্যাম্‌বোর্নের সঙ্গে কথায় বার্তায় ব্যাপৃত আছে ওই দুশমন ফস্টার।

এমিকে খুঁজে দেখবার জন্যই ট্রেসিলিয়ান ঘর থেকে বেরুতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে গেল। আর সেই দরজাটা দিয়ে এক ঝাপটা ফুলেল বাসন্তী হাওয়ার মত ছুটে ঘরে এসে ঢুকল এক অপরূপা সুন্দরী কিশোরী! তাকে দেখামাত্রই ট্রেসিলিয়ান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তৎক্ষণাৎ বুঝেই উঠতে পারল না যে কীভাবে তাকে সম্ভাষণ করা উচিত। এতদিন পরে, এত অনুসন্ধানের পরে, এই বিসদৃশ পরিবেশে এমিকে সত্যিই দেখতে পেয়ে তার বিচার-বুদ্ধি যেন অসাড় হয়ে গেল! গায়ের জামাটা কাঁধের ওপর ছিল, তাই মুখের ওপর টেনে দিয়ে সে এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল নিশ্চল হয়ে।

এমি ছুটে আসে তার দিকে—"প্রভু! স্বামী! এসেছ তুমি?"

বিস্ময়ে স্থান কাল ভুল হয়ে গেল ট্রেসিলিয়ানের। সে তাড়াতাড়ি মুখের আবরণ সরিয়ে ফিরে দাঁড়াল এমির দিকে—পরম স্বস্তির সুরে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল—"স্বামী? ভার্নি তাহলে স্বামী তোমার? বিবাহ করেছে তোমাকে? তা যদি করে থাকে পরম দুঃখের ভেতরেও অনেকখানি সান্ত্বনা সেটা।"

তার কথার উত্তর দেবে কি, মুখের ওপর যেন এক ঘা চাবুক এসে পড়েছে, এমনি ভাবেই এমি পিছিয়ে গেল কয়েক পা। তার মুখ থেকে ভয় আর উদ্বেগ মিশে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল—"এডমন্ড? তুমি?"

ট্রেসিলিয়ান তিক্তস্বরে বলল—"হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কে? তোমার বৃদ্ধ পিতার অথর্ব দেহে এমন শক্তি আজ আর অবশিষ্ট নেই যে অপহৃতা কন্যার সন্ধানে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াবেন। উপযুক্ত পুত্র তাঁর কেউ নেই, আছি মাত্র আমি, বন্ধুপুত্র। তাই আমাকেই ছুটে আসতে হয়েছে। কত সম্ভব অসম্ভব জায়গা যে ঘুরেছি তোমার খোঁজে! শুধু তোমার পিতার মুখ চেয়ে। আজ যদি গিয়ে বলতে পারি যে, তুমি সত্যিই ভার্নির বিবাহিতা স্ত্রী—"

এমির মুখ থেকে একটা ক্রুদ্ধ তর্জন বেরুলো—"না, না—"

ট্রেসিলিয়ান এ-কথার অর্থ বুঝল অন্যরকম, বুঝল যে বিবাহিতাই নয় এমি। "তাহলে? ভার্নির বিলাসের দাসী তুমি? ধিক্! এও শুনতে হল?"

এমিও ক্রুদ্ধস্বরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল ফস্টার আর ল্যাম্‌বোর্ন।

এমি এসে এঘরে ঢুকেছে এবং ল্যাম্‌বোর্নের সঙ্গী অপরিচিত লোকটার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছে, এ দেখেই তো মাথায় আগুন জ্বলে উঠল ফস্টারের—"এর মানে কী মনিব ঠাকরুন? আপনার যে এদিকে আসা নিষেধ, তা কি আপনাকে বারবার বলে দেন নি মনিব? তার ওপর একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে—"

এই বলেই সে ট্রেসিলিয়ানকে উদ্দেশ করে চিৎকার করতে লাগল—"বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এক্ষুণি, নইলে খুন করব তোমাকে! কী সাহসে তুমি গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য ঢুকেছ এই বাড়িতে? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? বেরিয়ে যাও এক্ষুণি, যদি প্রাণটা বেঘোরে খোয়াতে না চাও—"

ইতিমধ্যে ল্যাম্‌বোর্নে আর ফস্টারে একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। ফস্টারের প্রসন্ন মনিবের সত্যিই একজন বেপরোয়া দাঙ্গাবাজ অনুচর দরকার আছে। সেই কাজের জন্য উপযুক্ত লোক পেলে তাকে কাজে বহাল করে নিতে হুকুম রয়েছে ফস্টারের ওপর। ল্যাম্‌বোর্নকে ছেলেবেলা থেকেই তো জানে ফস্টার। যে-ধরনের দুঃসাহসিক বে-আইনী সব কাজ করতে হবে মনিবের পক্ষ নিয়ে, ল্যাম্‌বোর্নের দ্বারা সে সবই অতি উত্তমরূপে নির্বাহ হবে, তা ফস্টারের চাইতে ভাল কে আর জানে? সে ল্যাম্‌বোর্নকে বহালই করেছে তার মনিবের নাম করে।

সুতরাং ল্যাম্‌বোর্ন এখন ফস্টারের কথারই প্রতিধ্বনি করে বলছে—"তুমি গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যেই এসেছ, তা জানলে কি আমি তোমাকে সঙ্গে আনি? কাজেই এখন ভালোয় ভালোয় চলে যাও তুমি। তা নইলে ফস্টার যদি তোমায় মেরেও ফেলে, আমি তোমায় কোন সাহায্য করতে পারব না।"

ইতিমধ্যে এমিকে একরকম জোর করেই ফস্টার অপসারিত করেছে সেখান থেকে। ট্রেসিলিয়ান দেখল যে এখানে বর্তমানে আর অপেক্ষা করে কোনই লাভ হবে না তার। সেও ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করল।

কামনর প্লেসের হাতা অতি বিস্তীর্ণ, দীর্ঘদিনের অযত্নে গভীর জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে পথঘাট। অচেনা লোকের পক্ষে দিক ঠিক করে পথ চলা অসম্ভব। তার ওপরে ট্রেসিলিয়ানের মাথারও ঠিক নেই। উত্তেজনায়, আশঙ্কায় সে দিশেহারার মত ছুটছে যেদিকে দু-চক্ষু যায়। এ-অবস্থায় সে ভুল পথ ধরে বিপদের মুখে গিয়ে পড়বে, তার আশ্চর্য কী!

বস্তুতঃ হলও তাই। সামনে প্রাচীর এবং সেই প্রাচীরের গায়ে একটা ছোট দরজা দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। দরজা যদি তালাবন্ধও থাকে, তবুও কোন রকমে সে বেরুতে পারবেই। ভেঙে বেরুতে হলেও বেরুবে। সে সেইদিকে এগুলো।

কাঠের পুরোনো দরজা। না, তালা বন্ধ নেই, টেনেই খোলা যাবে।

কিন্তু ট্রেসিলিয়ান দরজায় হাত দেওয়ার আগেই দরজা সশব্দে খুলে গেল, আর ওদিক থেকে হুড়মুড় করে এসে ভেতরে ঢুকে পড়ল এক সুবেশধারী মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে। দীর্ঘপথ যে সে অশ্বারোহণে এসেছে, তা তার ঘোড়ার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে দেখেই ট্রেসিলিয়ান কটিতে হাত দিল তরোয়াল কোষমুক্ত করবার জন্য। মুখ থেকে তার অজ্ঞাতসারেই ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে এল—"ভার্নি ?"

চমকে উঠে ভার্নিও তাকাল ট্রেসিলিয়ানের দিকে—তারও মুখ থেকে গর্জন শোনা গেল—"ট্রেসিলিয়ান? এখানেও তুমি? ঠিক জুটেছ এসে?"

"নরাধম! নারীচোর! সার হিউগো বরসার্টের আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে তার কন্যাকে অপহরণ করে, সরলা বালিকাকে নরকে ডুবিয়ে, তুমি রেহাই পেয়ে যাবে ভেবেছ?"

"অনধিকার-চর্চাকারীর সাজা রিচার্ড ভার্নি এই ভাবেই দেয়—" এই বলে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে ভার্নি অসিহস্তে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করল ট্রেসিলিয়ানকে। সে যুগের ইংরেজ ভদ্রলোকেরা প্রত্যেকেই পরিচ্ছদের অঙ্গ হিসেবে তরবারি ধারণ করতেন।

দুজনেই অসিযুদ্ধে নিপুণ। কিছুক্ষণ ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধই হল। তারপর দৈববশতঃই পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেল রিচার্ড ভার্নি। ট্রেসিলিয়ান অমনি লাফ দিয়ে তার বুকের ওপর পা তুলে দিয়ে তরোয়াল বাগিয়ে ধরল তার কণ্ঠ লক্ষ্য করে।

কিন্তু আঘাত করবার সুযোগ আর ট্রেসিলিয়ান পেল না। পেছন থেকে একটা লোক তার হাত চেপে ধরল। মুখ ফিরিয়ে ট্রেসিলিয়ান দেখল—সে লোক ল্যামবোর্ন।

ফস্টার আশা দিয়েছে—রিচার্ড ভার্নির অধীনেই ল্যামবোর্ন চাকরি পাবে। ভার্নিকে সে আগে দেখে নি, কিন্তু এই অপরিচিত ভদ্রলোককে ট্রেসিলিয়ান যখন 'ভার্নি' বলে সম্বোধন করছিল, তখন তা শুনেছে ল্যামবোর্ন। কাজেই সে বুঝতে পেরেছে—এই লোকই তার ভাবী মনিব, চাকরি যদি করতে হয় এর কাছে, তাহলে এই মুহূর্তে তার প্রাণটা বাঁচানো দরকার।

ল্যাম্‌বোর্ন বলল—"মাস্টার ট্রেসিলিয়ান, ওসব চলবে না। আমি ওই ভদ্রলোকের চাকরিতে বহাল হয়েছি। সুতরাং ওর সাহায্য করতে আমি বাধ্য। আমরা দাঁড়াচ্ছি দুজন, তুমি একা। কাজেই এক্ষেত্রে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কর্তব্য। দরজা খোলা আছে, চলে যাও। তোমার সঙ্গে আগে থাকতে আলাপ রয়েছে বলেই তোমায় পালাবার সুযোগ দিচ্ছি। তা নইলে—বুঝতেই তো পারছ।—"

ট্রেসিলিয়ান ভেবে দেখল—ল্যাম্‌বোর্নের কথা শোনা ছাড়া উপায় নেই। দুজনের সঙ্গে একার যুদ্ধ সম্ভব নয়। সে আগুন চোখে একবার ভার্নির দিকে তাকিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

ভার্নি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি কে? আমার চাকরিতে তুমি বহাল হয়েছ, এর অর্থ কী? কে তোমায় বহাল করল?"

"বহাল করেছে অ্যান্টনি ফস্টার।"

"বেশ, তাই যদি হয়, তুমি এক্ষুণি ওই দুর্বৃত্তের অনুসরণ কর। ও কোথায় যায়, কী করে—দেখ।"

ল্যাম্‌বোর্ন বলল—"তা আর দেখব কী! ও থাকে আমার মামার হোটেলে। আমি জানি।"

ভার্নি বিরক্ত হয়ে বলল—"থাকে, মানে থাকত তো? এখন ও সেখানেই যায় কি না, দেখ। সেখান থেকে বেরিয়ে যায় যদি, তারপর কোথায় যায়—তাও দেখ।" এই বলে একটা মোহর ছুড়ে দিল তার দিকে। মোহরটা কুড়িয়ে নিয়ে ল্যাম্‌বোর্ন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য।

ট্রেসিলিয়ান সোজা হোটেলেই ফিরে গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে ল্যাম্‌বোর্ন আর তাকে হোটেলে দেখতে পেল না। রাত্রেই ওখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ট্রেসিলিয়ান।

২

সরাইওয়ালা গাইল্‌স্ গস্‌লিংই সতর্ক করে দিয়েছিল ট্রেসিলিয়ানকে। ল্যাম্‌বোর্ন যে ট্রেসিলিয়ানের গতিবিধি সারাদিন ধরে লক্ষ্য করেছে, তা নজর এড়ায় নি গস্‌লিংয়ের। আর ও যে খুনে লোক, তা গস্‌লিংয়ের চাইতে আর কে বেশী জানে? তাই ভালমানুষ হোটেলওয়ালা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল তার অতিথির জন্য, রাত্রিবেলাই ট্রেসিলিয়ানকে বিদায় করে দিয়েছে ও-তল্লাট থেকে।

ট্রেসিলিয়ান ফিরে এল লিডকোট হলে, সার হিউগো রবসার্টের বাড়িতে। একা নয়, সঙ্গে একটি লোক—ওয়েল্যান্ড স্মিথ। লোকটিকে পায় এক মাঠের ভেতর। সেই মাঠে বসে সে কামারের কাজ করত। ট্রেসিলিয়ানের ঘোড়ার পায়ের নাল সে লাগিয়ে দিয়েছিল। তাইতেই আলাপ।

লোকটা নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে ফেলেছিল। এক হাতুড়ে ডাক্তারের শাগরেদ ছিল ও। ডাক্তারটির নাম ডেমেট্রিয়াস। সে নাকি রসায়নশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত। সোনা তৈরি করতে জানে। সত্যি সত্যিই জানে কিনা, তার প্রমাণ কোনদিন পায় নি ওয়েল্যান্ড। তবে একটা জিনিসের প্রমাণ সে পেয়েছিল। সেটা এই যে তার গুরু বিষ তৈরি করতে ওস্তাদ। আড়াল থেকে গুরুর কাজের ওপর চোখ রেখে রেখে বিষবিদ্যায় নিজেও খানিকটা জ্ঞান অর্জন করেছিল ওয়েল্যান্ড। ডেমেট্রিয়াস যে-মুহূর্তে এটা বুঝতে পারল, বিষনজরে দেখতে লাগল শাগরেদকে। ওয়েল্যান্ড গুরুর ভাবান্তর লক্ষ্য করে পালাল। তার ধারণা, ডেমেট্রিয়াস ধরতে পারলেই তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। তার নিজস্ব বিষ-তৈরির প্রক্রিয়া অন্যে জানুক, এটা চায় না ডেমেট্রিয়াস।

ওয়েল্যাণ্ডের ধারণা ডেমেট্রিয়াস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেদিন খুঁজে পাবে, সেইদিনই ওয়েল্যাণ্ডের জীবনের শেষ দিন। ওস্তাদকে এতই ভয় তার। সেইজন্যই এই জনহীন মাঠে এসে কামারের ছদ্মবেশে দিন কাটাচ্ছে সে।

ট্রেসিলিয়ান তাকে পরামর্শ দিল—এভাবে থেকে নিজের জীবনটা নষ্ট করে না ফেলে ওয়ে-ল্যাণ্ডের উচিত কোন জনবহুল জায়গায় গিয়ে থাকা। ভিড়ের ভেতর কে কাকে খুঁজে পাবে? একা থেকে থেকে ওয়েল্যান্ডও তিতোবিরক্ত হয়ে পড়েছিল, সে ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গেই লোকালয়ে ফিরল আবার।

লিডকোটে এসে ট্রেসিলিয়ানের নিষ্ঠুর কর্তব্য হল—সার হিউগোকে তাঁর কন্যার দুরদৃষ্টের কথা জানানো। এমি যে কামনর প্লেসে আছে, এবং বিবাহিতা পত্নী না হয়েও রিচার্ড ভার্নির সঙ্গে বসবাস করছে, একথা বাধ্য হয়েই ট্রেসিলিয়ানকে বলতে হল এমির পিতার কাছে। খবর শুনে সার হিউগো ব্যথায় কাতর না হয়ে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। ব্যভিচারিণী কন্যার নাম যেন আর কেউ তাঁর সামনে উচ্চারণ না করে, তার জন্য কঠোর আদেশ দিয়ে দিলেন তিনি।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু যে রকম ঘটেছে, তা একেবারেই উলটো। ট্রেসিলিয়ান যখন কামনর প্লেসে এমিকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে রিচার্ড ভার্নির বিবাহিতা পত্নী কিনা, তখন এমি রেগে উঠে জবাব দিয়েছিল "না, না, না।" এতে ট্রেসিলিয়ান ভেবেছিল যে, এমি ভার্নির পত্নী নয়, রক্ষিতা।

কিন্তু ওইখানটাতেই হয়ে গিয়েছে প্রকাণ্ড ভুল। এমি বোঝাতে চেয়েছিল যে সে ভার্নির পত্নী নয়, পত্নী অন্য কারও। বিবাহ তার হয় নি—একথা বলা এমির উদ্দেশ্য ছিল না।

দুর্ভাগ্য ট্রেসিলিয়ানের, সে এমিকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সময় পেল না। ফস্টার এসে তাকে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করল।

আসল ঘটনাটা হল এই। ফস্টার যেমন ভার্নির আজ্ঞাবহ ভৃত্য, ভার্নিও তেমনি অন্য এক মহাশক্তিধর ব্যক্তির আজ্ঞাবহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এবং এমি হচ্ছে সেই মহাশক্তিধর ব্যক্তির পত্নী।

সে ব্যক্তি অন্য কেউ নন—রানী এলিজাবেথের অতি প্রিয় সভাসদ্—আর্ল অব লিস্টার। ইংলণ্ডের সবচেয়ে ধনী জমিদার, সবচেয়ে পরাক্রান্ত রণনায়ক, সবচেয়ে সুরূপ সুরসিক পুরুষ যিনি, সেই লিস্টারই যথাবিহিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমাধা করে এমির পাণিগ্রহণ করেছেন।

পাণিগ্রহণ করেছেন. কিন্তু গোপনে। একদা লণ্ডনে বেড়াতে গিয়ে এমি রবসার্ট লিস্টারের নয়নপথে পতিত হয়। লিস্টার সঙ্গে সঙ্গেই মুগ্ধ হয়ে যান তার সৌন্দর্যে। এমি লিডকোটে ফিরে গেল. গোপনে অনুসরণ করলেন লিস্টার। গোপনে, কারণ প্রকাশ্যে বিবাহ করতে হলে রানীর সভাসদ্‌দের সর্বাগ্রে রানীর অনুমতি নিতে হয়। বিনা অনুমতিতে বিবাহ প্রায় রাজদ্রোহ বলেই গণ্য হয়। সকলের পক্ষেই এই নিয়ম. লিস্টারের পক্ষে বিশেষতঃ। কারণ লিস্টার রানীর এতই প্রিয় যে রাজসভার আনাচে-কানাচে এ কানাঘুষা প্রায় শোনা যায় যে রানী নিজেই লিস্টারকে বিবাহ করবেন শেষ পর্যন্ত।

এ-হেন লিস্টার দরিদ্র ভূস্বামীর কন্যা এমি রবসার্টকে দেখে বিবাহ করবার জন্য খেপে উঠলেন। রানীর কাছে অনুমতি চাইবার সাহস নেই. এ অবস্থায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য লিস্টার গোপনেই এমিকে বিবাহ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তাঁর কর্মচারী রিচার্ড ভার্নি দূরসম্পর্কে রবসার্টের আত্মীয়, সেই সূত্র ধরে ভার্নি খুব যাতায়াত শুরু করল লিডকোটে। তারই মধ্যস্থতায় লিস্টারের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ হল এমির। মাত্র আঠারো বছর বয়স এমির। লিস্টারকে দেখে সে এতই মুগ্ধ হল যে এ বিবাহের পরিণাম তার পক্ষে শুভ হবে কিনা. তা ভেবে দেখবার শক্তি আর রইল না তার।

লিস্টার বলেছেন—বিবাহ আপাততঃ গোপন থাকবে কিছুদিনের জন্য, পরে অবশ্যই সর্ব-সাধারণকে জানানো হবে বিবাহের কথা। এমি তাতেই রাজী হয়ে গেল। এক অশুভ রাত্রে ভার্নির সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করল। লিস্টার তাকে এক নিভৃত গির্জায় বিবাহ করে নিয়ে গেলেন কামনর প্লেসে। বাড়িটা এখন তাঁরই সম্পত্তি. যদিও লোকে তা জানে না। তাঁর ভৃত্য হিসাবেই ফস্টার বাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণ করে।

লিস্টার কামনর প্লেসে ঘনঘনই আসেন. কিন্তু অতি গোপনে। কাক-পক্ষীতে জানতে পারে না তাঁর যাতায়াতের কথা। কারণ আসেন তিনি গভীর রাত্রে. তাও ছদ্মবেশে। যখন নিজে আসতে না পারেন, তখন সংবাদ পাঠান ভার্নিকে দিয়ে। এমনি একটা সংবাদ নিয়ে ভার্নি যখন আসছিল সেদিন. দুর্ভাগ্যক্রমে পড়ে গেল ট্রেসিলিয়ানের সামনে।

* * *

যাই হোক, লিস্টারের সঙ্গে এমির যে কোন সম্পর্ক আছে. তা লিডকোটের কেউ জানল না, জানল যে সম্পর্কে যা থাকবার, তা আছে নরাধম ভার্নির সঙ্গে. এবং সে সম্পর্ক লোকসমাজে

উচ্চারণের যোগ্য নয়। লিডকোটের অধিবাসীরা সবাই মর্মাহত, অভাগিনী এমির দুর্মতি দেখে। ম্রিয়মাণ হয়ে সবাই দিন কাটায়।

এই সময় একদিন ট্রেসিলিয়ানের নামে একটা চিঠি এল। চিঠি লিখেছেন আর্ল অব সাসেক্স। তিনি খুব পীড়িত। এ সময়ে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদের নিকটে আহ্বান করেছেন তিনি। ট্রেসিলিয়ানও সাসেক্স-এর আত্মীয় একজন, কাজেই চিঠি তার কাছেও এসেছে।

ট্রেসিলিয়ান পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করছে—আর্লের কী অসুখ। সে তা কিছুই বলতে পারে না, কারণ চিকিৎসকেরাও ধরতে পারেন নি যে অসুখটা কী। তবে ব্যাধির লক্ষণগুলো সে বলে যেতে লাগল—আর্ল দিন দিন শীর্ণ, দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন। ক্ষুধা নেই, নিদ্রা নেই, দেহ দিন দিন পাণ্ডুর, চক্ষু দিন দিন কোটরগত।

ওয়েল্যান্ড উপস্থিত ছিল, সে শুনল ব্যাধির বিবরণ। সে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল—"চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন নি? কিন্তু আমি বুঝতে পারছি।" কানে কানে ট্রেসিলিয়ানকে বলল—"বিষ দেওয়া হয়েছে সাসেক্সকে। এ বিষ ছিল আমার ওস্তাদ সেই ডেমিট্রিয়াসের আবিষ্কার। জানি না সাসেক্সকে এ বিষ কে দিল!"

ট্রেসিলিয়ান চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ? তুমি পার নাকি এ ব্যাধির চিকিৎসা করতে?"

ওয়েল্যান্ড জোর দিয়ে বলল—"অবশ্যই পারি। ও বিষ নষ্ট করবার ওষুধও আমি ডেমেট্রিয়াসের কাছ থেকেই শিখেছি।"

ট্রেসিলিয়ান এরপর ওয়েল্যান্ডকে নিয়েই সেইজকোর্টে রওনা হল। সেইখানেই অবস্থান করছেন আর্ল অব সাসেক্স।

যাওয়ার পথে লন্ডন থেকে কিছু ওষুধপত্র কিনল ওয়েল্যান্ড। এক এক দোকান থেকে এক একটা। শেষকালে কিন্তু একটা ওষুধ আর কোন দোকানেই পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির ফলে এক বুড়ো ইহুদীর কাছে শেষ পর্যন্ত মিলল সে ওষুধ, একটা কালো রং-এর গুঁড়ো।

ওয়েল্যান্ড বলল—"এই জিনিসটা যখন পেয়েছি, তখন জোর করেই বলতে পারি—আর্ল বেঁচে উঠবেন। আমার ভয় ছিল—হয়ত এই অত্যাবশ্যক অথচ দুষ্প্রাপ্য উপকরণটা পাওয়াই যাবে না।"

সেইজকোর্টে উপস্থিত হয়েই ট্রেসিলিয়ান আর্লকে বলল ওয়েল্যান্ডের কথা। সে কী বলছে এই ব্যাধির সম্বন্ধে, তাও বলল। "বিষ দিয়েছে কেউ আপনাকে, এবং সে বিষের প্রতিষেধক নাকি সে জানে।"

অনেক ভাবতে হল আর্ল অব সাসেক্সকে। ওয়েল্যান্ডও যে শত্রু নয়, তার ঠিক কী? শত্রু তাঁর লিস্টারের আর্ল। বিষের ক্রিয়া আশানুরূপ দ্রুত হচ্ছে না দেখে হয়ত সেই লিস্টারই এই

নতুন যমদূতকে পাঠিয়ে দিয়েছে—তাড়াতাড়ি তার আত্মাটিকে দেহছাড়া করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কিন্তু এভাবে চুপচাপ বসে থাকলেও তো মরণ অনিবার্য।

নাঃ, যা হওয়ার, তা হয়ে যাক! সাসেক্স সম্মতি দিলেন—খাবেন তিনি ওয়েল্যান্ডের ওষুধ।

ওষুধ সেবনের পরই গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন আর্ল। ঘুম ভাঙল পরের দিন অনেক বেলায়। জেগে উঠেই অনেক সুস্থ বোধ করলেন নিজেকে। পরিজনেরা সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে আর্লের চেহারা থেকে আগের সেই মৃত্যুবিবর্ণতা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

আর্ল অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ট্রেসিলিয়ান এবং ওয়েল্যান্ডের কাছে। কীভাবে ট্রেসিলিয়ানকে এ-উপকারের প্রতিদান দেওয়া যায়, তাও জিজ্ঞাসা করলেন। সুযোগ পেয়ে এমি রবসার্টের শোচনীয় কাহিনী আর্লকে জানাল ট্রেসিলিয়ান। ভার্নি তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে, বাধ্য করেছে ঘৃণিত কলঙ্কিত জীবন যাপন করতে, এই অভিযোগই করল।

সাসেক্স পুলকিত হয়ে উঠলেন। আর্ল অব লিস্টারের সঙ্গে তাঁর মর্মান্তিক শত্রুতা, ভার্নি সেই লিস্টারেরই কর্মচারী। ভার্নির নামে রানীর কাছে এই অভিযোগ করা হয় যদি, তাহলে তার প্রভু হিসাবে লিস্টারের ওপরেও অনেকটা কলঙ্ক এসে পড়বে। তাতে রানীর অনুগ্রহের কতকটা হ্রাস হতে পারে বইকি!

"আমি এর ব্যবস্থা করছি"—ট্রেসিলিয়ানকে এই আশ্বাস দিয়ে সাসেক্স তক্ষুণি গোপনে এক দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন রানীর কাছে। দরখাস্ত ট্রেসিলিয়ানের নামেই গেল।

কয়েকদিন পরে গ্রীনউইচ প্রাসাদে রানীর দরবার বসেছে। কতকটা সুস্থ হয়ে আর্ল অব সাসেক্স হাজির হয়েছেন সে-দরবারে। রানীর প্রিয়পাত্র আর্ল অব লিস্টার তো সদলবলে উপস্থিত আছেনই।

অন্য পাঁচ রকম কথাকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে রানী জিজ্ঞাসা করলেন—"এডমন্ড ট্রেসিলিয়ান বলে কেউ উপস্থিত আছে কি দরবারে?"

এডমন্ড ট্রেসিলিয়ান সত্যিই আছে, আর্ল অব সাসেক্স-এর সহচরদের ভেতরে। সে এগিয়ে এসে রানীর সামনে নতজানু হয়ে বসল।

"এমি রবসার্টের কাহিনীটা তুমি গোড়া থেকে গুছিয়ে বল তো!"—রানীর আদেশ হল তার উপরে।

ট্রেসিলিয়ান বলতে শুরু করল, ওদিকে আর্ল অব লিস্টারের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। তিনি যা ভয় করছিলেন, সত্যই তাই ঘটেছে। রানী জেনে ফেলেছেন লিস্টারের গোপন বিবাহের কথা। এবারে রানীর রোষে তাঁর সর্বনাশ নিশ্চিত।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ট্রেসিলিয়ানের অভিযোগের ভেতরে তো লিস্টারের নাম একবারও উচ্চারিত হচ্ছে না! কেবল ভার্নি আর ভার্নি এবং পুনশ্চ ভার্নি। ভার্নিই অপহরণ করেছে। ভার্নিই কলঙ্কিত করেছে, ভার্নিই এ-ব্যাপারে একমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি। লিস্টার এ-রহস্য একটুও বুঝতে পারছেন না।

সব শুনে রানী অগ্নিনেত্রে তাকালেন লিস্টারের দিকে—"এই রকম নরপশুরাই আর্ল অব লিস্টারের আশেপাশে ঘোরে না কি? কোথায় সেই ভার্নি, তাকে হাজির করুন. আর্ল অব লিস্টার!"

ভার্নি নিকটেই ছিল। সে আড়াল থেকে শুনেছেও সব অভিযোগ। আর্ল অব লিস্টারের মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে হয় নি। বরং ইতিমধ্যেই আত্মপক্ষ সমর্থনের এবং প্রভুর সংকটত্রাণের উপায় সে মনে মনে স্থির করে ফেলেছে। সে দৃঢ়পদে কিন্তু বিনীতভাবে এগিয়ে এসে রানীর সামনে নতজানু হয়ে বসল।

রানীর প্রশ্ন যেন সঙ্গিনের মত তীক্ষ্ম। "তুমি অপহরণ করেছ এমি রবসার্টকে? তুমি তাকে কলঙ্কিত করেছ?"

ভার্নি অনুতপ্ত স্বরে বলল—"অন্যায় খানিকটা হয়েছে মহারানি! কিন্তু পরস্পর অনুরাগে অন্ধ হলে যুবক-যুবতীরা ভুল করে. তা আপনার অজানা নেই। তবে অপহরণ নয়. এমি স্বেচ্ছায়ই আমার সঙ্গে চলে এসেছিল। এবং কলঙ্কের কোন প্রশ্নই ওঠে না! আমি যথাশাস্ত্র তাকে বিবাহ করেছি।"

লিস্টার বজ্রনাদে হুংকার করে উঠলেন—"নরাধম!"

রানী ভুল করলেন। লিস্টারের ক্রোধের প্রকৃত কারণ তিনি বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন—অপরাধী ভৃত্য লুকিয়ে বিবাহ করেছে বলেই লিস্টার তাকে তর্জন করছেন। অথচ তা তো নয়। লিস্টারের নিজের বিবাহিতা পত্নীকে ভার্নি আপন প্রণয়িনী ও পত্নী বলে পরিচিতা করছে—এই হল লিস্টারের ক্রোধের কারণ।

রানী বললেন—"ব্যাপারটা অন্যায় হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভার্নি যখন বিবাহ করেছে মেয়েটাকে—"

ট্রেসিলিয়ান মাঝখান থেকে বলে উঠল—"না মহারানি. ওকথা মিথ্যা। আমি এমির নিজের মুখে শুনেছি ভার্নি তাকে বিবাহ করে নি—"

রানীর মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল—"তা যদি হয়, আমি এমির মুখেই শুনতে চাই প্রকৃত কথা। কেনিলওয়ার্থ দুর্গে আমি তো আগামী সপ্তাহেই যাচ্ছি. সেইখানে এমিকে যেন আমার কাছে হাজির করা হয়।"

৩

সাসেক্স-এর অনুচরদের ভেতরে ওয়েল্যান্ডও ছিল। সে এসে ট্রেসিলিয়ানকে বলল—"আমায় এক্ষণি পালাতে হবে?"

পালাতে হবে? ট্রেসিলিয়ান অবাক্ হয়ে বলল—"কেন? কিসের ভয়?"

ভয়? আমার সেই ওস্তাদ ডেমেট্রিয়াসকে আজ এখানে দেখতে পেয়েছি। ভাগ্যিস সে আমায় দেখে নি। দেখতে পেলে সে আমার জান না নিয়ে ছাড়বে না। এখন বুঝতে পেরেছি আর্ল অব সাসেক্সকে বিষ সেই দিয়েছিল। আমায় দেখতে পেলে ওস্তাদও বুঝবে যে সে বিষকে ব্যর্থ আমিই করেছি। একে আগে থাকতেই আমার ওপর তার মর্মান্তিক রাগ আছে তার ওপর আবার এই নতুন রাগ। এবার আমায় সে যেমন করেই হোক সাবাড় করবে।"

ডেমেট্রিয়াসের আতঙ্ক ওয়েল্যান্ডকে যেভাবে পেয়ে বসেছে, তাতে তাকে বুঝিয়েও এখানে রাখা যাবে না, তা, ট্রেসিলিয়ানের বুঝতে দেরি হল না। ও যাবেই। তা যাবেই যখন, কামনর প্লেসেই যাক, সেখানে এমির ওপর নজর রাখুক। ভার্নি যে এমিকে নতুন কোন্ বিপদে ফেলবে, সেই ভয়ই এখন ট্রেসিলিয়ানের প্রবল।

ওয়েল্যান্ডকে সে কামনরেই পাঠিয়ে দিল।

এদিকে ডেমেট্রিয়াসকেও ভার্নি কামনর প্লেসেই পাঠাল ল্যাম্বোর্নের সঙ্গে। ডেমেট্রিয়াস এখন অ্যালাস্কো নামে পরিচিত। ভার্নি তাকে দিয়েই বিষ খাইয়েছিল আর্ল অব সাসেক্সকে, সাসেক্স-এর পাচকের সঙ্গে যোগসাজশে। সাসেক্সই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী লিস্টারের। সাসেক্স অপসারিত হলে লিস্টারের অভ্যুদয় কেউ আর ঠেকাতে পরবে না। আর লিস্টারের যত উন্নতি হবে, তত উন্নতি হবে ভার্নিরও।

লিস্টার প্রথমে ভার্নির ওপর খুবই রেগেছিলেন—কারণ এমিকে সে নিজের পত্নী বলে প্রচার করেছে। কিন্তু ভার্নি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, রানীর ক্রোধ থেকে নিস্তার পাওয়ার। এমিকে লিস্টার নিজে বিবাহ করেছেন একথা প্রকাশ হলে লিস্টারকে এতক্ষণ নির্বাসনে যেতে হত। এমির অদৃষ্টে যা হবার, তা হোক, লিস্টারের উচিত—এখন তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সেই চেষ্টা করা, যাতে রানীকে তিনি বিবাহ করতে পারেন। রানীর যেরকম অসীম অনুগ্রহ তাঁর ওপর, তাতে তাঁর মন যুগিয়ে চলতে পারলে অচিরেই সে-আশা পূর্ণ হতে পারে।

উচ্চাশার নেশায় লিস্টার সরলা এমিকে ভুলে যেতেই মনস্থ করলেন। তাঁর নিমরাজী হওয়ার লক্ষণ দেখতে পেয়ে ভার্নি অ্যালাস্কোকে কামনর প্লেসে পাঠিয়ে দিল—বিষ দিয়ে এমিকে

চলৎশক্তিরহিত করে রাখবার জন্য, যাতে রানী কেনিলওয়ার্থে এলে তাঁকে বলতে পারা যায় যে পীড়িতা বলে এমিকে তাঁর সম্মুখে হাজির করা যায় নি।

ঘটনাচক্রে আবার ওস্তাদ ডেমিট্রিয়াস এবং শাগরেদ ওয়েল্যান্ড পরস্পরের সম্মুখীন, কামনর প্লেসে। তবে ওয়েল্যান্ডের একটু সুবিধে, ওস্তাদকে সে গস্‌লিং-এর হোটেলে আড়াল থেকে দেখেছে. ডেমেট্রিয়াস ওরফে অ্যালাস্কো দেখতে পায় নি তার ভূতপূর্ব শাগরেদকে।

কাপড়-ফিরিওয়ালার ছদ্মবেশে ওয়েল্যান্ড কামনর প্লেসে গিয়ে এমির সঙ্গে সাক্ষাৎ করল; এবং অনেকগুলি কাপড় তাকে বেচে সেই সঙ্গে একটা ওষুধ তাকে কৌশলে খাইয়ে এল। ওষুধটা বিষের প্রতিষেধক। ডেমেট্রিয়াস যখন এসেছে, তখন এমিকে সে বিষ দেবে, এ-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই, ওয়েল্যান্ডের। এমি-ভার্নির বৃত্তান্ত অন্য পাঁচজনের মত সেও তো শুনেছে গ্রীনউইচে। উপরন্তু, তাকে ভেতরের কথাও সবই বলেছে ট্রেসিলিয়ান।

সত্যি তার দু একদিন পরেই এমির খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল অ্যালাস্কো। ওয়েল্যান্ডের দেওয়া প্রতিষেধক আগে থাকতে খেয়েছিল বলে এমি গুরুতর পীড়িত হল না বটে, কিন্তু শয্যাশায়িনী হয়ে পড়ল নানারকম উপসর্গে। ওয়েল্যান্ড তাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছিল যে তাকে হয়ত তার রক্ষকেরা বিষ খাওয়াতে পারে। কাজেই, অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ওয়েল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল তার দাসীর সাহায্যে।

এমি ওয়েল্যান্ডকে বলল যে, এখানে থাকলে এরা তাকে প্রাণে মারবে, সে এখান থেকে পালাতে চায়। ওয়েল্যান্ড তাকে নিয়ে যেতে রাজী হল।

ঘোড়া ওয়েল্যান্ডের একটা ছিলই, এমির জন্য আর একটা সংগ্রহ করতে অনেক কষ্ট পেতে হল ওকে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত একটা শান্তশিষ্ট ঘোড়ার পিঠে এমিকে চড়িয়ে দিয়ে ওয়েল্যান্ড তাকে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি এখন লিডকোটেই যাবেন তো?"

"না, না, লিডকোটে নয়, আমি যাব আর্ল অব লিস্টারের কাছে।" ওয়েল্যান্ডকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তাড়াতাড়ি এই জবাব দিল এমি। স্তম্ভিত তো হওয়ারই কথা বেচারী ওয়েল্যান্ডের, কারণ, লিস্টারের সঙ্গে এমির যে কোন সম্পর্ক আছে, তা তো সে জানে না! কী করে জানবে? সে গোপন কথা তো তার প্রভু ট্রেসিলিয়ানেরও অজ্ঞাত।

যাই হোক, এমিকে পৌঁছে দেওয়ার ভার নিয়েছে বলেই তো আর তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়ে যায় নি ওয়েল্যান্ড! এমির নির্দেশ মেনে চলতে সে বাধ্য। অগত্যা সে কেনিলওয়ার্থের পথ ধরল। কারণ সে জানে যে ইতিমধ্যে আর্ল অব লিস্টার অবশ্যই কেনিলওয়ার্থে এসে গিয়েছেন। রানী আসছেন সেখানে লিস্টারের আতিথ্য গ্রহণের জন্য। কয়েকদিন আগেই তো গৃহস্বামীকে এসে উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে!

তা ছাড়া, ট্রেসিলিয়ানও অবশ্যই থাকবে কেনিলওয়ার্থে, কারণ আর্ল অব সাসেক্সও সেখানে সদলে নিমন্ত্রিত হয়েছেন, এবং ট্রেসিলিয়ানও তো সাসেক্স-এর দলের ভেতরে। কেনিলওয়ার্থে পৌঁছে এমির ভার ট্রেসিলিয়ানের ওপর ফেলে দিয়ে ওয়েল্যান্ড নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

পথে নেমেই ওয়েল্যান্ড দেখতে পেল, রাস্তায় মানুষের যেমন ভিড়, তেমনি ভিড় যান-বাহনের। সকলেরই গতি একই দিকে—কেনিলওয়ার্থের অভিমুখে। রানীর আগমন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মহোৎসব হবে সেখানে। আমোদ-প্রমোদ, অভিনয়, ক্রীড়া-কৌতুক—বান ডেকে যাবে সার্বজনীন উল্লাসের। যারা কোনরকমের কিছু খেল দেখাতে জানে তারাই চলেছে—তাই দেখিয়ে দু পয়সা রোজগারের জন্য। আর যাদের হাতে সময় ও অর্থ দুটোই আছে, তারা দল বেঁধে চলেছে—রানীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ করে আসবে কয়েকদিন।

ভিড়ের ভেতর তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব, তাতে আবার এমি খুবই অসুস্থ। ওয়েল্যান্ড পথঘাট ভালই জানে এ অঞ্চলের। বড় বড় রাজপথ এড়িয়ে সে মেঠো রাস্তা ধরে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। এইভাবে সে অতিকষ্টে এমিকে নিয়ে পৌঁছোলো কেনিলওয়ার্থে।

পৌঁছোবার পরে এমির এক কথা—"আমি আর্ল অব লিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।" দুর্গের যে কোন কর্মচারীকে সামনে দেখে, তাকেই সে ওই কথা বলে। কে তাতে কর্ণপাত করবে? আর্লের কি এখন দীনদুঃখিনী পথচারিণীদের দুঃখের কাহিনী শোনবার সময়? রানীর অভ্যর্থনার জন্য উদ্যোগ আয়োজন সর্বাঙ্গসুন্দর হল কি না, সমাগত অভিজাতবর্গ যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন পাচ্ছেন কি না, তাই দেখতেই তিনি ব্যস্ত। আর এমি রবসার্ট যে কামনর প্লেস ছেড়ে একেবারে কেনিলওয়ার্থে এসে পড়েছে, এ তো তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। তিনি তো জানেন, ভার্নি তাকে ওষুধ খাইয়ে অসুস্থ করে শয্যায় শুইয়ে রেখেছে!

ওয়েল্যান্ডই অবশেষে এমির একটা গতি করল। একজন কর্মচারীকে কিছু বকশিস দিয়ে একখানা ঘরে নিয়ে তুলল এমিকে। সেখানে এমিকে রেখে লঙ্গরখানা থেকে কিছু খাবার এনে দিল। অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে! লোকতঃ ধর্মতঃ আইনতঃ এমিই এই বিশাল দুর্গের গৃহস্বামিনী। অথচ সে-পরিচয় এখানে কেউ জানে না। চাকরদের ঘুষ দিয়ে তাকে একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই যোগাড় করতে হল। খাবার এনে খেতে হল লঙ্গরখানা থেকে।

একটুখানি সুস্থ হয়ে এমি একখানা চিঠি লিখল লিস্টারের নামে। সেই চিঠি সে ওয়েল্যান্ডের হাতে দিল—"কোনমতে আর্লের হাতে এই চিঠি পৌঁছে দাও, তাহলেই আমার সব দুঃখের অবসান হবে।" বেচারী এমির এখনও অটুট আস্থা তার স্বামীর ওপরে।

ওয়েল্যান্ড! অভাগা ওয়েল্যান্ড চিঠিখানা হারিয়ে ফেলল।

এদিকে ল্যাম্বোর্ন—পাষণ্ড ল্যাম্বোর্ন সেই ঘরে দৈবাৎ এসে উপস্থিত, যেখানে এমি

লুকিয়ে আছে। সুরামত্ত লম্পট নিভৃত কক্ষে এমিকে একাকিনী দেখে কিছু অশোভন আচরণ করবার চেষ্টা করছিল। এমির চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে একজন প্রাসাদরক্ষী এসে তাকে উদ্ধার করল। রক্ষীর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই বেধে গেল ল্যাম্‌বোর্নের। এমি পালাল সেই সুযোগে।

পালিয়ে সে যাবে কোথায়? দুর্গের কোথায় কী আছে, সে জানে না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে এক জলাশয়ের ধারে এসে পড়ল। তার তীরে একটা কৃত্রিম পাহাড়, সেই পাহাড়ে এক গুহা। শ্রান্ত ক্লান্ত এমি সেই গুহায় ঢুকে বিশ্রাম করতে লাগল।


পাষণ্ড ল্যামবোর্ন সেই ঘরে দৈবাৎ এসে উপস্থিত

ঠিক সেই সময়ে রানী এলিজাবেথও অবসর বিনোদনের জন্য সেই জলাশয়ের ধারে এসে উপস্থিত। সভাসদ্‌দের পেছনে রেখে একাই তিনি প্রবেশ করলেন সেই গুহায়।

সেখানে এমির সঙ্গে সাক্ষাৎ রানীর।

রানীকে দেখে এমি কী যে বলবে, কিছুই স্থির করতে পারে না। একে অসুস্থ শরীর, তাতে লিস্টারকে বাঁচিয়ে ভার্নির বিরুদ্ধে কীভাবে যে নালিশটা খাড়া করা যেতে পারে, এ তার মাথায় হঠাৎ যুগিয়ে উঠল না। এরকম একটা পরিস্থিতি যে আসতে পারে, লিস্টারের পরিবর্তে স্বয়ং রানীর মুখোমুখি যে তাকে পড়ে যেতে হবে সেটা তার স্বপ্নেরও অগোচর।

তাই রানীর প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু এইটুকুই বলতে লাগল যে তার নাম এমি রবসার্ট, এবং এক পাষণ্ড—নাম তার ভার্নি—তার অত্যাচারের ভয়ে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

রানী তো জানেন এমি রবসার্টের বিবরণ। তিনি এমিকে নিয়েই গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ভার্নিকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে ভার্নি এমন অবলীলাক্রমে মিথ্যার পরে মিথ্যা গল্প

দিয়ে গেল রানীকে, এবং তার উত্তরে এমি এমন সব অসংলগ্ন কথা বলতে লাগল পর পর, যে রানীর এবং উপস্থিত অন্য সকলেরও প্রতীতি হল যে মেয়েটির মাথার ঠিক নেই!

এমি তার করুণ কাহিনী গুছিয়ে বলতে পারল না শুধু এই কারণে যে লিস্টারকে সে বিপদে ফেলতে পারে না। লিস্টার তো আগেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে এমির সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে রানীর ক্রোধে তাঁর সর্বনাশ তো হবেই, প্রাণও যেতে পারে! পতিপ্রাণা এমি তাই কিছুতেই সত্য কথাটা বলতে পারল না। ফলে রানী আদেশ দিলেন যে এই পাগলীকে তার স্বামী ভার্নির হাতে সঁপে দেওয়া হোক।

ভার্নি সঙ্গে সঙ্গে এমিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কামনর প্লেসের দিকে রওনা হয়ে গেল। এমির কাতর আর্তনাদে কেউ কান দিল না। অথচ তার স্বামী লিস্টার তখন অদূরেই অবস্থান করছেন!

লিস্টার তখন ট্রেসিলিয়ানের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যস্ত। ট্রেসিলিয়ান এমির মামলা রানীর দরবারে পেশ করতে সাহস করেছে, এই তার অপরাধ। ট্রেসিলিয়ান তখনও বুঝতে পারে না যে ভার্নির নামে নালিশ করাতে লিস্টারের এই ক্রোধের কারণ কী হতে পারে।

যুদ্ধে কিন্তু ট্রেসিলিয়ানের পরাজয় হল। লিস্টারের হাতে তার প্রাণ যেতে বসেছে, এমন সময়ে পেছন থেকে ওয়েল্যান্ড এসে লিস্টারের হাত চেপে ধরল, এবং ক্রুদ্ধ লিস্টারকে সমর্পণ করল এমির চিঠি। সে চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল হতভাগ্য। আবার ফেরত পেয়েছে তার পরিচিত এক বালকের সাহায্যে।

চিঠি পড়ে লিস্টার পাথর বনে গেলেন। ভার্নি তাকে বিষ দিয়েছিল, দৈবানুগ্রহে প্রাণটা রক্ষা হওয়ায় সে কামনর প্লেসের গৃহ থেকে পালিয়ে এসেছে কেনিলওয়ার্থে স্বামীর আশ্রয় নেবার জন্য। সে আশ্রয় কি সে পাবে না?

এমির পত্রের করুণ আবেদন এইবার লিস্টারের বিবেকের দ্বারে আঘাত করল। ট্রেসিলিয়ানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন এমি এখন কোথায়। ওয়েল্যান্ডই জানাল যে ভার্নি তাকে আবার ধরে নিয়ে গিয়েছে কামনরের দিকে। রানী এমিকে পাগল মনে করে সেই আদেশই দিয়েছেন। এইবার লিস্টারের দুঃখের ভরা পূর্ণ হল। লিস্টারের মত স্বামী সম্মুখে বর্তমান থাকতেও নিরপরাধিনী বালিকা আবার পাষণ্ড ভার্নির কবলে পতিত হল। এবারে যে ভার্নি তাকে হত্যা করবে, এতে আর তাঁর সন্দেহমাত্র নেই।

দুঃখে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তিনি রানীর কাছে ছুটে গেলেন এবং অকপটে সব কথা খুলে বললেন তাঁকে। বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ রানী প্রথমেই তাঁকে বন্দী করলেন এবং তারপর ট্রেসিলিয়ানকে পাঠালেন এমিকে উদ্ধার করে আনবার জন্য। সঙ্গে সশস্ত্র সৈনিক গেলেন কয়েকজন।

লিস্টার অবশ্য মুক্তি পেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কারণ তাঁর ওপর বেশীক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে থাকা রানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু লিস্টারের ওপর ভরসা তাঁর ভেঙে গেল এই ঘটনায়। এতদিন যে উচ্চাশা লিস্টার পোষণ করছিলেন মনে মনে, তা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়ে গেল।

ওদিকে ট্রেসিলিয়ান বড় দেরিতে গিয়ে পৌঁছুলো। এমির মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই সে পেল না। এমি নাকি সিঁড়ি ভেঙে পড়ে গিয়ে মারা গেছে।

ভার্নিকে বন্দী করল ট্রেসিলিয়ান, রানীর পরওয়ানার বলে। কিন্তু সে বিষ খেয়ে রানীর বিচারকে ফাঁকি দিল।

কেনিলওয়ার্থ থেকে আসবার পথেই ভার্নি নিজের হাতে ল্যামবোর্নকে গুলি করে মেরেছিল। আর ফস্টার? রাজসৈন্যের হাতে ভার্নিকে বন্দী হতে দেখে সে এক গুপ্তগৃহে পালিয়েছিল। সেখান থেকে আর সে বেরুতে পারে নি, অনেকদিন পরে তার কঙ্কাল পাওয়া যায় সেই ঘরে।

ওস্তাদ ডেমেট্রিয়াস ওরফে অ্যালাস্কো কোথায় যে পালিয়ে গেল তা আর জানা যায় নি।

লেখক পরিচিতি

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াল্টার স্কটের জন্ম হয় এডিনবরা শহরে। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষালাভ করার পরে তিনি আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৭৯২ সালে ওই এডিনবরাতেই তিনি কর্মজীবন শুরু করেন আইনব্যবসায়ী রূপে।

শৈশবেই তাঁর পক্ষাঘাত ব্যাধি হয়েছিল একবার, রোগমুক্তির পর হাওয়া-বদলের জন্য স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণ সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিন বাস করতে হয়েছিল তাঁকে। এই সময়ে সীমান্ত পর্বতের অলিগলি গোপন ঘাঁটি এবং পার্বত্য হাইল্যাণ্ডারদের সমাজনীতি ও রণনীতি সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান তিনি অর্জন করেন। পরবর্তী কালে এইসব অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে তিনি অশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী হন।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন ও ওই বৎসরই সেলকার্কশায়ারের শেরিফডেপুটি পদ লাভ করেন। সাহিত্যজীবনের সূত্রপাতও এই সময়েই হয় স্কটের। জার্মান ভাষা থেকে দুটি গাথা-কবিতা অনুবাদ করে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর স্বদেশের কতকগুলি প্রাচীন গাথা সংকলন করে "মিনস্ট্রেলজি অব্ স্কটিশ বর্ডার" নামে কবিতা পুস্তকখানি উপহার দেন সাহিত্যরসিক সমাজকে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে "ল অব্ দা লাস্ট মিনস্ট্রেল", এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে "মার্মিযন" প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কিছু সাংবাদিককর্মও তিনি করেন—কোয়ার্টারলি রিভিউ ও এডিনবরা রিভিউ পত্রিকায়।



সার ওয়াল্টার স্কট

তারপর প্রকাশক ব্যালাণ্টাইন কোম্পানির অংশীদাররূপে দেখা দেন ওয়াল্টার স্কট। "লেডী অব দ্য লেক" ছাপা হওয়ার পরেই তিনি কাব্য-রচনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে উপন্যাস লেখায় ব্রতী হন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ওয়েভার্লি উপন্যাসলহরী নামে খ্যাত চিরস্মরণীয় গ্রন্থরাজি একের পর এক বেরুতে থাকে তাঁর ক্লান্তি-হীন লেখনী থেকে। অচিরেই তিনি তদানীন্তন ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের ভেতর শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বইগুলির ভেতর গাই ম্যানারিং, কেনিলওয়ার্থ, অ্যান্টি-কোয়ারী, ওল্ড মর্টালিটি, রব রয়, ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ, আইভ্যানহো প্রভৃতিই সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত হন।

জীবনসায়াহ্নে তিনি অর্থকষ্টে পতিত হন, ব্যালাণ্টাইনদের প্রকাশনী ব্যবসা দেউলিয়া হওয়ার দরুন। স্কটের অংশে লক্ষাধিক পাউণ্ড ঋণ দাঁড়িয়ে যায়। এই বিপুল পরিমাণ দেনা তিনি বই লিখেই পরিশোধ করেন। কঠোর পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্যান্বেষণে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দেই স্বদেশে ফিরে আসেন অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য।



ওয়ার এন্ড পীস

স্কুলে পড়ে, মাত্র আঠারো বছর বয়স। সেই ছেলেকে যেতে হল যুদ্ধে।

কাউন্ট রস্টভের অবস্থা এখন পড়তির দিকে অবশ্য। সাদাসিধে দিলদরিয়া লোক। হিসেব করে খরচ করতে জানেন না, তারই দরুন বাঁধা পড়েছে জমিদারের দু একটা মহল। কিন্তু তা বলে এমন দৈন্যদশা তাঁর ঘটে নি যে তাঁর ছেলেকে এক্ষুণি জীবিকার সন্ধানে বেরুতে হবে।

তবু গেল নিকোল রস্টভ। জীবিকার জন্য নয়, জন্মভূমির ডাকে। নেপোলিয়ন আক্রম করেছেন অস্ট্রিয়া দেশ। অস্ট্রিয়া চিরদিনই রুশদেশের মিত্ররাজ্য। রুশসম্রাট্ জার আলেকজাণ্ডার গোটা সৈন্যবাহিনীটাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করবার জন্য। নিকোলে গেল এ বাহিনীর সঙ্গেই দেশসেবার উদ্দেশ্যে।

হুসার অশ্বরোহী দলে এনসাইন পদ পেয়েছে সে। আপাততঃ রয়েছে স্যালজেনেক গ্রা এক কৃষকের বাড়িতে। সে একা নেই, তার দলের কাপ্তেন ডেনিসভও থাকে ওইখানেই। প্র সমবয়সী, দুটিতে বন্ধুত্বও হয়েছে একটুখানি।

বলতে গেলে আনন্দেই আছে ওরা। দিনের বেলা কুচকাওয়াজ, সন্ধ্যায় বাজি রেখে তাসখেলা, গভীর রাতে বিচালির খোঁজে বাড়ি বাড়ি হানা দেওয়া। মানুষের খাবারটা কোনরকমে মিলছে ওখানে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঘোড়ার রসদ নিয়ে। কিনে হোক, চুরি করে হোক, সেনানীরা যোগাড় করতে বাধ্য হচ্ছে যার যার ঘোড়ার খাবার।

এইরকম একটা নৈশ অভিযান থেকে একদিন ভোরবেলায় ফিরে এসেই নিকোলে রস্টভ শুনতে পেল—স্যালজেনেকের ডেরা তুলতে হবে এবার। ব্রোনোর ভাঙা কেল্লায় দপ্তর গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলেন কুটুজভ। তাঁকে হটে আসতে হচ্ছে সেখান থেকে। কুটুজভ রুশবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি যেমন হটে আসছেন, তাঁর বাহিনীর দল উপদল যেখানে যারা ছড়িয়ে আছে, সবাইকেই তাঁর সঙ্গী হতে হবে বইকি।

বৃদ্ধ এবং বহুদর্শী সেনাপতি এই কুটুজভ। নেপোলিয়নের রণচাতুর্যের সঙ্গে পাল্লা দেবার শক্তি তাঁর নেই, তা ভালরকমই জানেন তিনি। রীতিমত প্রস্তুত না হয়ে কোন বৃহৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তিনি চান না। সম্রাট্ আলেকজান্ডার শীঘ্রই আসছেন দ্বিতীয় একটি বাহিনী সঙ্গে নিয়ে। ততদিন তিনি সম্মুখযুদ্ধ এড়াতে চান ফরাসীদের সঙ্গে। অস্ট্রীয় সৈন্যের সহযোগিতা? ওর কোন দাম নেই কুটুজভের চোখে। মনে মনে তাঁর ধারণা—অস্ট্রীয় সেনাপতিরা বাক্যবাগীশের দল। ওরা কাগজে কলমে পরিকল্পনা করে চমৎকার, কার্যক্ষেত্রে সে-পরিকল্পনা কোন কাজেই আসে না।

কুটুজভ ভিয়েনার দিকে পিছিয়ে আসছেন। পর পর নদী পার হতে হচ্ছে ইন, ত্রোন, এন্স্। নদী পেরিয়েই তার ওপরকার পুল পুড়িয়ে দিচ্ছেন। এন্স্ পেরুবার সময় তাঁকে ফরাসী সেনার গোলাবৃষ্টির পাল্লায় পড়তে হল।

এন্স্ এখানে দানিয়ুবে মিশেছে। সংগ্রামের মুখেই একটা ছোট দ্বীপ, তারই ভেতরে ছোট দুর্গ একটা। দানিয়ুবের খাড়া পাড় ঘন সবুজ পাইন বনে ঢাকা, সেই বনের আড়াল থেকে আসছে ফরাসীদের গোলা। ওই যে একটা মঠের সাদা চূড়া চোখে পড়ে, পাইন বনের আড়ালে, ওই মঠেই হয়ত ফরাসী সেনার একটা অংশ ছাউনি করে আছে।

রুশসেনা পুল পেরুচ্ছিল বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই, পর পর দুটো গোলা তাদের মাঝে এসে পড়তেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি—ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে মানুষের—একই রকম পোশাক-পরা সব সৈনিক। মাঝে মাঝে দেখা যায় এক একজন সেনানী। তার পোশাক একটু জমকালো, তার চাউনি একটু বেশী সতেজ, চকিতে দেখা দিয়ে সে চোখের আড়ালে চলে যায়—আবার একঘেয়ে সৈন্যস্রোত।

একখানা মালবোঝাই গাড়ি আসছে গড়াতে গড়াতে। গেরস্তালির আসবাব উঁচু করে বোঝাই করা হয়েছে সে গাড়িতে। তার মাথায় বিছানা করে একটি মেয়ে বসে আছে শিশুসন্তান কোলে করে। গাড়ির পেছনে বাঁধা একটি নধর গাভী। এরা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধের ভয়ে।

গোলা পড়ছে। বেশির ভাগই নদীর জলে এসে পড়ছে এখনও। ডেনিসভ এসে পড়ল। তার ঘোড়াটার গায়ে কেমন করে বুঝি লেগে গেল এক সৈনিকের বেয়নেটের খোঁচা। ঘোড়া লাফিয়ে

পড়তে যায় নদীতে। ডেনিসভ এক হাতে রাশ টানছে, আর এক হাতে গন্ধে ভুরভুর রেশমী রুমাল, কখনও রুমাল কপালে তুলছে, কখনও গলায় ঘষছে, ঘাম মোছবার জন্য।

পেরিয়ে গেল নদী রুশেরা, এবার পুলটা পুড়িয়ে দেওয়া চাই। একদল সৈনিক পিছিয়ে আছে এজন্য। রস্টভ রয়েছে সে-দলে। গোলা পড়ছে আশেপাশে—থপ্ থপ্—খুট্ খাট্—দুড়ুম্ দুম্—

ঘোড়ার পিঠেই বসে আছে রস্টভ। কেমন যেন লাগছে তার। ভয়? হ্যাঁ, মনে মনে সে স্বীকারই করছে, ভয় ছাড়া এ আর কিছু নয়। মৃত্যুভয়! এই সুন্দর নধর দেহ ছিঁড়ে খুঁড়ে রক্তারক্তি হয়ে নিস্পন্দ মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে। এই ভয়! তা ছাড়াও একটা অন্যরকম ভয় প্রথম ভয়টাকেও দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। সে ভয় এই যে পাশের লোকেরা হয়ত তার মনের ভাবটা ধরে ফেলবে, তাকে কাপুরুষ বলে ঘৃণা করবে, ভাববে যে এই ছেলেটার উচিত হয় নি মায়ের আঁচলের আড়াল ত্যাগ করে আসা।

কিন্তু না, মিছেই ভয় বেচারীর। ও-রকম কেউ মনে করে না বাহিনীতে। ছেলেরা নতুন অবস্থায় ভয় তো পাবেই। কত ছেলে জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে গোলাবৃষ্টির মাঝখানে পড়লে। রস্টভ যে অজ্ঞান হয় নি, তারই জন্য তাকে তারিফ করছে সবাই।

পুলে আগুন ধরেছে। এইবার ওরা যেতে পারে। একজন সোল্লাসে বলে উঠল—"মাত্র দুজন মরেছে আমাদের।" আর একজন নীচু গলায় মন্তব্য করল—"দুটো প্রাণের কি দাম নেই? আমি জার হলে কদাচ যুদ্ধ করতাম না।"

কুটুজভের সামনে বিষম সমস্যা। ফরাসীসেনা তাঁকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। আগে কে জ্নাইম পেঁছুতে পারবে—তারই ওপর নির্ভর করছে জীবন-মরণ। ফরাসীরা বাঁধা রাস্তায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। কুটুজভের সামনে কোন রাস্তাই নেই। তাঁকে যদি জ্নাইম যেতে হয়, পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে। চল্লিশ হাজার শ্রান্ত, অবসন্ন, ভগ্নোৎসাহ সৈনিককে পথহীন দুর্গম অরণ্যের ভেতর দিয়ে জ্নাইম নিয়ে যাওয়া—সহজ কাজ তো নয়ই, অল্প সময়ের কাজও নয়। ততদিন ফরাসীরা চুপ করে থাকবে না। জ্নাইম তো পেঁছে যাবেই, কুটুজভের পালাবার পথ বন্ধ করে দেবে চারিদিক থেকেই।

বিপদে পড়ে সহকারী সেনাপতি প্রিন্স বাগ্রাতিওকে ডেকে পাঠালেন কুটুজভ। "আপনি চার হাজার সুস্থ, সবল সৈনিক বেছে নিন। পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে যান কোন দিকে না তাকিয়ে। যে সমান তালে চলতে পারবে না, তাকে ফেলে যান পেছনে। যেভাবে হোক, গিয়ে জ্নাইমের রাস্তায় উঠুন। ফরাসীসেনার দেখা পাবেন সহজেই। হয় আপনার আগে আগে, নয় তো পেছনেই। তারা যদি সামনে থাকে, পেছন থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালান। তারা যদি পেছনে থাকে,

ঘুরে দাঁড়িয়ে গতিরোধ করুন তাদের। তাদের যদি দুটো দিন দেরি করিয়ে দিতে পারেন, আমি বাকী সৈন্য নিয়ে ওদের জাঁইমে পোঁছে যাব।"

বাগ্রাতিও অনভিজ্ঞ নন। তিনি জানেন, এ-দায়িত্বের অর্থ কী। কুটুজভ প্রকারান্তরে তাঁকে এবং ওই চার হাজার সৈন্যকে মৃত্যুদন্ড দিচ্ছেন। এদের মরতে হবে বাকী ছত্রিশ হাজারের নিরাপত্তার জন্য।

সৈনিক অবশ্য সদাই মরতে প্রস্তুত। বাগ্রাতিও রওনা হয়ে গেলেন।

তারপরই প্রিন্স আন্দ্রি এসে পড়লেন ব্রান থেকে। ইনি গিয়েছিলেন অস্ট্রীয় সম্রাটের কাছে, কুটুজভের কাছ থেকে দৌত্য নিয়ে। অস্ট্রীয় সম্রাট্ ফ্রান্সিস ভিয়েনা রাজধানী ত্যাগ করে এখন ওই-খানেই অবস্থান কবছেন কিনা! ফরাসী আক্রমণের সামনে ভিয়েনা ত্যাগ করে আসতে হয়েছে তাঁকে।

আন্দ্রি এসেই বাগ্রাতিওর অভিযানের কথা শুনলেন। নিজের দৌত্যের ফলাফল কুটুজভকে জানিয়ে তারপরেই অনুমতি চাইলেন বাগ্রাতিওর সহচর হওয়ার জন্য। কুটুজভ আপত্তি করলেন না। আন্দ্রির পিতা প্রিন্স বলকনস্কি একসময়ে কুটুজভের ওপরওয়ালা সেনাপতি ছিলেন। বলকনস্কির পুত্রকে অদেয় তাঁর কিছু নেই। বিশেষ, তিনি জানেন এ-অভিযানে যোগদানের মানেই হচ্ছে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাওয়া। অবশ্য বেঁচে ফিরে এলে তবেই সে অভিজ্ঞতার দ্বারা কাজ পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাঁচা বা না-বাঁচার সমস্যা তো সর্বত্রই আছে যুদ্ধে নামলে!

আন্দ্রি সামান্য কিছু আহার করে নিয়েই বাগ্রাতিওর পেছনে ছুটলেন। তাঁকে ধরলেন গিয়ে হোলাব্রুনে। জাঁইমের রাস্তায়। চার হাজারের ভেতর দেড় হাজার সৈন্যকে জঙ্গলে ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছেন বাগ্রাতিও। তারা সমান তালে চলতে পারে নি। মাত্র আড়াই হাজার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈনিক নিয়ে তিনি নেপোলিয়নের সহকারী মুরাটের সম্মুখীন হলেন শোনগ্রাবেনে।

বাগ্রাতিও তাঁর পার্শ্বচরদের নিয়ে চষে বেড়াচ্ছেন সমগ্র রণস্থলটা। কখনও এ-মাথায় কখনও ও-মাথায়। একটা পাহাড়ের ওপর ব্যূহ রচনা করেছে রুশসেনা। তার পেছনে উপত্যকা, তার এক প্রান্তে নদী। উপত্যকার ওপিঠে শোনগ্রাবেনে ফরাসীদের ছাউনি। সেখান থেকে গোলা আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

পালটা গোলা চালাবার বন্দোবস্ত এপারেও আছে বইকি! কাপ্তেন টুশিন চার চারখানা কামান সাজিয়ে বসে আছে রুশবাহিনীর মাঝ-বরাবর একটা পাহাড়চূড়ায়। এমন নিরীহ চেহারা টুশিনের, দেখলে পাদরি বা স্কুলমাস্টার বলে মনে করবে যে-কেউ। চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে সে কিছুক্ষণ শোনগ্রাবেনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর গোলন্দাজ জেহারবেংকোকে ডেকে বলল—"আর দু পয়েন্ট ওপরে তাক করে ফায়ার কর। দু পয়েন্ট—"

গোলা গিয়ে পড়ল শোনগ্রাবেনে। পড়তেই থাকল। গ্রামটা জ্বলে উঠল দেখতে দেখতে।

ফরাসীসৈন্যেরা যুদ্ধ করবে কী, আগুন নেবাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাগ্রাতিও ছুটে এলেন দলবল নিয়ে—"কামান পাহারা দেওয়ার জন্য তো একদল সৈন্য এখানে রাখা উচিত। বাঁয়ের দিক থেকে একটা কোম্পানি এখানে আনার ব্যবস্থা করুন প্রিন্স আন্দ্রি—"

আন্দ্রি ছুটলেন বাঁয়ের দিকে। কিন্তু সেখানে তখন মহামারী কান্ড শুরু হয়েছে। নদীর ধার দিয়ে পিলপিল করে ফরাসীরা উঠে আসছে পাহাড় বেয়ে, রুশেরা বাধা দিচ্ছে এবং মরছে। এখান থেকে একটা কোম্পানি এখন সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, সম্ভব হলে বরং এদেরই দলবৃদ্ধি করা দরকার অন্য জায়গা থেকে সৈন্য এনে।

আন্দ্রি বাগ্রাতিওকে খবর দিতে ছুটলেন। বাঁয়ের লড়াই ক্রমে সঙ্গীন হয়ে এল। ডেনিসভের কোম্পানিও লড়ছে। ওই ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে আছে বন্দুকধারী ফরাসীরা। তাদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

ডেনিসভের কোম্পানি দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ঘোড়ায় চড়ে। আছে এনসাইন রস্টভও। ডেনিসভের কন্ঠস্বর শোনা গেল—একটা বিকৃত, অস্বাভাবিক স্বর—"ভগবান রক্ষা করুন আমাদের! কর আক্রমণ!"

ছুটল একশো ঘোড়া। আশেপাশে ঘোড়ার পিঠে পিঠে রস্টভের চেনা লোকেরাই ছুটেছে। দু একজন লুটিয়ে পড়ছে ঘোড়া সমেত। ব্যাংব্যাং শব্দ শোনা যায় বন্দুকের।

হঠাৎ—এ কেমন হল? রস্টভের ঘোড়া নড়ছে না তো! রস্টভের ধোঁকা লাগে—আহত হয়েছে নাকি? কে আহত হল? সে নিজে? না, তার ঘোড়া? পেছনের সওয়ারেরা তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে, কেমন এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে যাচ্ছে রস্টভের পানে।

দেখতে দেখতে ঘোড়াটা পড়ে গেল। বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে না ফেললে রস্টভ লাফিয়ে নেমে পড়ত ঘোড়া পড়ে যাওয়ার আগেই।

তা সে নামে নি। ঘোড়া যখন ধরাশায়ী হল, সেও হল সাথে সাথে। একখানা হাত চাপা পড়ল ঘোড়ার পেটের নীচে। টেনে আনতে আনতে মট্ করে ভেঙে গেল হাতখানা।

ফরাসীরা দৌড়ে আসছে। একশোটা রুশ সৈনিকই হত বা আহত হয়েছে। রস্টভ ভাঙা বাঁ হাতখানা ডান হাতে উঁচু করে ধরে দৌড়োলো প্রাণ বাঁচাবার জন্য। পেছন থেকে গুলি চালাচ্ছে শত্রু। আর দৌড়োতে পারে না রস্টভ। এইবার সে বসে পড়তে বাধ্য হবে। ফরাসীরা হয় তাকে গুলি করে মারবে, না হয় তো বন্দী করে নিয়ে যাবে।

সর্বরক্ষা! একটা ঝোপের ভেতর এসে ঢুকতেই রস্টভ দেখল—সেখানে একদল রুশ ওত পেতে আছে শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্য।

দিন শেষ হয়ে এল। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই হার হয়েছে রুশদের।

তবু টুশিনের কামান সমানভাবে গোলাবৃষ্টি করে চলেছে। আন্দ্রি এসে ডাকতে তখন টুশিনের হুঁশ হল যে এইবার থামতে হবে। কামানগুলি গাড়িতে তুলতে হবে—সেই কি কম কাণ্ড। আন্দ্রিকেও ঘোড়া থেকে নেমে কামান ঠেলতে হল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

ঢিকঢিক করে কামানের গাড়ি জাঁইমের পথে চলেছে। যুদ্ধে জিতেও ফরাসীরা এখন আর রুশেদের আগে জাঁইম পৌঁছতে পারছে না। যুদ্ধে তাদেরও ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়েছে। হতাবশেষ সৈন্যদের নিয়ে মুরাট আর অগ্রসর হতে সাহস পাবেন না। তিনি অপেক্ষা করবেন—মূল ফরাসীবাহিনীর জন্য, যা চালিয়ে নিয়ে আসছেন স্বয়ং নেপোলিয়ন।

টুশিনের কামান যখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বাম প্রান্তে পৌঁছোলো, এক তরুণ সৈনিক হোঁচট খেতে খেতে এসে দাঁড়ালো গাড়ির সামনে। "কাপ্তেন, আমায় ওই গাড়িতে তুলে নিতে পারেন? আমি হাঁটতে পারছি না।"

সে যুবক রস্টভ।

যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের দরুন রস্টভের পদোন্নতি হল। এনসাইন থেকে লেফ্‌টেনাণ্ট। দেশের বাড়িতে যখন সে খবর পৌঁছোলো, হাসিকান্নায় কী ঢেউ উঠতে লাগল সেখানে! কাউণ্ট রস্টভ আহ্লাদে আটখানা, কাউণ্টেস কেঁদে আকুল। বোনেরা গর্বিত. ছোটভাই পেতিয়া ঈর্ষান্বিত।



রস্টভের একখানা হাত চাপা পড়ল ঘোড়াব পেটের নী
পৃষ্ঠা—:

দাদা যুদ্ধে গেল, লেফ্‌টেনাণ্ট হল। পেতিয়া বুঝি স্কুলের বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে? সে সংকল্প করে বসে আছে—প্রথম সুযোগেই সে ভরতি হয়ে যাবে সৈন্যদলে।

২

জার আলেকজাণ্ডার এসে পড়েছেন নতুন একটা বাহিনী সঙ্গে নিয়ে। জাঁইমে কুটুজভকে ঘেরাও করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে নেপোলিয়নের। শোনগ্রাবেনের যুদ্ধে পরাজিত হয়েও বাগ্রাতিও মূল সৈন্যদলকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। কাজেই রুশ শিবিরে পরাজয়ের নৈরাশ্য বিশেষ বিস্তার লাভ করতে পারে নি। নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে সেনাপতি ও সৈনিকেরা আগামী শক্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

অস্টারলিজের কাছাকাছি এসে পড়েছে দু পক্ষই। পাহাড়ে ঘেরা খণ্ড খণ্ড উপত্যকা, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট গ্রাম, পাহাড়ের মাথায় মাথায় বিভিন্ন সৈন্যদলের ছাউনি। কুটুজভ সতর্ক, এ পরিবেশে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি ইচ্ছুক নন। কারণ পাহাড়-জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে চতুর ফরাসী নায়ক যে কী ফাঁদ পেতে রেখেছেন, তা কুটুজভের অজ্ঞাত। তিনি চান—এমন জায়গায় শত্রুকে আক্রমণ করতে, যেখানে তার গতিবিধি সাদা চোখে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, অস্টারলিজ সে রকম স্থান নয়।

তবু এইখানেই যুদ্ধ করতে হবে বোধ হয়। কারণ কুটুজভ সেনাপতি হলেও সম্রাট্ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। তিনি তরুণ, দূরদর্শিতার চেয়ে তাঁর উন্মাদনা বেশী। প্রবীণের সুযুক্তির চেয়ে নব্যদলের বাগাড়ম্বর তাঁর কাছে বেশী শ্রুতিমধুর। অস্ট্রীয় সেনাপতিরা যুদ্ধে কোন নৈপুণ্য এ-যাবৎ দেখাতে পারেন নি, কিন্তু মুখে তাঁদের খই ফুটছে অবিরত। তাঁরা আলেকজাণ্ডারকে বুঝিয়েছেন অস্টারলিজই যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে আদর্শ স্থান, এখানে অকস্মাৎ আক্রমণ করে ফরাসীদের পর্যুদস্ত করা তিন তুড়ির কাজ।

তাঁরা যুদ্ধের একটা পরিকল্পনা তৈরি করে এনেছেন। অস্ট্রীয় সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেছে সে পরিকল্পনা। অস্ট্রীয় সম্রাটের সুপারিশে রুশ সম্রাট্ও তাতে সম্মতি দিয়েছেন। সম্মতি দেওয়ার আগে রুশ সম্রাটের এটা মনে হয় নি যে তাঁরও একজন সেনাপতি আছেন এবং পরিকল্পনা রচনায় তাঁরও মতামত গ্রহণ করা উচিত ছিল।

মনে হল, সম্মতি দেওয়ার পরে। তখন মত জানতে চাওয়ার আর মানে হয় না। সম্রাট্ দুই কূল বজায় রাখবার চেষ্টা করলেন এই বলে—"অস্ট্রীয় সেনাপতি ওয়াইরাদার গিয়ে সেনাপতি কুটুজভকে পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিন। কারণ রুশ-সেনাকে পরিচালনা করবার ভার তো তাঁরই ওপরে রয়েছে।"

সুতরাং রাত দুপুরে কুটুজভের শিবিরে সেনাপতিদের সভা বসল। বাগ্রাতিও মোটে সে সভায় এলেনই না, কুটুজভের না এসে উপায় নেই, কারণ তাঁর শিবিরেই সভা। কিন্তু এসেও তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

ওয়াইরাদারের দৃঢ় ধারণা যে নেপোলিয়নের সঙ্গে মোটমাট চল্লিশ হাজারের বেশী সৈন্য

নেই। এদিকে সম্মিলিত অস্ট্রো-রুশ বাহিনীর সৈন্যবল দু লক্ষের ওপরে। উপরন্তু দেশটা হল অস্ট্রীয়দের, তারা পথঘাট সবই জানে, যা পুরোপুরি জানা নেপোলিয়নের পক্ষে কোনক্রমে সম্ভব নয়। সুতরাং এ যুদ্ধে জয়লাভ যে অবশ্যম্ভাবী, তাও কি বলে বোঝাতে হবে?

যা কিছু বলবার ওয়াইরাদারই বলে যাচ্ছেন। কুটুজভের নাক ডাকছে, হঠাৎ এক সময়ে তিনি মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বললেন—"বন্ধুগণ! চমৎকার হয়েছে পরিকল্পনা, এ অনুসারে ঠিক ঠিক কাজ যদি হয়ে যায়, তবে আমরা জিতবই। এখন ঘুমুতে যান, কয়েক ঘণ্টা পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে, যুদ্ধের আগে ঘুমের মত উপকারী আর কিছু নেই।"

*　　　　*　　　　*

প্রত্যূষেই শিবির ভঙ্গ হল। যা কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা ঘোড়ার পিঠে চাপানো হয়েছে। যা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তা আগুনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ভৃত্যোরা বোঝাই ঘোড়াগুলির তদারক করবে যুধ্যমান সৈনিকদের অনেক পেছনে থেকে। বাবুর্চি টিট বিশেষ ব্যস্ত তার বাসন-কোসন মসলাপাতি নিয়ে। কারণ জিত হোক, হার হোক, সন্ধ্যাবেলায় যারা বেঁচে ফিরবে যুদ্ধ থেকে তারা শিবিরের তাঁবু পড়বার আগেই চাইবে খাবার। বরং দু-চারটা কামান হারিয়ে গেলেও চলে, কিন্তু টিটের বাসন-কোসন হারালে চলে না।

টিট তার জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত, অন্য ভৃত্যোরা চেঁচিয়ে বলছে—"টিট, স্তুপে মোলোযে টিট"—অর্থাৎ, "টিট, কসে চাবুক মারো।" কাকে চাবুক মারা হবে, কেন মারা হবে, তা তারা কেউ বলছে না। "টিট" শব্দটার অর্থ চাবুক, তারই সুযোগ নিয়ে ওরা এই চাবুক মারার উপদেশটা ঘন ঘন আউড়ে থাকে—যখনই দৈনন্দিন জীবনে কোন সংগীন মুহূর্তের আবির্ভাব হয়।

সকাল হয়েছে, যদিও সূর্য ওঠে নি। কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারিধার। দশ ফুট দূরে কোন কিছু নজরে আসে না। সৈন্যদল মার্চ শুরু করেছে।

কোন্ দলটাকে কোন্ পথে কতক্ষণ মার্চ করে কোথায় পৌঁছুতে হবে, ওয়াইরাদারের পরিকল্পনায় নিখুঁত ভাবে তার হিসাব রয়েছে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল—কোন কাজটাই ঠিক হিসাবমত এগুচ্ছে না। রস্টভের কোম্পানি ঘণ্টাখানেক মার্চ করার পরই দেখতে পেল, একদল অস্ট্রীয় সেনা বাঁয়ের দিক থেকে ডাইনে চলে যাচ্ছে—ঠিক তাদের সামনে দিয়ে। সেই দীর্ঘ সৈন্য-শ্রেণী যতক্ষণ এগুতে থাকল, রস্টভেরা রইল নিশ্চল দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনার মুণ্ডপাত করতে থাকল সবাই।

ওয়াইরাদারের গোড়াতেই গলদ—তিনি ধরে নিয়েছিলেন আগের দিন শত্রুসেনা যেখানে যেখানে অবস্থান করছিল, পরের দিনও সেই সেই স্থানেই থেকে যাবে। এই ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের সময়তালিকা রচিত। বলা বাহুল্য, কার্যক্ষেত্রে নেমে রুশ এবং অস্ট্রীয় সেনাপতিরা দেখতে পেলেন—শত্রুকে যতদূর মনে করা গিয়েছিল, ততদূরে তারা আর নেই।

রাত্রির অন্তরালে তারা এসে এমন সব জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছে, যা অতিক্রম করে বহুদূর পশ্চাতে ফেলে যাওয়ার কথা ছিল মিলিত অস্ট্রীয় রুশদের।

দেখতে দেখতে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল। আচমকা গুলিগোলা এসে পড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে। পদাতিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। পালটা গুলিবর্ষণ অসম্ভব, কারণ এদের গোলন্দাজেরা অন্যপথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

স্বয়ং কুটুজভ রয়েছেন তৃতীয় রুশবাহিনীর সঙ্গে। হঠাৎ সেই বাহিনীর ভেতরই বড় বড় গোলা পড়তে লাগল। কুটুজভ আহত হলেন হাঁটুতে। পা ধরে তিনি বসে পড়লেন, আর তাঁর চারধার থেকে ভীত ত্রস্ত রুশ সৈনিকেরা যে যেদিকে পারল, ছুটে পালাতে লাগল।

প্রিন্স আন্দ্রি ছিলেন কুটুজভের পাশেই। তিনি এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। ভূলুণ্ঠিত পতাকা কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি একাই ছুটে চললেন। শত্রুর কামান তিনি দেখতে পেয়েছেন। বজ্রনাদে হুংকার করে উঠলেন—"চলে এসো বীর রুশ সৈনিকেরা, ওই কামান আমরা কেড়ে নেব।"

কে এল, কে এল না—দেখবার জন্য আন্দ্রি পেছন পানে একবারও তাকালেন না। একাই ছুটলেন পতাকা কাঁধে নিয়ে। অবশ্য একা তাঁকে বেশীক্ষণ ছুটতে হল না। একটি, দুটি করে কিছুসংখ্যক রুশসৈন্য তাঁর সঙ্গ নিল। কিন্তু সঙ্গ নিল শুধু মরবারই জন্য। পায়ে পায়ে মরতে লাগল রুশেরা। আন্দ্রি নিজেও আহত হয়ে পড়ে গেলেন। জাতীয় পতাকা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রইল তাঁর দেহে।

বাগ্রাতিওর কাছ থেকে একটা জরুরী বার্তা নিয়ে রস্টভ ছুটেছে কুটুজভের উদ্দেশে। হয় কুটুজভ, নয় সম্রাট। যাঁকে আগে দেখতে পাবে, তাঁকেই জানাবে খবরটা আদেশ নিয়ে আবার ফিরবে বাগ্রাতিওর কাছে।

তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে রস্টভ। আশেপাশে মরণখেলা চলছে উদ্দাম তান্ডবে। এক একবার ইচ্ছা হচ্ছে রস্টভের, সেও ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মেতে যায় ওই খেলায়। কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধি সংযত করছে তাকে। তার ওপর অন্য কাজের ভার রয়েছে এই মুহূর্তে। নিজের খেয়ালখুশী মত চলবার স্বাধীনতা তার নেই। সে আড়ালে আড়ালে চলে যায় যুদ্ধক্ষেত্র এড়িয়ে।

একদল অস্ট্রীয় অশ্বারোহী ছুটে আসছে বাঁদিক থেকে। তারা এসে পড়লে আর রস্টভ এগুতে পারবে না। দেরি হয়ে যাবে তার। সে মরিয়া হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ওরাও এসে পড়ল। সর্বপ্রথম অস্ট্রীয় সৈনিকটি আকারে একটি দৈত্যবিশেষ। সে এসে ঘাড়ে পড়ে আর কি! থামাতেই হবে তাকে। তা নইলে রস্টভ এখুনি ধাক্কা খেয়ে উলটে পড়ে যাবে দৈত্যটার ঘোড়ার নীচে।

রস্টভ মরিয়া। হাতের চাবুক দিয়ে সাঁই করে আঘাত করল অস্ট্রীয়টার ঘোড়ার মুখে। আচমকা সেই আঘাতে ঘোড়াটা শিষ-পা তুলে খাড়া হয়ে উঠল, আর তার গা ঘেঁষে বুলেটের মত

সাঁ করে বেরিয়ে গেল রস্টভের ঘোড়া। পেছনে হইহই করে উঠল অস্ট্রীয়রা, কিন্তু রস্টভ আর ফিরেও তাকাল না।

এক জায়গায় তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। রস্টভ পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেল। এদিক থেকে এগিয়ে গেল এক রুশ সেনানী, অন্য দিক থেকে এগিয়ে এল এক অস্ট্রীয়। ধিক্! বন্ধুতে বন্ধুতে লড়াই বেধে গিয়েছে ভুলক্রমে। বিশৃঙ্খলার চরম!

যেতে যেতেই একটা জনরব কানে আসে রস্টভের। কুটুজভ নাকি আহত হয়েছেন। কোথায় তিনি, তা নিয়েও বিবিধ জল্পনা। সম্রাট্ কোথায়? তাও বলতে পারে না কেউ। এদিকে বেলা দুপুর পার হয়ে গেল। এরপর সম্রাট্ বা সেনাপতি—যাঁর সঙ্গেই দেখা হোক, সে দেখায় ফল হবে না কিছু। বাগ্রাতিও খবর পাঠিয়েছেন একটা, নির্দেশ চেয়েছেন—কী করা উচিত। কিন্তু এখন নির্দেশ পেলেও সে নির্দেশ নিয়ে বাগ্রাতিওর কাছে পৌঁছে দেওয়া—ইস্, সন্ধ্যা হয়ে যাবে ততক্ষণ। এতখানি মেহনত কোন কাজে আসবে না।

কুটুজভের দেখা কোনমতেই পেল না রস্টভ, তাঁর খোঁজই দিতে পারল না কেউ। শেষ পর্যন্ত সম্রাটের দেখা পেল—অস্টারলিজ এলাকার বাইরে একটা ফলের বাগানে। যুদ্ধ যে পরাজয় ঘটেছে, তা উপলব্ধি করার পরে সম্রাটের অন্তরঙ্গ সহচরেরা তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে রস্টভ তাঁকে দেখল, বাগ্রাতিওর বার্তা আর তাঁকে দেওয়ার কোন যুক্তি সে দেখতে পেল না। এখন সে বার্তারও কোন মূল্য নেই, তার ওপর নির্দেশ প্রার্থনারও কোন মানে হয় না।

রস্টভ শুধু দূরে দাঁড়িয়ে সম্রাটের বিষণ্ণ মুখখানি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বিষণ্ণ হলেও কী সুন্দর! দেখে দেখে রাজভক্তির প্রবল আবেগে অন্তর আপ্লুত হয়ে গেল রস্টভের। এই মহিমান্বিত সম্রাটের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারলেও কৃতার্থ রস্টভ।

* * *

অস্টারলিজের পরাজয়ের পর সন্ধি স্থাপিত হল। রুশবাহিনী ধীরে ধীরে প্রস্থান করল অস্ট্রিয়া থেকে। আলেকজান্ডারের সঙ্গে নেপোলিয়নের সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হল। মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রুশ ও ফরাসীবাহিনী একযোগে জার্মানি আক্রমণ করল। রাজনীতির পাশা এই ভাবেই ওলটায়! সুযোগসন্ধানীরা নীতির বালাই মানে না। যখন যেদিকে সুবিধা নির্লজ্জভাবে ঢলে পড়ে।

রস্টভ ফিরেছে মস্কোতে। তার সঙ্গে এসেছে ডেনিসভ, তার কাপ্তেন। আর এসেছে ডলোহভ, সহযোদ্ধা একজন। ডেনিসভ রস্টভদের অতিথি, ডলোহভ কাউন্ট বেজুহভের।

এই সূত্রে বেজুহভদের সাথে আলাপ-পরিচয় ঘটল রস্টভের।

কাউণ্ট পিয়র বেজ্‌হভ রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। একমাত্র মস্কো শহরেই তাঁর দু দুটো প্রকাণ্ড প্রাসাদ। রুশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে বিস্তীর্ণ জমিদারি। কিন্তু এত ধনদৌলতের অধিকারী হয়েও পিয়র বেজ্‌হভ নিরাসক্ত ও অসুখী।

এই ধনদৌলত যে একদিন তাঁর অধিকারে আসবে, পিয়র তা কিছুদিন আগেও ধারণা করতে পারেন নি। বাল্যে, কৈশোরে, এমন কি প্রথম যৌবনেও তিনি জানতেন যে তিনি কপর্দক-শূন্য এবং পরানুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। বৃদ্ধ কাউণ্ট বেজ্‌হভ তাঁকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন, তাই গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব তাঁর হয় নি কোন দিন; কিন্তু প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন—এমন কথা স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারেন নি পিয়র!

সেই দৈন্যের দিনে নানা রকমের লোকের সঙ্গে পিয়রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। নিজে অসৎ না হয়েও অনেক অসৎ লোককে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাদেরই একজন ছিল ওই ডলোহভ। তার নীতিজ্ঞানের কোন বালাই ছিল না।

হঠাৎ বৃদ্ধ কাউণ্ট বেজ্‌হভ মারা গেলেন পিয়রকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। ডলোহভ তখন যুদ্ধ করছে অস্ট্রিয়ায়। পিয়র যুদ্ধে যেতে পারেন নি, তাঁর অস্ত্রশিক্ষা আদৌ ছিল না বলে। জীবনে তিনি কখনও পিস্তল বন্দুক বা তরোয়াল হাতে করেন নি।

বিগত দিনের বন্ধু পিয়র আজ কোটি কোটি রুবলের মালিক, এ-অবস্থায় ডলোহভ কি পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে অবহেলা করে কখনও? যুদ্ধ থেকে ফিরে সে সোজা গিয়ে পিয়রের বাড়িতে উঠল। যদিও মস্কো শহরেই তার নিজের একটা বাসস্থান আছে, এবং সে-বাস-স্থানে তার মাতাই বাস করেন।

পিয়র দিলদরিয়া মানুষ। ডলোহভকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ডলোহভ সেই সুযোগে পরিচিত হল পিয়রের স্ত্রী এলেনের সঙ্গে।

কিছুদিনের মধ্যেই সমাজে একটা গুজব উঠল ডলোহভের সঙ্গে এলেনের নাম জড়িত করে। পিয়র দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন ডলোহভকে। সম্মানে আঘাত করলে দ্বন্দ্বযুদ্ধই সেযুগে প্রতিকারের একমাত্র উপায় বলে গণ্য হত।

ডেনিসভ ও রস্টভকে পিয়রের সাথে পরিচিত করে দিয়েছিল ডলোহভই। পিয়রের চরিত্রমাধুর্যে ওরা মুগ্ধ। তারা পিয়রের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল, কারণ ডলোহভ সুদক্ষ যোদ্ধা, পিস্তলে তরোয়ালে তার হাত সমান চলে। পক্ষা-ন্তরে, পিয়র তো কোনদিন হাতেই করেন নি কোন অস্ত্র। এ-অবস্থায় পিয়র তো মরবেনই।

কিন্তু কার্যকালে ঘটল বিপরীত রকম। পিয়রের গুলিতে আহত হল ডলোহভ, অথচ ডলো-হভের গুলি স্পর্শই করল না পিয়রকে।

ডলোহভকে স্থানান্তরিত করা হল তার মায়ের বাড়িতে। সহযোদ্ধা হিসবে রস্টভ তাকে মাঝে

মাঝে দেখতে যায়। সামান্য পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ডলোহভের জালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে অনভিজ্ঞ রস্টভ।

সুস্থ হয়ে উঠেই ডলোহভ রস্টভকে নিয়ে জুয়াখেলায় বসতে লাগল। বাজি রেখে তাসের খেলা। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই সে রস্টভকে জিতিয়ে দেয়, যাতে নেশা তার জমে ওঠে ধীরে ধীরে।

কয়েক মাস এইভাবে জুয়াখেলা চলবার পর একদিন ডলোহভ হিসাব করে দেখিয়ে দিল— জুয়ায় রস্টভ তার কাছে তেতাল্লিশ হাজার রুবল হেরেছে। এ অর্থটা এখন রস্টভ দিতে বাধ্য।

রস্টভ তো অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মত। এত অর্থ সে কোথায় পাবে? অথচ পেতেই হবে। আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সামাজিক কড়াকড়ি এ বিষয়ে খুব। দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান এলেই যুদ্ধ করতে হবে। জুয়ায় হারলে সে দেনা শোধ করতেই হবে। এ দুটি কাজে পশ্চাৎপদ হওয়া কোন ভদ্রসন্তানেরই পক্ষে চলে না। হলে সে অপাংক্তেয় হবে সমাজে। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না কেউ।

নিকোলে রস্টভ নিজে তো কপর্দকশূন্য। কয়েক মাস যুদ্ধ করে সে উপার্জন করে এসেছে শুধু কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন। ঋণ শোধ করবার জন্য তাকে পিতার শরণাপন্ন হতেই হবে। অপরিমিত ব্যয়ে বৃদ্ধ কাউন্ট রস্টভ তো জমিদারিটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধক দিয়েই রেখেছেন। তবু পুত্রকন্যাদের বা স্ত্রীর প্রয়োজনে দু এক শো রুবল তিনি যেমন করে হোক যোগাড় করে দিতে সর্বদাই রাজী। কিন্তু তেতাল্লিশ হাজার রুবল। অর্থের পরিমাণ শুনে তিনি হাঁ করে ফেললেন। কিন্তু আদরের পুত্রকে একটি তিরস্কারের কথা বললেন না। বললেন শুধু—"কী আর করা যাবে! দেব! তবে একটু সময় লাগবে বাবা, সময় লাগবে! কী আর করা যাবে! সবাইয়ের জীবনেই এমনধারা ব্যাপার কখনও-না-কখনও ঘটে থাকে—কী আর করা যাবে!"

নিকোলে চোখের জল সামলাতে পারল না। নিজের বোকামিতে সে তার সংসারটাকে পথের ভিখারী সাজিয়ে ছাড়ল। রস্টভের জমিদারি এইবারে যাবে। রক্ষার কোন উপায় নেই। হায়! এর চেয়ে শোনগ্রাবেনে বা অস্টারলিজে তার মৃত্যু হল না কেন!

শহর থেকে দূরে ব্লীক হিলে প্রিন্স বলকনস্কির বিরাট প্রাসাদ। আন্দ্রির পিতা বলকনস্কি, রুশদেশের ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি। আন্দ্রি যুদ্ধে গিয়েছিলেন, যাওয়ার সময় আসন্নপ্রসবা পত্নীকে রেখে গিয়েছিলেন পিতার আশ্রয়ে। যুদ্ধ থেকে সবাই ফিরল, ফিরলেন না আন্দ্রি শুধু। তাঁর কি মৃত্যু হয়েছে? তিনি কি বন্দী হয়েছেন? কোন খবরই পাওয়া যায় নি।

এইটুকু শুধু লোকমুখে শোনা গিয়েছে যে অস্টারলিজের যুদ্ধের পরে স্বয়ং সম্রাট্ নেপোলিয়ন তাঁকে আহত অবস্থায় দেখতে পান রণক্ষেত্রে। মৃত্যুমুখেও জাতীয় পতাকাটিকে আঁকড়ে রয়েছে লোকটা, এ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান সম্রাট্, এবং আন্দ্রিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আদেশ দেন। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে আন্দ্রিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু

কোথাকার হাসপাতালে, সে হাসপাতালে গিয়ে তিনি আরোগ্যলাভ করলেন, না মৃত্যুমুখে পতিত হলেন—শত চেষ্টাতেও বৃদ্ধ বলকনস্কি সে সংবাদটুকু সংগ্রহ করতে পারলেন না।

সে এক তুষারঝঞ্ঝার রাত্রি। বলকনস্কি প্রাসাদে কারও চোখে নিদ্রা নেই। বৃদ্ধ প্রিন্স একবার ঘর, একবার বাহির করছেন। তাঁর কন্যা প্রিন্সেস মেরায়া ছোট প্রিন্সেস-এর কক্ষে বসে আছেন অতন্দ্র প্রহরায়। আন্দ্রির পত্নীকে সবাই ছোট প্রিন্সেসই বলে। আজ রাত্রে প্রসব হওয়ার সম্ভাবনা। মস্কো থেকে ডাক্তার আনতে লোক গিয়েছে। রাজপথে গিয়ে অবস্থান করছে ব্লীব হিলের নিজস্ব স্লেজগাড়ি। ডাক্তার এলেই তাঁকে দ্রুত নিয়ে আসবে।

কিন্তু ডাক্তার আসবার তর বুঝি আর সয় না। ছোট প্রিন্সেস যাতনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। হয়ত ডাক্তার আসার আগেই তাঁর শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে যাবে। কী কাল রাত্রি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন ব্লীক হিলের প্রাসাদকে সারা বিশ্ব থেকে আলাদা করে রেখেছে, তিলে তিলে নির্মম পেষণে তার জীবনীশক্তিটুকু নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য।

অবশেষে স্লেজ ফিরল। ডাক্তার এসেছেন, ডাক্তারের সঙ্গে আর একজনও এসেছেন, তিনি প্রিন্স আন্দ্রি।

ছোট প্রিন্সেস স্বামীকে দেখে চিনলেন কিনা, বলা যায় না। একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে তিনি চিরতরে চক্ষু বুজলেন। আন্দ্রির এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নেই।

হাসপাতাল থেকে আন্দ্রি যখন ছাড়া পেয়েছিলেন, তখন তাঁর ক্ষত নিরাময় হয়েছে বটে, কিন্তু চলে ফিরে বেড়াবার শক্তি তাঁর আসে নি। রুশসেনা তখন অস্ট্রিয়া ত্যাগ করেছে, তিনি কোন রকমে আশ্রয় পান এক কৃষক পরিবারে। বিদেশী গৃহস্থ তাঁকে সযত্নে লালন করে কথঞ্চিৎ সুস্থ করে তোলেন। তারপর সম্বলহীন অবস্থায় ধীরে ধীরে দূরপথ অতিক্রম করে এতদিনে আন্দ্রি ঘরে ফিরলেন।

অস্ট্রীয়-যুদ্ধে যোগদান করে আন্দ্রি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন প্রচুর। সমর-বিভাগের প্রচুর অব্যবস্থা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেই সব লিপিবদ্ধ করে তিনি এক গ্রন্থ রচনা করবেন, সংকল্প করলেন। এবং সেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দাখিল করবেন জারের কাছে, যাতে স্বয়ং সম্রাট দোষত্রুটিগুলোর প্রতি অবহিত হতে পারেন।

আন্দ্রির দিন কাটতে লাগল বলকনস্কি প্রাসাদে। শিশুপুত্রটি তাঁর চোখের মণি। মেরায়া এবং আন্দ্রি পালা করে তার দোলনার পাশে অবস্থান করেন রাত্রি দিন। ভৃত্য বা ধাত্রীর ওপর তারা আস্থা রাখতে পাচ্ছে না।

নিকোলের ভগিনী নাটাশা অপরূপ সুন্দরী। কাউন্ট রস্টভ দরিদ্র হয়ে গিয়েছেন বলে তার শুশ্রূষার ভার দেন নি তাঁরা।

পিয়র আন্দ্রির পূর্বপরিচিত। বন্ধুই বলা চলে। মস্কোতে বেজুহভ প্রাসাদে যাতায়াত

করতে করতে নিকোলে রস্টভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন আন্দ্রি। যুদ্ধের সময়ই আলাপ হয়েছিল দুজনে, সেইটিই ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ এল এবার।

নিকোলের ভগিনী নাটাশা অপরূপে সুন্দরী। কাউণ্ট রস্টভ দরিদ্র হয়ে গিয়েছেন বলে উপযুক্ত ঘরে নাটাশার বিবাহ হচ্ছে না। আন্দ্রি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করলেন। নাটাশারও আপত্তি নেই।

কিন্তু হলে কি হবে, বৃদ্ধ প্রিন্স বলকনস্কির আভিজাত্যগর্ব অতি উগ্র। কাউণ্ট রস্টভ প্রিন্স নন, ডিউক নন, মার্শাল নন, সাধারণ কাউণ্ট মাত্র। তাতে আবার দরিদ্র। বেজুহভের কাউণ্টের মত দারুণ রকম ধনী হলেও বা কথা ছিল। যে কাউণ্টের জমিদারি বিক্রি হয়ে গিয়েছে, তার কন্যাকে তিনি পুত্রবধূ করতে পারেন না। তিনি কৌশল করলেন একটা। আন্দ্রিকে বললেন—"তুমি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে কিছুদিন বাস কর, তাতে তোমার হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবে। ফিরে এলে তখন বিবাহের কথা চিন্তা করা যাবে।"

আন্দ্রিকে যেতে হল।

৩

আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এবার ফরাসীর সঙ্গে রুশের। নেপোলিয়নের সঙ্গে খানিকটা সম্প্রীতির সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল আলেকজাণ্ডারের। কিন্তু নেপোলিয়নের অহমিকা তখন আকাশ স্পর্শ করেছে। প্রীতির চোখে দেখলেও আলেকজাণ্ডারকে সমকক্ষের মর্যাদা দিতে তিনি অনিচ্ছুক। তাঁর অভিপ্রায় এই রকম যে ইওরোপের অন্য রাজাদের মত রুশ-সম্রাট্ও তাঁর তাঁবেদার হয়ে থাকবেন, তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে উঠবেন বসবেন। কিন্তু অর্ধ-ইওরোপ অর্ধ-এশিয়ার অধীশ্বর রুশ-সম্রাট্ এমন হীনতা স্বীকার করবেন কেন?

বিবাদ বাধল এই থেকেই। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলতে চলতে হঠাৎ একদিন নীমেন নদী পার হয়ে ফরাসীসেনা রুশ সীমান্ত লংঘন করল।

সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের কাছে দূত পাঠালেন পত্র দিয়ে। দূত নিজেও একজন সেনাপতি। কিন্তু ফরাসী শিবিরে তিনি ব্যবহার পেলেন অতি তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক। আলেকজাণ্ডার দাবি করেছিলেন যে নীমেন নদীর ওপারে প্রস্থান করুক ফরাসীসেনা, নেপোলিয়ন সে দাবিতে কর্ণপাতই করলেন না।

অগত্যা আলেকজাণ্ডার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। বৃদ্ধ কুটুজভকেই আবার সৈনাপত্যে বরণ করতে হল, যদিও তাঁর যুদ্ধরীতি সম্রাটের মনঃপূত নয়।

সম্রাট্ বুঝতে পেরেছেন যে এ যুদ্ধে হবে জীবনমরণের যুদ্ধ। তিনি সেই অনুসারে প্রস্তুত হতে লাগলেন। সামরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হল। অস্ট্রীয় যুদ্ধে আঠারো বছরের নিকোলে রস্টভকে রণক্ষেত্রে ছুটতে হয়েছিল, এবারকার যুদ্ধে যাবার জন্য ষোলো বছরের পেতিয়াকেও তৈরী হতে হল। পেতিয়ার সাধ পূর্ণ হল এবার।

রস্টভ, ডোনিসভ সবাইকেই যেতে হল যুদ্ধে। ওদিকে প্রিন্স আন্দ্রি ছিলেন সুইজারল্যান্ডে স্বাস্থ্যের প্রশ্ন শিকায় তুলে রেখে তিনিও এসে যোগ দিলেন কুটুজভের সঙ্গে। কুটুজভ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

নেপোলিয়ন অগ্রসর হচ্ছেন। কুটুজভ পিছিয়ে যাচ্ছেন। জার বলে পাঠাচ্ছেন—"যুদ্ধ কর।" কুটুজভ জবাব পাঠাচ্ছেন—"যুদ্ধ আমি করব না।"

যুদ্ধ করবেন না, এ কেমন সেনাপতি? কুটুজভ বুঝিয়ে দিলেন—সম্মুখ যুদ্ধে ফরাসী সেনাকে পরাস্ত করতে পারে, এমন সৈন্যদল কোন দেশেই নেই, রুশদেশেও না। মুখোমুখি সংগ্রামে যদি রুশবাহিনী ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় একেবারে, তখন নেপোলিয়নকে ঠেকিয়ে রাখবে কে? তার চেয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ। নেপোলিয়ন রুশদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে, করুক। কতদূর প্রবেশ করবে? রুশদেশ ক্ষুদ্র দেশ নয়। দু-হাজার মাইল ঢুকে পড়ে যদি, তাতেও মারাত্মক ক্ষতি হবে না রাশিয়ার। যদি তার সৈন্যবাহিনী অটুট থাকে।

রাশিয়ার মারাত্মক ক্ষতি হবে না, কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হবে ফরাসীসেনার। তারা খাবে কী? রুশসেনা পিছিয়ে যাবার সময় এক কণা খাদ্য পথে কোথাও রেখে যাবে না। যা পারবে, নিয়ে যাবে যা নিয়ে যেতে পারবে না, তা নষ্ট করে যাবে। পোড়ামাটির নীতি অবলম্বন করবে তারা। ফরাসী দেশ থেকে রুশ সীমান্ত দেড় হাজার মাইল। তারপর রুশদেশের অভ্যন্তরে আর দেড় হাজার মাইল যদি ঢুকে পড়ে ফরাসীরা, স্বদেশ থেকে তাদের দূরত্ব দাঁড়াবে তিন হাজার মাইল। এতদূর থেকে রসদ আনানো মোটেই সহজসাধ্য হবে না!

রুশ সীমান্তে পোলান্ড বা জার্মানি আপাততঃ নেপোলিয়নের বশীভূত বটে, কিন্তু স্বেচ্ছায় তারা কেউ রসদ যোগাবে না তাকে। কারণ তারা বশীভূত রয়েছে ভয়ে, ভালোবাসায় নয়। নেপোলিয়নকে সংকটের মুখে পতিত দেখলে তারা তাঁকে সাহায্য করতে আসবে বলে মনে হয় না।

অতএব যুদ্ধ না করে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছেন কুটুজভ। নেপোলিয়ন পছন্দ করছেন না এটা। তাঁর একান্ত ইচ্ছা যুদ্ধ হোক। যুদ্ধে রুশসেনাকে পর্যুদস্ত করে তারপর তিনি মস্কোর দিকে এগুতে চান। তা নইলে, এভাবে অপ্রতিরোধের মুখে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকা নিরাপদ নয়। কিন্তু কুটুজভকে যুদ্ধ করতে তিনি বাধ্য করবেন কেমন করে?

নেপোলিয়ন বাধ্য করতে পারেন না, কিন্তু আলেকজান্ডার বাধ্য করলেন। কুটুজভের ওপর কড়া আদেশ এল জারের—যুদ্ধ কর। পশ্চাৎপদ হতে হতে তুমি যে মস্কোর কাছাকাছি এসে পড়লে!

কুটুজভের মনোগত ইচ্ছা, মস্কো যায়, যাক, যুদ্ধ তিনি করবেন না। তিনি এখন বোরোদিনোতে, মস্কো এখান থেকে সামান্য দূর। আর একটু পিছিয়ে গেলেই মস্কো। তারপর মস্কো থেকেও তিনি পিছু হটবেন। মস্কোতেও যাতে এক দানা খাবার না পান নেপোলিয়ন, তা তিনি করে যাবেন। মস্কোর পর সেন্টপিটার্সবার্গ আরও হাজার মাইল। যাক না নেপোলিয়ন কত দূর

যাবে। এদিকে এসে পড়বে শীত, রাশিয়ার দুর্জয় শীত। সেই হাজার মাইল উষর প্রান্তর বরফে ঢাকা পড়ে যাবে যখন, তখন তার ভেতর দিয়ে ফরাসীসেনা পারে তো অগ্রসর হোক না!

না, তারা পারবে না। অনাহারে, শীতে আড়ষ্ট হয়ে দলে দলে মারা পড়বে তারা। পালাবার চেষ্টা করবে তখন, পালানোও সম্ভব হবে না। সামনেও বরফ, পেছনেও বরফ, ফাঁদে পড়বে তারা।

মৃত্যুফাঁদ! এগিয়ে গেলেও মরণ, পিছিয়ে এলেও তাই!

কিন্তু জার এ-যুক্তি মানতে চান না। মস্কো মহানগরীকে শত্রুর হাতে সঁপে দেওয়া তাঁর মনঃপূত নয়। দেশে-বিদেশে কলঙ্ক রটবে, দেশবাসীর ভেঙে পড়বে মনোবল। হতেই পারে না। তিনি কড়া হুকুম জারি করলেন—যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধে যদি পরাজয় ঘটে তাতে তত লজ্জা নেই। কিন্তু বিনাযুদ্ধে রাজধানী ত্যাগ করে যাওয়া—এ কোনমতেই হতে পারে না। সে-লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না।

অগত্যা কুটুজভকে যুদ্ধ করতে হল বোরোদিনোতে। মস্কোর অগ্রবর্তী ঘাঁটি বলা যেতে পারে এই স্থানটাকে। যুদ্ধ শুরু হল—খানিকটা পাহাড়ের মাথায় খানিকটা পাহাড়ের নীচে।

রস্টভ এখন কাপ্তেন। একদল সৈনিকের নায়ক হয়ে সে পাহাড়ের মাথা পাহারা দিচ্ছে। কাউকে আক্রমণ করবার আদেশ নেই তার ওপরে। আক্রমণের আদেশ কুটুজভ কম সেনানীকেই দিয়েছেন। সম্রাটের আদেশে যুদ্ধ একটা করতেই হচ্ছে তাঁকে, কিন্তু সে-যুদ্ধকে ব্যাপক হতে দেওয়া তাঁর ইচ্ছে নয়। সেইজন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হবার আদেশ তিনি খুব কম সেনাপতিকেই দিয়েছেন। ক্ষয়ক্ষতি যেন কম হয়, সেইটিই তাঁর ইচ্ছে।

রস্টভ পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখছে। ঠিক তার পায়ের নীচে উপত্যকায় একদল রুশসেনা শত্রুবেষ্টনীর ভেতর পড়ে গিয়েছে। তাদের একটি প্রাণীও বাঁচবে এমন আশা নেই। রস্টভের রক্ত যেন শিরার ভেতর টগবগ করে ফুটতে লাগল। এমন দৃশ্য চোখের ওপর দেখেও সে নীরব দর্শকের মত উদাসীন হয়ে থাকবে? কুটুজভের কাছে লোক পাঠিয়ে আক্রমণের অনুমতি চাইবার সময় নেই। থাকলেও আদেশ পাওয়া যেত কিনা, সন্দেহ।

রস্টভ এ অবস্থায় অসমসাহসের কাজ করে বসল একটা। বিনা অনুমতিতেই আক্রমণের আদেশ দিল নিজের সৈনিকগুলিকে। তারা তীরবেগে পাহাড় বেয়ে নেমে পড়ল ফরাসীদের ওপরে। এই নতুন আক্রমণের গতিরোধ করতে পারল না ফরাসীরা। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পরিবেষ্টিত রুশেরা উদ্ধার পেল। রস্টভের জয়জয়কার।

ঠিক সেই মুহূর্তে আহ্বান এল কুটুজভের কাছ থেকে। রস্টভ ভাবল—সেনাপতি কঠোর সাজা দেবেন তাকে। সে বিনা অনুমতিতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। যে কাজ করবার দুঃসাহস পদস্থ সেনানীদেরও হয় না, সামান্য কাপ্তেন হয়ে তাই সে করেছে। যাই হোক, সাজা নিতে হয় তো নেবে সে। তার অন্তর বলছে সে ঠিক কাজই করেছে। অনুমতি নেই, এই অজুহাতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ও-ক্ষেত্রে কাপুরুষের কাজ হত।

শাস্তি পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়েই সে কুটুজভের দরবারে হাজির হল। কিন্তু কী আশ্চর্য! শাস্তির বদলে সে পেলো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কুটুজভ খুশী হয়েছেন, কারণ রস্টভের দুঃসাহসের দরুনই একদল রুশসেনার জীবন রক্ষা হয়েছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন—"এই তো চাই! জরুরী ক্ষেত্রে ওপরওয়ালার আদেশের প্রতীক্ষা না করে যে নিজেই নিজের কর্তব্য স্থির করে নিতে পারে, সেই তো রণনেতা হওয়ার যোগ্য!"

রস্টভকে কর্নেল পদে উন্নীত করে দেওয়া হল সংগে সংগেই। কিন্তু রণস্থলে আর তাকে রাখলেন না কুটুজভ। তাকে পাঠিয়ে দিলেন ভেরোনেজে। সেখানে যুদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সমগ্র বাহিনীতে অশ্ব সরবরাহ করার ঘাঁটি হল ওইখানে। দায়িত্বশীল একজন সেনানী ওখানে থাকেন সেই সরবরাহের তদারকের জন্য।

নিকোলে রস্টভের পদোন্নতি হল। সেই সময় তার ভাই পেতিয়ার হল মৃত্যু! বালকের রণোন্মাদনা ছিল নিকোলের চাইতেও বেশী। অতিরিক্ত দুঃসাহস করতে গিয়ে অকালে সে রণশয্যায় শয়ন করল।

এদিকে দারুণ দুর্ঘটনায় পতিত হলেন আন্দ্রি। বোরোদিনো যুদ্ধের পর রুশ সেনা তখন পশ্চাদপসরণ করছে। আন্দ্রি আছেন একদল সৈন্যের নেতৃত্বে। ফরাসীরা পেছনেই আছে। তাদের কামানের গোলা এসে পড়েছে আন্দ্রির দলের ভেতরে। একটা গোলা এসে ফাটল ঠিক আন্দ্রির সামনে। উরুতে আঘাত পেয়ে তিনি ধরাশায়ী হলেন।

হাসপাতালে পাটাই কেটে বাদ দেওয়া হল তাঁর। তারপর ক্ষত শুকোবার আগেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে বিদায় নিতে হল। কারণ নিত্যই দলে দলে আহত সৈনিক আসছে, তাদেরও জায়গা দিতে হবে তো! পুরাতন রোগীকে বিদায় দিতে হচ্ছে, নতুনদের স্থান দিতে হবে বলে। হাসপাতালের গাড়ি আন্দ্রিকে নিয়ে পৌঁছে দিল নিকটবর্তী এক গ্রামে।

নিতান্তই বরাতজোর, এই গ্রামেই রস্টভদের পল্লীভবন, এবং মস্কোর পতন আসন্ন জেনে কাউণ্ট রস্টভ তখন এই পল্লীভবনেই চলে এসেছেন। যুদ্ধের লাইন থেকে এ গ্রাম অনেক দূরে, সুতরাং নিরাপদ্। আন্দ্রি আশ্রয় পেলেন রস্টভদের বাড়িতে।

নাটাশা সেইখানেই আছে। আন্দ্রির সংগে তার আর বিবাহ হতে পেল না, কিন্তু রোগশয্যায় নাটাশার সেবা অবশ্যই খানিকটা তৃপ্তি দিয়েছিল তাঁকে।

সংবাদ পেয়ে মেরায়া এল ব্লীক হিল থেকে। তারপরই মেরায়া আর নাটাশার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আন্দ্রির জীবনদীপ একদিন নির্বাপিত হল। তার কয়েকদিন আগেই বৃদ্ধ প্রিন্স বলকনস্কিও ধরাধাম ত্যাগ করেছেন।

এদিকে কুটুজভ মস্কোতেও দাঁড়ান নি। মস্কো ত্যাগ করে তিনি আরও উত্তরে সরে যাচ্ছেন। নেপোলিয়ন সসৈন্যে এসে মস্কোতে প্রবেশ করলেন। পাঁচ সপ্তাহ অবস্থান করলেন সেখানে। তাঁর আশা ছিল—রাজধানীর পতন হলে রুশসম্রাট্ অবশ্যই সন্ধিভিক্ষা করে দূত

পাঠাবেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার সেদিক দিয়েও গেলেন না। তাঁর দৃঢ় পণ—নেপোলিয়ন রুশ দেশ ত্যাগ করে না গেলে সন্ধি তিনি করবেন না।

নেপোলিয়ন কিন্তু আর অগ্রসর হতে সাহস পেলেন না। খাদ্যের অভাবে তাঁর সৈন্যেরা উপবাস করছে। শীত এসে পড়েছে। এ অবস্থায় আর অগ্রসর হওয়ার পরিণাম একটাই হতে পারে—সে-পরিণাম ধ্বংস। এখনও যদি ত্যাগ করে যাওয়া যায় এই অভিশপ্ত দেশ, সৈন্যদলের কিছু অংশ বাঁচতেও পারে। আর বিলম্ব করলে একটি প্রাণীও বাঁচবে না।

নেপোলিয়ন পিছু হটলেন।

কাউণ্ট পিয়র বেজুহভ, তিনি এবারও সৈন্যদলে ঢুকতে পারেন নি। কিন্তু মস্কো ত্যাগ করেও যান নি তিনি। যুদ্ধ করবার সুযোগ তিনি পেলেন না, কিন্তু অন্যভাবে দেশের কাজ তিনি করতে পারেন তো! তিনি চেষ্টা করছিলেন—যে কোনো রকমে নেপোলিয়নের সমীপস্থ হয়ে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা। সে সুযোগ তিনি পেলেন না, উপরন্তু তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করে ফরাসীসৈন্যেরা বন্দী করল তাঁকে।

ফলে, ফরাসীবাহিনী যখন পশ্চাৎপদ হল, পিয়রকেও তারা সঙ্গে নিয়ে গেল। হাজার হাজার রুশ বন্দী চলেছে ফরাসীসেনার পেছনে পেছনে। কায়িক পরিশ্রমের কাজ সবই করতে হচ্ছে এই বন্দীদের। ভারবাহী পশুরা পড়ছে, আর মরছে। সে-পশুদের পিঠের বোঝা চাপছে বন্দীদের পিঠে। অথচ খাদ্য বলতে কিছু তারা পাচ্ছে না। অনাহারে যতক্ষণ চলতে পারে, চলুক। যখন পারবে না—পড়ে থাকুক পথে।

পিয়র কোনক্রমে বেঁচে রইলেন—মরা ঘোড়ার মাংস খেয়ে খেয়ে। অবশেষে একদিন হঠাৎ মুক্তি পেলেন। ফরাসীসেনা পালাচ্ছে বটে, কিন্তু নিরাপদে পালাতে পারছে না। পেছনে তাড়া করছে দুর্ধর্ষ কোসাক গ্রামবাসীরা। তাদেরই একটা দল এক রাত্রে হানা দিল এসে ফরাসীবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে। সেখানেই ছিল পিয়রেরা, তারা হল মুক্ত।

দীর্ঘ তিনমাস এক গ্রামে অসুস্থ হয়ে রইলেন পিয়র। তারপর যখন মস্কোতে ফিরলেন, তখন রুশদেশ থেকে শেষ ফরাসী সৈন্যটিও বিদায় নিয়ে গিয়েছে। পাঁচ লক্ষ দুর্জয় ফরাসীর ভেতর মাত্র পঞ্চাশ হাজার প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে নিজের দেশে।

জার আলেকজাণ্ডার ফিরে এসেছেন মস্কোতে। কুটুজভকে তিনি শ্রদ্ধা করেন না, কিন্তু ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে তাঁকেই তিনি রুশদেশের শ্রেষ্ঠ সামরিক সম্মানে ভূষিত করলেন।

পিয়রের প্রথমা পত্নী এলেন বহুদিন পূর্বেই তাঁকে ত্যাগ করে গিয়েছিল। এখন পিয়র বিবাহ করলেন নিকোলে রস্টভের ভগিনী নাটাশাকে। আর প্রিন্সেস মেরায়ার সঙ্গে বিবাহ হলো নিকোলের। রস্টভ বংশ নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, এখন আবার ঐশ্বর্যের মুখ দেখল, কারণ মেরায়া তো প্রিন্স বলকনস্কির অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছে!

মেরায়ার নিজের সন্তানসন্ততি অনেকগুলিই হল বটে, কিন্তু তাদের চাইতেও মেরায়ার আদরের পাত্র হয়ে রইল তার ভ্রাতুষ্পুত্র নিকোলুস্কা—প্রিন্স আন্দ্রির একমাত্র বংশধর।



লিও টলস্টয়

● লেখক পরিচিতি

রাশিয়াব এক অগ্রগণ্য অভিজাত পরিবারের সন্তান কাউণ্ট লিও টলস্টয়ের জন্ম হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। মস্কো মহানগরীতে মাতামহের গৃহেই তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়ে যেমন একদিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েব উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে সযত্নে অধ্যয়ন কবেছিলেন, সর্বস্তরের নরনারীর মধ্যে বিভিন্নমুখী মানবচরিত্র।

শিক্ষা সমাপন করে লিও টলস্টয় কিছুদিন সৈন্যবাহিনীতে কাটিয়েছিলেন দেশসেবার জন্য। যুদ্ধ যে কী বীভৎস ব্যাপার, সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি এই সময়ে সঞ্চয় করেন। 'ওয়াব এণ্ড পীস' গ্রন্থে বর্ণিত রক্ত-পিচ্ছল রণাঙ্গনগুলি তাঁব কল্পনামাত্র নয়, ওর ভেতর সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রচুর প্রতিফলন বর্তমান।

যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং দরিদ্র-সমাজের দুঃখদৈন্য তাঁর দরদী অন্তরকে এভাবে নাড়া দিয়েছিল যে তাদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত সৃষ্টির আশা নিয়ে তিনি লেখনী-চালনায় প্রবৃত্ত হন। এইভাবেই তাঁর কালজয়ী উপন্যাসগুলি একের পর এক আবির্ভূত হতে থাকে, বিশ্বসাহিত্যের অমর সম্পদরূপে। ওয়ার এণ্ড পীস, রিজারেকশন, অ্যানা কারেনিনা—এসব বইয়ের প্রত্যেকখানাই সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রচলিত ভাষায় অনূদিত হযে সাহিত্যরসিকদের রসপিপাসাকে তৃপ্ত কবেছে চিরদিন।

তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছিল অভিনব ধরনের। তার অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে—প্যারাবল-জাতীয় অসংখ্য কাহিনীতে, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গভীরতায় যাদের তুলনা মেলে না—এক বাইবেল ছাড়া অন্য কোথাও।

পত্নীর স্বভাব-কর্কশতার দরুন টলস্টয়ের পারিবারিক জীবন মোটেই সুখের ছিল না। শেষ সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করে একা এক বিজন খামার বাড়িতে বাস করছিলেন, সেইখানেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহান্ত হয়।

লেখার ভিতর দিয়ে ধর্মকথার শাশ্বত বার্তা প্রকাশ করে, জনসমাজের দ্বাবা তিনি ঋষি বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে নিঃসন্দেহে তিনি সর্বোত্তম পুরুষ।



দ্য ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দ্য সী

সন্ধ্যা হয়ে আসে। বুড়ো সান্তিয়াগোর ডিঙ্গি এসে কূলে ভিড়ল।

আজ চুরাশি দিন। একটানা শনির দশা চলছে বুড়োর। চুরাশি দিনের ভেতর একটিও মাছ ধরতে পারে নি। এমন পোড়া বরাত আর কখনও কারও দেখা যায় নি। না, আর একবার দেখা গিয়েছিল এই অভাগা সান্তিয়াগোরই। সেবারে শনির দৃষ্টি চলেছিল সাতাশি দিন পর্যন্ত। তারপর? তারপর অবশ্য মাছের বান ডেকে গিয়েছিল ওর বরাতে, এত বড় বড় মাছ আর এত অঢেল মাছ কেউ ধরতে পারে নি কোনদিন।

কিন্তু পড়শীরা ভুলে গিয়েছে সে সব কথা। তারা সান্তিয়াগোর বর্তমান ভাটির দশা নিয়েই আলোচনা করে। আড়ালে সহানুভূতির কথা বলে। বুড়োর সামনে এসে বলার মত সাহস কারও নেই। ও তক্ষুনি দু-কথা শুনিয়ে দেবে না? "আছে, আমারই মন্দ কপাল আছে, তোমার তায় কী হে? হেঃ, সেদিন যাকে হতে দেখলাম, সে ছোকরা এসেছে মুরুব্বীয়ানা ফলাতে!" ইত্যাদি ইত্যাদি—

সুতরাং পড়শীরা কেউ ওর সামনে যায় না। একমাত্র ম্যানোলিন ছাড়া। সে ওই ছেলেটা, দেড় মাস আগেও যে সান্তিয়াগোর নৌকোতেই সহকারী ছিল। দেড় মাস আগে তাকে সান্তিয়াগোর

কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে তার বাবা। না নিয়ে করে কী? তখন একটানা চল্লিশ দিন ধরে একটি কুচো চিংড়িও ধরতে পারে নি বুড়োটা। ওর ডিঙ্গিতে থেকে লাভ কী? পাঁচটা বড় মাছ তুলতে দেখলে তবে তো ছেলেটা শিখতে পারবে মাছ ধরার কায়দা কৌশল! যার ফাতনা নড়ে না, তার কাছে শেখবার সুযোগ কোথায়?

নৌকোটা ঢালু পাড় দিয়ে টেনে অনেকটা উঁচুতে তুলল সান্তিয়াগো, যাতে রাতের জোয়ারে ভেসে না যায়। তারপর নৌকো থেকে পাল, মাস্তুল সব নামিয়ে নিল। বাড়ি নিয়ে যাবে এগুলো। রোজই নিয়ে যায়, চোর অবশ্য নেই এদিকে, তবু লোভের জিনিস রাত্রিবেলা সমুদ্রের ধারে ফেলে যাওয়াই বা কেন?

শুধু মাস্তুল আর পাল নয়, নিয়ে যেতে হবে সুতলিগুলোও। নিয়ে যেতে হবে মাছ-মারা বল্লম। চিরদিনই নিয়ে যাচ্ছে সান্তিয়াগো। মাস্তুল কাঁধে তুলে ভাঁজকরা পালখানা বগলে তুলতে যাবে, এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে এল ম্যানোলিন, এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে পালখানা বুড়োর কাছ থেকে টেনে নিল নিজের বগলে। একে পালের কাপড় মোটাই হয়, তার ওপর এর নানান জায়গায় ছেঁড়া মেরামত করা হয়েছে বড় বড় চটের টুকরো জোড়া দিয়ে, কাজেই ওজন এর বড় কম নয়।

"তুই আজও এলি?" মনের খুশী ভাবটা মনেই চেপে রেখে বাইরে উদাসীনভাব দেখাবার চেষ্টা করে সান্তিয়াগো। "তোর মনিব বকবে না?"

"কেন বকবে? তাঁর কাজ তো আমি শেষ করে দিয়ে এসেছি। আবার সেই কাল শেষ রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আজও কিছু হয় নি, নয়? তা না হোক গে, কাল হবেই। পঁচাশি নম্বরটা শুভ, কাল পঁচাশি দিনের দিন তুমি নিশ্চয় বড় একটা কিছু ধরবে।"

দাঁড়িগুলো আর বল্লমখানা হাতে তুলে নিয়ে সান্তিয়াগো হাঁটতে শুরু করেছে ততক্ষণ। ম্যানোলিনের কথার যে দাম নেই কিছু, ও যে দরদী ছেলেটার একটা দুর্বল প্রয়াস মাত্র সান্ত্বনা দেবার জন্য, তা কি আর সান্তিয়াগো বোঝে না?

হোটেলবাড়ির ছাদে জেলেরা জটলা করছে তখন। হোটেলটার মালিক মার্টিন লোক ভাল। সান্তিয়াগোকে ধারে বীয়ার বেচতে সে কক্ষনো নারাজ নয়। কিন্তু দাম্ভিক বুড়ো ধারের কারবার করে না। পড়তা ভাল চললে দরাজ হাতে কেনাকাটা করে, অন্য সময় হোটেলের ত্রিসীমায় ঘেঁষে না।

জেলেরা ছাদে বীয়ার খাচ্ছে, কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে। যে যার মাছ বরফঘরে জমা দিয়ে এসেছে, পকেটে পয়সার খাঁকতি নেই। সান্তিয়াগো সোজা হেঁটে যাচ্ছে হোটেলের সামনে দিয়ে, ফিরেও তাকাচ্ছে না। কারও আর বুঝতে বাকী রইল না যে অভাগা বুড়োর আজও কিছু জোটে নি। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল খানিকটা—ভাবটা যেন এই রকম "এবারে বুড়োটা মারা পড়ল তাহলে!"

গুয়ানোর চ্যাটাই দিয়ে তৈরী একখানা কুঁড়ে, বুড়োর আস্তানা সেইটেই। ভেতরে একপাশে একখানা তক্তপোশ, তাতে কম্বলঢাকা বিছানা একটা। একখানা পায়া-ভাঙা টেবিল আর নড়বড়ে চেয়ার, একটা উনুন আর দু একখানা বাসন কাঁটা চামচ—এ ছাড়া কোন আসবাব নেই ঘরে।

মাস্তুলটাকে ঘরে ঢোকাতে হয় কায়দা করে, বেঁকিয়ে রাখলে তবেই কোনমতে জায়গা সংকুলান হয়। পাল আর দড়িদড়া ঘরের কোণে ফেলে রেখে বুড়ো বসল চেয়ারে, ছেলেটা আসন গ্রহণ করল পালের ওপরে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। "তুমি রাত্রে খাবে কী?"—জিজ্ঞাসা করে ম্যানোলিন।

"রাঙ্গা ভাত আর মাছের কারি"—অম্লানবদনে উত্তর দেয় সান্তিয়াগো।

ম্যানোলিন বুড়োর নৌকোয় বেরুতে শুরু করেছিল, যখন ওর বয়স মোটে পাঁচ বছর। তখন থেকেই ও প্রতি সন্ধ্যায় বুড়োকে জিজ্ঞাসা করেছে—"তুমি খাবে কী?" আর বুড়ো প্রতি সন্ধ্যায় ওই একই জবাব দিয়েছে—"রাঙ্গা ভাত আর মাছের কারি।" আগে আগে জবাব শুনেই নিরস্ত হত ম্যানোলিন, কারণ সে জানত—জবাবটা ধাপ্পা নয়। সত্যসত্যই মাছ-ভাত খাওয়ার সামর্থ্য বুড়োর আছে।

কিন্তু এখন? আজ ওই "রাঙ্গা ভাত মাছের কারি" যে নিছক কল্পনার জিনিস, তা ম্যানোলিন জানে। কিন্তু ও-কথা ওইখানেই সে চাপা দেয়। চট করে অন্য কথা তোলে—"বেস্‌বল খেলার অবস্থাটা কী, কাগজ পড়ছ তো?"

বুড়ো বলে—"কালকের কাগজ—পেদ্রিকোর কাগজটাই সে দিয়েছিল আমায়, রয়েছে বিছানার তলায়। এক্ষুনি পড়ে তোকে বলছি। যাই বলিস, ডি-ম্যাগিওর মত বেস্‌বল-খেলোয়াড় আর হয় না—"

"তুমি পড় ততক্ষণ, আমি ঘুরে এসে তোমার কাছে শুনব এখন। ভাল কথা, কালকের জন্য টোপের ব্যবস্থা আছে তো?"

"আজকের টুনাগুলো তো নষ্ট হয় নি, ওইতেই কালও কাজ চলে যাবে।"

"তা যাবে, তবে সার্ডিন হলে আরও ভাল হয় না? আমি দেখছি—"

"আরে না, না, তুই কিনতে যাস নি—"

"বেশী না, এই গোটা চারেক—"

"না, চারটে তো নয়ই, নেহাত যদি তুই নাছোড়বান্দা হস, তাহলে যা, একটা কিনগে যা—"

"না, একটা নয়, দুটো দুটো! দুটোর কমে হয় কখনও?"

"তাহলে দুটোই! কিন্তু খবরদার, দুটোর বেশী কক্ষনো নিবি নে!"

ম্যানোলিন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তার নতুন মনিব বেশ মাছ ধরছে আজকাল। দুটো একটাও হয় না, এমন দিনই নেই। বখরাতে কিছু পয়সা ম্যানোলিনও পায়। তা

থেকে বাপকে দিতে হয় কতকটা। হাতখরচার জন্য সামান্যই থাকে ওর। কিন্তু যতক্ষণ একটা পয়সাও আছে, বুড়োর জন্য তা খরচ করতে রাজী ম্যানোলিন।

জ্ঞান হয়ে অবধি বুড়োর নৌকোতেই সারা দিনমান কেটেছে ওর। মাছ পাক বা না পাক, বুড়ো ছিল ওর চোখে একটা অনন্ত বিস্ময়। সমুদ্র আর আকাশ সম্বন্ধে ওর জ্ঞান অসীম। কম্পাস তো নেই-ই, আকাশের তারাগুলোও নিবিড় মেঘের তলায় ঢাকা পড়েছে, এমন রাত্রেও নির্ভুলভাবে ডিঙ্গি বেয়ে ও বাহির সমুদ্র থেকে বন্দরে এসে উঠেছে। আকাশে মেঘ উঠেছে, সে মেঘ থেকে ঠিক ক'দিন পরে কতটা বর্ষণ হবে, তার অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছে ও। ফাতনা নড়ে উঠল দেখে ও শুধু একটিবার সুতোটা বুড়ো আঙ্গুল আর অনামিকার ভেতরে টিপে বলে দিয়েছে ক'শো ফুট জলের তলায় ঠিক কত বড় মাছ এসে ঠোক্কর দিচ্ছে।

বরাত? বরাতের কথা আলাদা, কিন্তু বুড়ো সান্তিয়াগোর মত জেলে যে হাভানা বন্দরে আর কেউ নেই, একথা ম্যানোলিন চিরদিন জোর গলায় ঘোষণা করে আসছে সকলের কাছে। অনেকের সঙ্গে ঝগড়া এবং সমবয়স্কদের সঙ্গে মারামারিও করতে হয়েছে কখনও কখনও একথা নিয়ে।

আগের দিনের বাসী কাগজটা নিয়ে চেয়ারেই বসেছিল সান্তিয়াগো, কিন্তু বেস্‌বল প্রতিযোগিতায় ডি-ম্যাগিওর বিস্ময়কর কেরামতির বৃত্তান্তটুকু পড়বার পরে কাগজে আর চোখ বুলোবার মত খবর সে আর কিছু দেখতে পেল না, চেয়ারে বসেই ঢুলতে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর সটান গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায় কম্বল চাপা দিয়ে।

ম্যানোলিন ফিরে এল যখন—বুড়ো তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কিছুক্ষণ ম্যানোলিন বসে রইল চুপ করে। ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক বেচারী। ঘুম দরকার।

কিন্তু খাওয়াও তো দরকার! রাঙ্গা ভাত আর মাছের কারির উপকথায় ম্যানোলিন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি, রুটি আর সুপ এনেছে মার্টিনের হোটেল থেকে। সঙ্গে এনেছে এক বোতল বীয়ার। হোটেলওয়ালা মার্টিন জানে যে হোটেলে বসে না খেয়ে ম্যানোলিন রোজই রাত্রে খাবার নিয়ে বেরিয়ে আসে কেন, আর অত বেশী পরিমাণ খাবারই বা তার অতটুকুন পেটের জন্য দরকার হয় কেন। জানে বলেই দামের কড়াকড়ি সে ম্যানোলিনের বেলায় করে না। খাবার যা দেয়, দাম নেয় তার আদ্ধেকের।

তাক থেকে বাসন-কোসন পেড়ে ধুয়ে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে সে। কাঁটা ছুরিও জায়গামত রেখে দেয়। তারপর আস্তে আস্তে বুড়োর পা ধরে নাড়া দেয়—"ওঠো মুরুব্বী,—খেয়ে নাও"—

সান্তিয়াগো ওঠে। উঠে দেখে খাবার সাজানো রয়েছে। রাঙ্গা ভাত আর মাছের কারির প্রসঙ্গ আর তোলে না। "আবার তুই আজও এনেছিস?" এই বলে খেতে শুরু করে দেয়।

ওর মনোযোগটাকে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়ার জন্য ম্যানোলিন বলে—"সার্ডিন খুব ভালোই পেয়েছি। জীইয়ে রেখেছি। কাল ভোরবেলায় দিয়ে দেব তোমার ডিঙিতে। আমায় ডেকে নিও একটু রাত থাকতে। একা একা এসব লটবহর তুমি ডিঙিতে তুলতে যেও না।"

সে কথায় কান না দিয়েই বুড়ো বেস্‌বলের বাসী খবর পরম উৎসাহে শোনাতে লেগে যায়। "জানিস? ডি-ম্যাগিও কাল যা খেল দেখিয়েছে—কস্মিন্‌কালেও কেউ কখনও সে রকমটি পারে নি—"

ভোরবেলায়, না ভোর তখনও হয় নি, রাত প্রায় দু-ঘণ্টা রয়েছে তখনও, বুড়ো আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। ম্যানোলিনকে ডাকতে হবে। নিজে সব লটবহর নিয়ে যেতে পারবে না—এটা মনে মনে স্বীকার করে না বুড়ো, তবু ছেলেটাকে ডাকতে হবে। না ডাকলে সে দুঃখ পাবে খুব।



তাবপর বুড়োর পা ধরে নাড়া দেয়—"ওঠো মুরুব্বী, খেয়ে নাও।"
পৃঃ—১২৪

ছেলেটা শোয় কোথায়, তা জানে সান্তিয়াগো। চোখ মুখ ধুয়ে সে বেরুলো ওকে ডাকবার জন্য। পথে পড়ে জেলেদের সার্বজনীন ভাঁড়ার। ওদের ব্যবসার জন্য দরকারী সব সরঞ্জাম এখানে পাওয়া যায়। সস্তাদরে এবং ক্ষেত্রবিশেষে, ধারে। কিন্তু সরঞ্জাম এখন দরকার নেই সান্তিয়াগোর। আর একটা জিনিস, যা বিনা পয়সায় এখানে পাওয়া যায়, তারই জন্য সে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সে-জিনিসটা হাঙ্গরের তেল। ভাঁড়ারের এক কোণে একটা জালা-ভরতি এই তেল রেখে দেওয়া হয়েছে। যার ইচ্ছে, খেয়ে যাও। সান্তিয়াগো রোজ ভোরে এক পেয়ালা খেয়ে যায়।

ভয়ানক বিস্বাদ বটে, কিন্তু জেলের জীবনে ওর চেয়ে উপকারী দাওয়াই আর নেই। সর্দিকাশিতে, গা-হাত-পায়ের বাতে, পেট-কামড়ানিতে ধন্বন্তরি ওষুধ।

হোটেলবাড়ির নীচতলায় সারি সারি বিছানা। জেলেরা শোয় এখানে, অর্থাৎ যে-সব জেলের নিজের ঘর-বাড়ি বাঁধার সামর্থ্য হয় নি এখনও। মার্টিনকে কিছু ভাড়া দেয় মাসান্তে, নামমাত্র ভাড়া। ম্যানোলিনও এইখানে একটা বিছানা ভাড়া নিয়েছে।

বুড়ো গিয়ে তাকে নাড়া দিল। সে উঠে একবার ফ্যালফ্যাল করে তাকাল তার পানে। তারপর একটু হেসে পেণ্টালুনটা পরতে পরতে বেরিয়ে পড়ল বুড়োর সঙ্গে। মুখ হাত ধুয়ে সে রাস্তা ধরল। পথে পড়ে সস্তা কফির দোকান একখানা। আগুনের মত গরম কফি—জেলেরা ঢকঢক করে গিলছে আর গিলছে। এক্ষুনি সমুদ্রে ভাসতে হবে, ভোরের ঠান্ডা যাতে কায়দা করতে না পারে, তারই জন্য সাবধান হওয়া আর কি!

ম্যানোলিন বুড়োকে নিয়ে ঢুকল কফিখানায়। বেঞ্চিতে বসে দু-পাত্র কফির হুকুম দিল। আর বাসী রুটি। "খেয়ে নাও, ঠান্ডাটা ছাড়বে,—" নিজের পাত্রটা শেষ করে সে সার্ডিন আনতে ছুটল। বুড়োর জন্য হুকুম করে গেল আর এক পাত্র কফি—"পেটটা ভরে নাও! পয়সার জন্য ভেবো না। এখানে ধার চলে—"

বুড়ো খাচ্ছে সুবোধ বালকের মত। সারাদিন হয়তো কিছুই জুটবে না আর। ধার খাওয়া তার পছন্দ নয়, কিন্তু না খেলে ছেলেটা দুঃখ পাবে—আর, ও-ছেলেকে মানুষ করেছে তো সান্তিয়াগোই—

সার্ডিন নিয়ে এল ম্যানোলিন, তাজা পুরুষ্টু দুটো মাছ, এ-মাছের টোপ দিয়ে মাছের রাজা টাইবুরনকেও ধরতে পারা উচিত!

মাস্তুল, পাল, বল্লভ, দড়াদড়ি—সব বয়ে নিয়ে সান্তিয়াগোর ডিঙ্গিতে তুলে দিল ম্যানোলিন। ডিঙ্গি ঠেলে নামিয়ে দিল জলে। তারপর সান্তিয়াগো উঠে বসে দাঁড় হাতে করল। ম্যানোলিন ডেকে বলল—"শুভযাত্রা!"

নৌকো ভেসে চলে। মৃদু তরঙ্গ দোলা, মৃদু মৃদু দাঁড়ের টান।

ম্যানোলিন ফিরে যায়। তার নতুন মনিবের ডিঙ্গি সাজাতে হবে এখন।

সূর্য উঠতে দেরি আছে এখনও। মনিব হয়তো এখন কফিখানায়।

২

বুড়ো নৌকো বেয়ে চলেছে। দাঁড় টানছে হালকাভাবে। জীর্ণ দেহের স্বল্প শক্তি এখনই ব্যয় করে ফেলতে সে নারাজ। যেন বুঝতে পেরেছে—আজ তাকে শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে কোন এক অমিত শক্তিধরের কাছে।

নৌকো নিয়ে সে বন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আশেপাশে অন্য জেলের নৌকো এতক্ষণ অনেক ছিল, এখন একটাও নেই। চোখের ওপর হাতের ঢাকনা দিয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে বহু দূরে দূরে এদিকে ওদিকে এক আধখানা বাদামী পাল চোখে পড়ে কি না-পড়ে। এত দূরে সে সচরাচর আসে না। আসে না কোন ধীবরই।

আজ তবে কেন সে সুদূরের পানে কেবলই চলেছে? কাছে কিনারের এই জলরাশির ওপর সে আস্থা হারিয়েছে বলে। আজ চুরাশিটা দিন ওরা নির্মম ব্যবহার করেছে তার সংগে। একটা কুচোকাচা মাছও তাকে ধরতে দেয় নি। হাভানা বন্দরে রটিয়ে ছেড়েছে যে বুড়ো সান্তিয়াগো কাজের বার হয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় তাকে এনে ফেলেছে—যাতে তার বুড়ো বয়সের একমাত্র বন্ধু ওই ম্যানোলিন ছেলেটাও বাপের শাসনে প্রকাশ্যে তার সম্পর্ক না ছেড়ে পারে নি। নাঃ, এ জলের কাছে কোন কিছুই প্রত্যাশা করবার নেই সান্তিয়াগোর।

দূরে, দূরে! পেছন পানে হাভানা দেখা যায় একটা আবছা কালো রেখার মত। কদাচিৎ এক পাঁজা ধোঁয়া হয়ত উড়তে দেখা যায় আকাশের একটা বিশেষ বিন্দুতে। একটা পাখি চোখে পড়ে না। একটা নকল পাখিও না। ওই যাকে সবাই বলে এরোপ্লেন।

সূর্য উঠে পড়েছে। ডান কাঁধের ওপর গরম লাগছে রোদ্দুর পড়ে। তার মানে, সে উত্তর দিকে চলেছে। উপসাগরীয় স্রোত তীরবেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার নৌকো। দাঁড় বাওয়ার দরকার কিছু নেই। কেবল নৌকোর মুখটা ঠিক রাখার জন্যই ওকে জলে ডুবিয়ে রাখা।

বঁড়শি নামিয়ে দিয়েছে চার-চারটে। একটা আড়াই শো ফুটে, একটা সাড়ে তিন শো'তে, একটা ছয় শো'তে আর একটা সাড়ে সাতশো ফুট গভীরে। সবুজ রঙের ফাতনাগুলো নীল জলে ভাসছে, ঠিক সোজা ভাবে নয়, নৌকোর টানে ঈষৎ কাত হয়ে।

ইস, অনেক দূর এসে পড়া গেল। কোথাও কিছু নেই, না একখানা ডিঙিং জলের ওপর, না একটা পাখি আকাশে। রোদ উঠেছে ঝকমকিয়ে, জ্বলজ্বল করছে সমুদ্রের জল। চোখে লাগে সে জ্বলুনির দাহ। অনেক জেলের চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওই ঝলমলানির জন্য। সান্তি-য়াগো জানে, সে ভ্রূর ঠিক ওপরে পুরু করে তোয়ালে বেঁধে ফেলল, চোখটাকে ছায়ায় রাখার জন্য।

ফাতনার দিকে মাঝে মাঝে না তাকালে নয়। তা নইলে সে জলের দিকে চোখই দিত না। আকাশের দিকে তাকানো বরং ভাল। বিশেষ যদি কোথাও একটু মেঘ থাকে, তবে সেদিক পানে তাকালে তো চোখ জুড়িয়ে যাবে। আছে—ওই কোণটাতে পেঁজা তুলোর মত এক রাশ কিউমিউলাস মেঘ রয়েছে বটে, তার নীচের স্তরে অল্প একটু সাইরাস মেঘ। এর অর্থ জানে বুড়ো। বৃষ্টি বাতাস হবে, কিন্তু সে দিন চারেক পরে। আপাততঃ তিনটি দিন বুড়োর হাতে আছে বড়-রকম কিছু করবার জন্য।

সব পেছনের বঁড়শিটা—যেটা মাত্র আড়াই শো ফুটে ডুবে আছে, ওটার হল কী? ফাতনাটা

কাঁপছে। কাঁপছে! ডুবছে, আস্তে আস্তে ডুবছে। গুরোর সঙ্গে বাঁধা ছিল সুতোটা। বাঁধন খুলে হাতে নিল বুড়ো। হাঁ, ধরেছে মাছ। খেয়েছে। সুতো নিয়ে যাচ্ছে টেনে। বুড়ো আঙ্গুল আর অনামিকার মাঝখানে বুড়ো সুতোটা আলগোছে ধরেছে। সুতোর কাঁপন দেখেই সে বুঝেছে,—মাত্র পাউন্ড দুই ওজনের কোন মাছ—ভাঙ্গন হবে বোধ হয়—সেই খেয়েছে বঁড়শি। হোক মাত্র দু পাউন্ড। একটানা চুরাশি দিন অদর্শনের পর আজ প্রথম দেখা দিয়েছে জলের মানিক। দু পাউন্ডই তার যথেষ্ট।

আর সুতো ছেড়ে হবে কী? জোরে জোরে সুতো টানতে লেগে গেল সান্তিয়াগো। সত্যিই দু পাউন্ড একটা ভাঙ্গন মাছ। কী নধর রুপোলী চাকচিক্য। চুরাশি দিন পরে এই বউনি! দিন ভালই যাবে বোধ হচ্ছে। ম্যানোলিন তো কাল বলেই ছিল যে পঁচাশি সংখ্যাটি শুভ সংখ্যা।

মাছটা নৌকোর খোলের ভেতর ফেলে বঁড়শিতে আবার টোপ গাঁথতে বসল বুড়ো। কুচো কুচো টুনা মাছ আষ্টেপৃষ্ঠে সাপটানো বঁড়শির, লোহাটাকে ঢেকে আছে আগাগোড়া। দু এক জায়গাই ছড়ে গেছে সে-বেষ্টনীর। আর অবশ্য বঁড়শির মাথার দিকে বেশ-খানিকটা ফাঁকা হয়ে গেছে ভাঙ্গনের ঠোকরানিতে। টুনাগুলো ঠেসে দিয়ে সবার ওপরে সার্ডিনের পুরো আস্তর চাপালো একটা সান্তিয়াগো। যে সার্ডিন এনে দিয়েছিল ম্যানোলিন, তার বেশির ভাগটাই লেগে গিয়েছে সাড়ে সাতশো ফুটওয়ালা বঁড়শিটা গাঁথতে, তবু ঝড়তিপড়তি টুকরো আছে অনেক, তা দিয়ে এখন এই সব খুচরো কাজ চলুক তো!

নৌকো ভেসে চলেছে। এ জায়গাটাও যে মানুষের পৃথিবীর ভেতরে, তা রীতিমত চেষ্টা করে তবে বিশ্বাস করা যায়। পৃথিবী? পৃথিবীর কোন্ চিহ্নটা আছে এখানে? প্রাণী নেই, উদ্ভিদ্ নেই, জল আছে বটে, কিন্তু এ জলের সাথে পৃথিবীর জলের মিল কতটুকু? এই রকম নীল-গোলা জল ডাঙ্গায় কোথাও আছে নাকি? আর সে-জলের ভেতর এই রকম আগুন-ঝলকানো সূর্যের প্রতিবিম্ব ভাসে নাকি?

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। কই, যে বৃহতের আশা নিয়ে সান্তিয়াগো বেরিয়েছে, তার তো কোন চিহ্ন এখন পর্যন্ত দেখা যায় না। ওই দু পাউন্ড ওজনের ভাঙ্গন নিয়ে ফিরবে নাকি সান্তিয়াগো? কক্ষনো না, তার চেয়ে ওই দু পাউন্ডওয়ালাকে সে জলেই ফেলে দিয়ে যাবে আবার।

একটা হাওয়া উঠেছে। বন্দরে ফিরে যাবার পক্ষে অনুকূল হাওয়া। এই প্রবল উপসাগরীয় স্রোতের উজানে নৌকো বেয়ে যাওয়া শুধু দাঁড়ের সাহায্যে সম্ভব নয়। এই হাওয়াতে পাল তুলে দিলেই সেটা সহজে সম্ভব হতে পারে। দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে যেতে যেতে সান্তিয়াগো যেন চোখের ওপরেই দেখতে পেল—যেখানে যে জেলে আছে জলের বুকে, চঞ্চল হয়ে উঠে পাল খাটাচ্ছে ঘরে ফেরবার জন্য। যে যা পেয়েছে, তাই নিয়েই খুশী হতে হবে আজকের মত। আবার দেখা যাবে কাল।





সান্তিয়াগোও বুঝি একবার মাস্তুলের পানে তাকিয়েছিল। যে-মাস্তুলের গায়ে পালখানা শিথিল হয়ে লেপটে আছে আর বাতাসের ঝাপটায় একটু একটু করে দুলছে নিষ্কর্মা কুড়ের মত। উঠবে নাকি সান্তিয়াগো? সন্ধ্যার ভেতর ঘরে ফিরতে হলে ওঠাই দরকার। ঘর—অর্থাৎ ম্যানোলিন —আর তার উচ্ছ্বাসহীন সেবা, আর তার দরদভরা আশ্বাস। "বিশেষ কিছু হয় নি বুঝি? তা না হোক, কাল নিশ্চয়ই হবে। আজ দু পাউন্ড হয়েছে, কাল দু হাজার পাউন্ড হবে।"

উঠতেই বুঝি যাচ্ছিল সান্তিয়াগো, হঠাৎ চোখে পড়ল গলুইয়ের গায়ে শেষ ফাতনাটার ওপর। যার নীচে সাড়ে সাতশো ফুট গভীরে সবচেয়ে মোক্ষম বঁড়শিটা ডুবে আছে শিকারের আশায়।

ফাতনা কাঁপছে যে!

শুধু কাঁপছে নয়, এক একবার একটু করে ডুবেও যাচ্ছে।

সাড়ে সাতশো ফুট গভীরে যে মাছ টোপে ঠোকরাচ্ছে, সে কি আর ছোট মাছ হবে? উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে সান্তিয়াগো হামা দিয়ে দিয়ে গলুইয়ের কাছে এগিয়ে গেল। সুতোটা খুলে নিল গুরো থেকে। এ সুতো তো সুতো নয়, ঠিক যেন টেলিগ্রাফের তারের মত মোটা, আর শক্তও তেমনি। সুতোটা বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে চালান করে দিয়ে ডান হাতে তুলে নিল একটা অংশ। সুতোর নাড়ী পরীক্ষা করছে বুড়ো আঙুল আর অনামিকার মাঝখানে ধরে।

এ কী কান্ড! এত ভারী এটা কী? মাছ? না, কুমির? না, অতিকায় হাঙ্গর? ম্যানোলিনের ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্যি হবে নাকি তাহলে? পঁচাশি দিনের দিন বরাত ফিরবে তার? এ মাছ পেল্লায় মাছ না হয়ে যায় না। এখন টেনে তুলতে পারলে হয়!

কিন্তু ফাতনা আর নড়ছে না। মাছ সরে গিয়েছে দূরে। তা যাক। ওতে ঘাবড়ায় না কোন ঝানু জেলে। বড় মাছেরা সাধারণতঃ হুঁশিয়ার জীব হয়ে থাকে। নানা দিক দিয়ে ঠুকরে দেখবে গেলবার আগে। খানিকটা ঠুকরে খেয়ে এখন দূরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে জিনিসটার দিকে। লোভ আছে, কিন্তু তা বলে বেপরোয়া হয় নি।

ঠিকই আন্দাজ করেছে সান্তিয়াগো। মাছটা আবার এল, আবার ঠোকরাচ্ছে। ফাতনা আবারও একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। ভেসে ভেসেও তিড়বিড় করে লাফাচ্ছে।

আবার ফাতনা নিশ্চল হল। মৎস্যরাজ আবার দূরে সরে গিয়েছে। এবার বেশ কিছুক্ষণ কাটল। সান্তিয়াগো ভয় পেয়ে গেল—মাছটা কি সত্যিই চলে গেল? সার্ডিনের ভেতর বঁড়শির অস্তিত্ব টের পেলো নাকি? বড় মাছেরা—বিশেষ করে যেসব বড় মাছ আগে কখনও বঁড়শি গিলেও দৈববশে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে—তারা অনেক সময় পালায় এ-রকম! কী জানি, কি রকমে টের পায় যে রসাল খাদ্যবস্তুটিকে যেমন নির্দোষ মনে করা যাচ্ছে আসলে ততটা নয়।

মাছ তো কই ফিরে আসে না! চলে যাবে? পঁচাশি সংখ্যার ভেতরে শুভযোগ কিছু নেই, এইটেই সে প্রমাণ করে যাবে? সান্তিয়াগো মনে মনে দোহাই পাড়তে লাগল—"ওই বাপু মাছ!

খাও না টোপটা। দয়া করে খাও! কোঁত করে গিলে ফেল। তুমি তো জানোই মরতে তোমায় একদিন হবেই। আজই না হয় মরলে। তাতে ক্ষতিটা কী? নিজের লোকসান না করেও তুমি মহৎ উপকার করতে পার আমার। তুমি ধরা দিলে আমি দু-পয়সা পাব তোমাকে বেচে। তা ছাড়া আমার যে বদনাম রটে গিয়েছে অপয়া ভাগ্যহীন বলে, সে-বদনামও আমি কাটিয়ে উঠতে পারব। খাও, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, টোপটা খাও। ধর, একই সমুদ্রে তোমার আমার একসাথে আনাগোনা। আমি জলের ওপরে, তুমি জলের নীচে। এতেও যদি তোমার সঙ্গে আত্মীয়তার দাবি করতে না পারি, তাহলে আর কিসে পারব?”

সান্তিয়াগোর প্রার্থনাতেই মৎস্যরাজ বিগলিত হল বোধ হয়। ফাতনা ডুবে গেল ভুচ্ করে, আর উঠল না। সান্তিয়াগো ত্বরিত সুতোর গোলার শেষ প্রান্তটা বেঁধে ফেলল নৌকোর সাথে। বাঁ কাঁধে নিজের কোটটা ভাঁজ করে চাপাল। তারপর সুতোটা তুলে দিল সেই কোটের ভাঁজের ওপরে।

আর একটু দেরি হলেই মুশকিল হত। সুতো খুলতে লাগল তীরবেগে। বঁড়শি গিলে এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে ছিল মৎস্যরাজ, যেন উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিল যে সত্যি সত্যিই নিজের সর্বনাশ সে নিজে ডেকে এনেছে কিনা। সে উপলব্ধি ঘটেছে এতক্ষণে, আর প্রাণটা বাঁচাবার জন্য প্রাণীটা মরিয়া হয়ে ছুটেছে জলতলের অপার সমতলের ওপর দিয়ে।

দড়ি খুলে যাচ্ছে সনসন করে। কোট চাপানো না থাকলে কাঁধ এতক্ষণ কেটে তিন টুকরো হয়ে যেত ধারাল সুতোর ঘষায়। হাতে ধরা থাকলে, হাত কেটে নেমে যেত দুখানা হয়ে। নৌকোর কাঠের ওপর রাখলে সুতোটাই হয়তো ছিঁড়ে যেত পটাং করে। কাঁধে চাপানোই একমাত্র উপায়, তা শতবারের পরীক্ষায় ভাল করেই জেনেছে সান্তিয়াগো।

হঠাৎ তার খেয়াল হল—সূর্য তো ডুবছে! সন্ধ্যা তো হল! বাতাসটা এখনও আছে। এখনও পাল তুলে দিলে দুপুর রাত নাগাদ বাড়ি পেঁছোনো যেতে পারে। ওই তো নির্মল আকাশ, এক্ষুনি পরিচিত নক্ষত্রেরা ঝকমকিয়ে উঠবে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। হ্যাঁ ফিরতে সে স্বচ্ছন্দেই পারে। তবে একটা কাজ করতে হবে ফিরতে হলে। এই যে সুতোটা সনসন করে তার কাঁধ বেয়ে নেমে নীল জলে সরসর করে তলিয়ে যাচ্ছে, ছুরি দিয়ে এক্ষুনি এটা কেটে দিতে হবে। আদ্ধেক সুতো নিয়ে বন্ধনমুক্ত মৎস্যরাজ ছুটে চলে যাবে অতল জল ভেদ করে, বাকী আদ্ধেক সুতো নিয়ে আশাহত সান্তিয়াগো ঢিকঢিক করতে করতে ফিরে যাবে বন্দরের দিকে।

হ্যাঁ, মাছটাকে মুক্ত করে না দিয়ে ঘরে ফেরার তার উপায় নেই। একদিকে নিরাপত্তা, অন্যদিকে সুনাম। এ মাছ আলবত মাছের মত মাছ। জীবনে হাজার পাউণ্ড ওজনের মাছ অনেকবার ধরেছে সান্তিয়াগো, সেই যৌবনকালে। হ্যাঁ, একাই ধরেছে। দেড় হাজার পাউণ্ডের মাছও সে গেঁথেছে বঁড়শিতে। জীবনে দুবার। কিন্তু একা তুলতে পারে নি। নৌকোয় অন্য লোক ছিল, তার সাহায্যে তুলেছে।

হ্যাঁ, বড় মাছ কত বড় হলে সুতোয় তার কী রকম ভার টের পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে বেশ একটু ধারণা আছে বুড়োর। সেই ধারণা থেকে ও আন্দাজ করছে বর্তমান বন্দীর ওজন দেড় হাজারের কম তো নয়ই, বরং বেশীই হবে। পুরো দু হলেও অবাক্ হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ওকে তুলতে হবে একাই। হায়, ওই ছেলেটা যদি আজ নৌকোয় থাকত!

সুতোর গোলা ফুরিয়ে এসেছে। দুশো চল্লিশ ফুট সুতো জলের তলায়। গোলা আছে দুটো। চার বঁড়শিতে চার গোলা ছাড়াও অতিরিক্ত দুটো আস্ত গোলা নৌকোয় থাকে প্রত্যেক জেলের। সেই দুটো অতিরিক্ত গোলার একটা খুলে সে সুতোটা গেবো দিয়ে নিল এই নিঃশেষিত গোলার সঙ্গে। ব্যাস্, আরও দুশো চল্লিশ ফুট যাক না মাছটা! সুতোর অভাব নেই সান্তিয়াগোর।

দুশো চল্লিশ? উঁহু! এ যা মাছ, এর কাছে দুশো চল্লিশ নস্যি! ও ফুরোলো বলে। যে রকম তীরবেগে ও ছুটছে—আর যা অসুরের শক্তি ওর বিশাল দেহে—ও যদি ছুটতে ছুটতে গোটা দরিয়াটাই পার হয়ে যায়, সান্তিয়াগো অবাক্ হবে না।

অতএব, জোড়া দাও দ্বিতীয় অতিরিক্ত গোলাটাও। এইবারে নিশ্চিন্ত কিছুক্ষণের জন্য।

নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের দিকে চিন্তার মোড় একটু ঘুরিয়ে দিল বুড়ো। সারাদিন কিছু পেটে যায় নি। অবশ্য কোনদিনই কিছু যায় না, আজকের মত দিনের বেলার উপবাস নিত্যই ঘটছে। ভোর রাত্রে কফি খেয়ে বেরুনো, আর সন্ধ্যা রাত্রে বাড়ি ফিরে যা হোক কিছু খাওয়া—এই হল ওর রীতি। ওর কেন, গরিব জেলেদের সবাইয়েরই এই রীতি।

কিন্তু আজ সন্ধ্যা রাতে সে কী খাবে? এই জল তরঙ্গের দোলায় বসে? এই তরল মরুভূমির মাঝখানে? এখানে তো ম্যানোলিন রুটি আর সুপ নিয়ে আসবে না তার জন্য?

কিন্তু না খেলে সে কি খাড়া হয়ে বসে থাকতে পারবে সারা রাত? হ্যাঁ, সারা রাতেরই মামলা হতে যাচ্ছে এটা। ওই মাছ ছুটে ছুটে অবসন্ন হবে, অবসন্ন হয়ে ভেসে উঠবে তারপর তাকে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারতে হবে, তারপর একা একা তুলতে হবে এই নৌকোর খোলে—এ সারারাত্রির ব্যাপার তো বটেই, তা ছাড়া একা মানুষের ব্যাপারও নয়। হায় হায়, ওই ছেলেটা যদি আজ নৌকোয় থাকত!

না, ছেলেটা নেই। একা একাই তাকে সব কিছু করতে হবে। আর তা যদি করতে হয়, নিজেকে সক্ষম রাখতে হবে সারা রাত। কিছু না খেলে সেটা সম্ভব হবে না কোনমতেই। কাজেই, খেতে হবেই সান্তিয়াগোকে।

কী খাবে? এই নৌকোর ওপরে কোন খাবারই তো নেই!

হ্যাঁ, রান্নার সরঞ্জাম থাকলে ওই ভাঙ্গন মাছটা খাওয়া চলত। তা তো নেই! এক বোতল জল ছাড়া আর কোন উপকরণ নেই, যা দিয়ে মাছ রাঁধা যায়।

কিন্তু রান্না করেই খেতে হবে মাছ, এমন কি কথা? অনেক পাখি কাঁচা মাছ খায়।

অনেক হাঙ্গর কাঁচা মাছ খায়। কাঁচা মাছ খাওয়ার কথা শোনে নি সান্তিয়াগো, কিন্তু কাঁচা মাংস খায়—এমন মানুষের গল্প সে শুনেছে।

কাঁচা মাংস বলকারক বস্তু, তা সবাই জানে। তা নইলে বাঘের গায়ে অত জোর কেন? এই কাঁচা মাছটা খেলে নতুন জোর সান্তিয়াগোর গায়ে না-ই বা এলো, পুরোনো জোরটুকু যদি রাতটার মত বজায় থাকে, তাহলেই ও কৃতার্থ। খেতে হবে ওই কাঁচা মাছ!

মৎস্যরাজ ছুটে চলেছেন মরিয়া হয়ে। উপসাগরীয় স্রোত ধরেই যে ছুটছেন ক্রমাগত, তা নয়। এদিকওদিকেও যাচ্ছেন। রীতিমত মরিয়া! গলায় বঁড়শি আটকে আছে। খোলবার উপায় কিছু পাচ্ছে না। সান্তিয়াগোও মরিয়া। মাছের সঙ্গে ভাগ্য গাঁথা হয়ে গেছে, সে-জট ততক্ষণ খুলবে না, যতক্ষণ হয় মাছটা, নয় সান্তিয়াগো না মরছে।

হামা দিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে পেছন নৌকোয় হটে এল সান্তিয়াগো। সন্তর্পণে, যাতে কাঁধ থেকে সুতোটা ফসকে না যায়।

ভাঙ্গন মাছটা তেমনি ভাবেই পড়ে আছে খোলের ভেতর। ওটাকে তুলে নৌকোর কাঁধার ওপরে রাখল বুড়ো। ছুরি বার করল পকেট থেকে। মাছটাকে চিরে ফেলল লম্বালম্বি। নাড়ীভুঁড়ি বার করে ফেলে দিল জলে। মাথা এবং ল্যাজটাও। তারপর ধড়টাকে চিরে ছয়টা ফালি বার করল সরু সরু। একটা ফালি আবার দুখানা করে কেটে ফেলল। ছুরি দিয়ে চেঁচে ফেলে দিল আঁশসুদ্ধ চামড়া।

হায়, যদি একটু নুনও থাকত!

তা নেই, সেই কাঁচা মাছ মুখে দিয়ে চুষতে লাগল বুড়ো। কী আশ্চর্য! খুব খারাপ তো লাগে না! একটা গন্ধ আছে, এই যা অসুবিধে। তা নইলে, এমন কী মন্দ? চুষে চুষে সেই আধফালি মাছ খেয়েই ফেলল সে। বমিও পায় নি, কিছুই না।

ক্ষিদেটা এখনও পুরোমাত্রায় রয়েছে। আবার আধ ফালি, তারপর আর এক ফালি, এমনি করে সেই ছয় ফালি কাঁচা মাছ একে একে উদরসাৎ করে বসল বুড়ো। ব্যস, আর নেই! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জলের বোতলের দিকে হাত বাড়াল সে। এক ঢোক জল খেয়ে মনে হল—বাঁচা গেল বাবা! মস্ত একটা কঠিন কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হল।

শরীরে সন্ধ্যার পর থেকে যে অবসাদ টের পাওয়া যাচ্ছিল, তা কেটে গিয়েছে। বেশ তাজা, সক্ষম মনে হচ্ছে নিজেকে। খাওয়া হল, এখন একটু ঘুমোনো দরকার। বেশী না হোক, দুটো ঘণ্টা অন্ততঃ। এ যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে, মৎস্যরাজকে নৌকোয় তুলতে কালকের দিনটারও আদ্ধেক লেগে যেতে পারে। অতক্ষণ এই বুড়ো হাড়ে শরীর বইবে কেন, যদি একটু ঘুমিয়ে না নেওয়া যায়?

কিন্তু ঘুমের সময় যদি সুতোর গোলা ফুরিয়ে যায়? মাছের টানে যদি সে নিজে উলটে পড়ে যায় জলে? উঁহু, ঘুমের ভেতরও মাছকে সে ঠিকমত সুতোর যোগান দিয়ে যেতে পারবে, এটা নিশ্চিত না হয়ে সে চোখ বুজতে পারে না।

চার গাছা সুতো ঝুলছিল চার বঁড়শিতে। দুগাছা সে তুলে ফেলল। যে-গোলা ফুরিয়ে যাচ্ছে, তারই সাথে একে একে সেই দুটো সুতো জোড়া দিল। ব্যস, এইবার নিশ্চিন্দি! যে-বেগে মৎস্যরাজ ছুটছেন তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে বেশ কিছুক্ষণ। তাহলে কিছু ঘুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতক্ষণে হাঁপ ছাড়ল সান্তিয়াগো।

কাঁধের পরে সুতো সরছে সনসন করে। সেইভাবে নৌকোর কাঁধায় ভর দিয়ে সে একটুখানি কাত হল। একেবারে কাত না হয়ে পড়ে, সেইজন্য ডান হাত দিয়ে ঠেলে রাখল বাঁ কাঁধটা।

একবার আকাশের দিকে তাকাল, নির্মল নীলাকাশে চেনা-অচেনা অগুনতি নক্ষত্র। একবার নীচের দিকে চাইল, নিবিড় নীল জলে সেই অগুনতি নক্ষত্রের ঝিকিমিকি প্রতিবিম্ব। ধীরে ধীরে ঘুমের ঘোরে নুয়ে পড়ল তার মাথা।

৩

রাত ভোর হওয়ার আগেই বুড়ো চমকে জেগে উঠল। জেগেই কাঁধে হাত! না, সুতো ঠিকমত সরছে, কোন গোলমাল হয় নি। নৌকো ছুটছে। জলে হাত দিয়ে দেখল স্রোত নেই। তবে নৌকো চলে কেন? সে যদিও সুতো সমানভাবে ছেড়ে চলেছে, তবু মাছের দৌড়ের টান নৌকোর ওপর লাগছে কিছু। অর্থাৎ, মাছ দৌড়চ্ছে সুতোর চেয়েও দ্রুত! উঃ! কী অসাধারণ শক্তি মাছটার দেহে!

রাত ভোর হল। একটা ধূসর আলো সমুদ্রের ওপর চেপে আছে। দুটো শুশুক এসে ক্রমাগত ডিগবাজি খেতে লাগল নৌকোর পাশে। সান্তিয়াগোর ভয় হল—সুতোর সাথে তারা যদি জড়িয়ে যায়, সুতো ছিঁড়বে। দাঁড় তুলে সে তাড়া করল শুশুকদের, তারা ভয় পেয়ে সেই যে ডুব দিল, আর উঠল না।

সূর্য উঠল। মাছটাও কেন উঠুক না একবার! ওর কলেবরখানি একবার চর্মচক্ষুতে দেখবার জন্য বড় যে কৌতূহল সান্তিয়াগোর! আন্দাজ যা ও করেছে, সেই রকমই প্রকাণ্ড মাছ যদি এটা হয়, তাহলে এ একটা দেখবার মত মাছ। উঠতে ওকে হবেই। কারণ, যত অসীম শক্তির মালিকই ও হোক না কেন, এই দুরন্ত দৌড়ের ফলে এক সময় তাকে অবসন্ন হতে হবেই হবে। আর অবসন্ন হলেই মাছেরা ভেসে উঠতে বাধ্য হয়।

বেলা যখন এক প্রহর, একটা ছোট পাখি দেখা গেল এই জলমরুর ওপরে। সান্তিয়াগো অবাক্! কাছে পিঠে তো ডাঙ্গা নেই কোথাও, এ পাখি কোথা থেকে এল? এতটুকু ছোট পাখির ডানায় কত জোর যে সে কূল থেকে এতদূরে উড়তে উড়তে এল? আর এলই বা কেন? কী প্রয়োজন তার?

পাখিটা শ্রান্ত, তা বুঝতে কষ্ট হল না সান্তিয়াগোর। সে চেঁচিয়ে ডাকল—"এস বাপু, এই নৌকোর উপর বসে বিশ্রাম করবে এস।" পুরো একদিন কথা কইতে না পেরে সে যন্ত্রণা বোধ করছিল একটা। এখন পাখিটাকে উপলক্ষ করে সে কথা কয়ে বাঁচল।

পাখিটা সত্যিই এসে বসল। প্রথমে মাস্তুলের মাথায়, তারপর গলুইয়ে। আর সান্তিয়াগো তাব দিকে তাকিয়ে অনর্গল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে—যেন সে কতকালের পরিচিত বন্ধু! "কোথা থেকে আসছ তুমি? সেখানে কি ঝড়জল হচ্ছে? তা না হলে তোমার পালিয়ে আসার হেতু কি? এখন কোথায় যাবে ভাবছ? তাড়া নেই কোথাও যাবার। যতক্ষণ খুশী, এই ডিঙ্গিতে বসে বিশ্রাম কর। এ ডিঙ্গি এখনও অনেকক্ষণ থাকবে এই দরিয়ার বুকে। আমার আর এক বন্ধু জলের তলায় রয়েছেন, তিনি দর্শন দিলে তবে আমি ডিঙ্গির মুখ ডাঙ্গার দিকে ফেরাতে পারব।"



একটা জলোচ্ছ্বাস ঠিক তার নৌকোর সামনে

অন্যমনস্ক হয়ে পাখির সঙ্গেই আলাপ জমিয়েছে বুড়ো। হঠাৎ সে চমকে উঠল। একটা জলোচ্ছ্বাস ঠিক তার ডিঙ্গির সামনে। পরক্ষণেই জলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল এক বিশাল বপুকে। মাছ! মাছ! সেই মহামান্য মহামৎস্য! যার আসার আশায় একটা দিন একটা রাত তপস্যা করছে বেচারী সান্তিয়াগো!

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাছের দিকে তাকিয়ে রইল সান্তিয়াগো। কত বড়? তা, নৌকোখানার চাইতে অন্ততঃ দু তিন ফুট লম্বা হবে। এ মাছ সে নৌকোয় কোথায় তুলবে? কেমন করে? শক্তি? শক্তি তার তো নেই-ই, নৌকোতে জায়গাও নেই! ওকে বেঁধে ভাসিয়ে নিতে হবে নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে।

ভুচ্! মাছ আবার ডুব দিয়েছে।

দেবেই! শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে মাছেরা অনেকবার ভাসে, অনেকবার ডোবে। তবে, এই

যে সে ভেসেছে, এতে বোঝা গেল, ওর শক্তির গাঙে ভাটা পড়ে আসছে। এখন শুধু সময়াপেক্ষা।

বুড়ো নৌকোর গলুইয়ের দিকে তাকাল—মাছটার সম্বন্ধেই পাখিটার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য। কিন্তু হায়, পাখি কখন উড়ে গিয়েছে। মাছ যখন লাফিয়ে ভেসে উঠল, সেই শব্দেই ভয় পেয়ে ও পালিয়েছে। কোথায় গেল? চারদিকে তাকিয়ে দেখল বুড়ো। আকাশের কোন কোণেই তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। অবশ্য তাতে অবাক্ হওয়ার কিছু নেই। একটু ওপরে গেলে, ছোট পাখিরাও রৌদ্রের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পাখিটার অদর্শন বন্ধুবিচ্ছেদের মতই বাজল বুড়োর মনে। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে আবার মৎস্যবতারের ধ্যানে আত্মনিয়োগ করল। "ভাই আর কেন যাতনা দাও? তুমি তো মরবেই, আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে না মারলে কি তোমার চলবে না? তোমার মত বিশাল কলেবর যে মাছের, তার অন্তরও তো বিশাল হওয়া উচিত! তুচ্ছ প্রতিহিংসার বশে তুমি আমার মৃত্যু ঘটাবে, এমনটা মনে করতেও যে দুঃখ হচ্ছে আমার!"

এ দিনটাও তো কেটে যায় বুঝি! মৎস্যরাজের পরাজয় মেনে নেওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। গতি তার একটু শ্লথ হয়েছে, তা বোঝা যায়। সমস্ত সুতো ফুরিয়েছে, আগের মত তীব্র গতি তার থাকলে সে সুতো কেটে বেরিয়ে যেত। তা নেই বলেই ধীরে ধীরে সে সাঁতার দিয়ে চলেছে, নৌকোখানাকে পিছনে টানতে টানতে। অত বড় বোঝাটা টেনে নিয়ে যাওয়াতেও পরিশ্রম আছে, ফলে মহামৎস্যও অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

ভেসে সে উঠবেই। শুধু প্রশ্ন এই—কতক্ষণে উঠবে। আজ দিনের ভেতর কি? আশা হয় না সান্তিয়াগোর। সূর্য তো পশ্চিমে ঢলেছে আবার। বন্দর ছেড়ে বেরুবার পর এই দ্বিতীয় দিনটাও কাবার হতে চলেছে।

তা চলুক। ওর জন্য চিন্তা করবার লোক ম্যানোলিন ছাড়া কেউ নেই। সে কথা ভাবছে না সান্তিয়াগো, ভাবছে সে এখন খাবে কী? কাল তো ভাঙ্গন মাছটা খেয়েছিল, আজ কী খাবে? রাত্রে কিছু উদরে না গেলে সে তো আর এই মহামৎস্যের সঙ্গে যুঝতে পারবে না! খাড়া হয়ে বসতেই পারবে না নৌকোতে।

বিকেলের দিকে খাবার জুটল। এখন মাত্র দুটো বঁড়শিই জলে আছে। একটাতে শিকার গেঁথে আছে, অন্যটা খালি। এইবারে সেইটা খেলো এক বোকা মাছ। খুব ছোট নয় মাছটা, পাউন্ড দশেকের মতই হবে। ভাঙ্গন বা কোন সুস্বাদু মাছ নয়, মহাসাগরের জলে যে হাজার রকমের অখাদ্য কুশ্রী মাছ কিলবিল করছে, তাদেরই একটা। অ্যালবাকোর বলে একে। জেলেরা এ মাছ দিয়ে টোপ তৈরি করে সাধারণতঃ। তা হোক, কাঁচা খাওয়া যার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, সে কি আর মাছের জাতিগোত্র বিচার করে মন খারাপ করবে?

রাত্রি হল, মৎস্যরাজ তখনও সমানে ছুটছে। এ রাত্রিও তো কেটে যাবে তাহলে। মাছটা ফালি করে ফেলতেই ওর পেটের ভেতরে দুটো আস্ত উড়ুক্কু মাছ দেখতে পাওয়া গেল। মাছের ভেতর উড়ুক্কু মাছই সান্তিয়াগোর প্রিয়। সে একটাকে খেয়ে ফেলল তক্ষুনি। বড় মাছটার দু এক ফালিও খেয়ে নিল কোনরকমে। কালকের মত সহজে গিলতে পারছে না আজ। নুনের অভাবে কষ্ট হচ্ছে রীতিমত। নিজের বোকামিকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছে। দিনের বেলায় যদি সমুদ্রের জল খানিকটা নৌকোর ভেতরে পাতলা করে ছড়িয়ে রাখত, রোদ্দুরে শুকিয়ে নুন হয়ে থাকত এতক্ষণ।

করা হয় নি তা। আপসোস করে আর কী বা হবে!

বোতল থেকে একটু জল খেল সান্তিয়াগো। পিপাসা মিটিয়ে খেতে হলে বোতল এক্ষুণি খালি হয়ে যাবে। তা আর কী করে করা যায়? কালও যদি এই নৌকোয় কাটাতে হয়? জল একটু সম্বল রাখা দরকার যে!

আজও রাতে দু ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল। আজ তেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারছে না। শিকার দুর্বল হয়ে পড়েছে। কখন ভেসে ওঠে ঠিক নেই। হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

চোখ বুজে বসে সে মানত করছে মনে মনে—"হে পিতা" প্রার্থনাটা দশ বার আওড়াবে সে। আর "হে মাতা মেরী"টাও দশ বার। এখন নয়। ঘুমটা আসছে, প্রার্থনা করতে বসলে হয়তো ছুটে যাবে, আর হয়তো আসবে না। অথচ ঘুমোনো একান্তই দরকার—

ঘুম ভেঙে যায় বার বার। মন যার অস্থির, সে আর কতক্ষণ একটানা ঘুমোতে পারে? বার বার জেগে ওঠে, বার বার তাকায় সমুদ্রের জলের দিকে। নক্ষত্রের আলোতে ঝিকমিক করছে নীল জল। একটা লম্বা সরলরেখা যেন জাগছে জলের বুকে। মাছটা চলে যাচ্ছে, তারই চিহ্ন। খুব গভীরে আর নেই ও। অল্প নীচে দিয়েই ছুটছে। অবসাদের চিহ্ন ওটা।

রাত্রি প্রভাত হল। একটা প্লেন চলেছে আকাশপথে। এই প্রথম মানুষের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল তিন দিনের ভেতর। যত দূরেই হোক, মানুষ আছে ওই প্লেনে। দুনিয়ায় সান্তিয়াগোই একমাত্র মানুষ নয়, এটা ভাবতেও ভাল লাগে।

বেলা বেড়ে ওঠে। রোদ্দুরে পচে ওঠে অ্যালবাকের মাছটা। ওর একটা ছোট ফালিই তো কাল খেতে পেরেছিল বুড়ো। বাকীটা আর কোন কাজে লাগল না। তুলে ফেলে দিল জলে। উড়ুক্কু মাছটা রইল। ছায়াতে রেখে দিল, যদি প্রয়োজন হয়, খাবে। হবেও হয়ত প্রয়োজন। রাত্রি আসবার আগেই হয়ত ক্ষিধে পাবে আজ। কাল তো পেট ভরে নি!

বেলা দুপুর কেটে গেল। সূর্য পশ্চিমে ঢলল। বন্দর থেকে বেরুবার পর এই তৃতীয়বার সূর্যাস্ত দেখছে সান্তিয়াগো। না জানি ছেলেটা কত ভাবছে। ওই ম্যানোলিন। হাঁ, ম্যানোলিন ছেলে ভাল। বুড়োটাকে ভালবাসে। যদিও কোন কারণ নেই ভালবাসার।

সন্ধ্যার একটু আগে মাছ ভাসল। বুকের ভেতরটা ধুকধুক করে উঠল সান্তিয়াগোর। এইবার! এবার আর ভুচ্ করে ডুব মারবে না ও। এবারকার ভাসাই শেষবারের ভাসা। এইবার ওকে তুলতে হবে।

কিন্তু ভেসে উঠলেও মাছ বহু দূরে। বল্লমের নাগালের অনেক বাইরে। দেরি করতে হবে। ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি।

মাছটা ধীরে ধীরে চক্কোর দিচ্ছে নৌকোটা ঘিরে ঘিরে। কী ভাবছে প্রাণীটা কে জানে! কী বিশাল কলেবরখানি! এত বড় মাছ আগে কখনও দেখে নি সান্তিয়াগো। নাম শুনেছে টাইবুরনের। এ সেই টাইবুরন বোধ হয়। সান্তিয়াগো আগে কখনও টাইবুরন দেখে নি। খেতে নাকি খুব চমৎকার। এ মাছ বাজারে নিয়ে ফেলতে পারলে ওকে আর পায় কে! রাতারাতি বড়মানুষ হয়ে যাবে সে।

মাছ ঘুরছে নৌকোর চারিপাশে। চক্কোর ছোট হয়ে আসছে ক্রমশঃ। সান্তিয়াগো নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। নৌকো স্থির হয়ে আছে, কারণ স্রোত নেই। দাঁড়ও চলছে না, মাছেও টানছে না। নৌকো স্থির হয়ে রয়েছে, কিন্তু তবু সান্তিয়াগো সোজা দাঁড়াতে পারছে কই? পা টলে যায়। এক একবার চোখের সামনে ধোঁয়া দেখে শুধু।

এইবার ঠিক বিঁধে ফেলা যাবে ওকে। বল্লম তুলেছে সান্তিয়াগো। যাঃ, দূরে চলে গেল আবার। তা যাক, ওই আবার আসছে ঘুরে। এবার নিশ্চয়—নাঃ, এবারও গেল ফসকে। এদিকে ও আর দাঁড়াতে পারছে না, পা থরথর করে কাঁপছে। ওই যে আসছে মাছটা। জোর করে নিজেকে খাড়া করে রেখেছে বেচারী। চোখে স্পষ্ট দেখছে না কিছু। অনেকটা আন্দাজের ওপরেই বল্লম ছুঁড়ল। তারপর বসে পড়ল কাঁপতে কাঁপতে।

দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসতেই দেখতে পেল নৌকোর সামনে নীল জল লাল হয়ে গিয়েছে একেবারে। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে মাছটার বুক থেকে। দু-একবার লেজটা উঠল আর পড়ল। তারপর, ধীরে ধীরে মহামৎস্য পাশ ফিরল। পাশ ফিরতে ফিরতে উলটে গেল একেবারে।

আবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সান্তিয়াগো। কী বিরাট মাছ! কী সুন্দর সুগঠিত অবয়ব! দু হাজার পাউন্ড নিশ্চয় হবে। সুতো ধরে টেনে টেনে ওকে নৌকোর পাশে নিয়ে এল। যা আন্দাজ করেছিল, তাই। লম্বায় নৌকোর চাইতেও দু তিন ফুট বেশী।

ঘাড়ে একটা, মাঝে একটা, লেজের ওপরে একটা তিন জায়গায় শক্ত সুতোর বাঁধন দিল মাছের সঙ্গে নৌকোর। একটা গোটা গোলাই খতম হয়ে গেল মাছ বাঁধতে। তা যাক, সুতোর গোলা কিনতে কতক্ষণ?

সন্ধ্যে হয়েছে। উড়ুক্কো মাছটা চিবিয়ে নিল সান্তিয়াগো। এক ঢোক জল খেলো বোতল থেকে। আরও একটু রয়েছে জল। থাকুক, এখনও অনেক পরিশ্রম সামনে। ফিরতে হবে দীর্ঘ পথ। হাওয়া উঠেছে। দাঁড়ও ধরবে ও। রাতটার মধ্যে সে পৌঁছুতে পারবে না হাভানায়?

আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দিক্‌ ঠিক করে নিল। তারপর পাল তুলে দিয়ে দাঁড় ধরে বসল। নৌকো তরতর করে ছুটতে লাগল। রাত থাকতেই সান্তিয়াগো পৌঁছুতে পারবে হয়তো। ভোরে উঠে জেলেরা যখন এই মাছ দেখবে—

কিন্তু ও কী?—হাঙ্গর!

বল্লমের ঘায়ে রক্ত বেরিয়েছে মাছের। সেই রক্তের গন্ধ পেয়ে হাঙ্গর পিছু নিয়েছে। বৃহৎ আকারের ম্যাকো হাঙ্গর। সে এসে মাছটার পেটে ঢু মারল। আর সেই মুহূর্তে বল্লম দিয়ে তাকে ঘা মারল সান্তিয়াগো। হাঙ্গর মরল বটে, কিন্তু মাছটার পেটে এত বড় একটা গর্ত করে দিয়ে গেল। অন্ততঃ চল্লিশ পাউন্ড মাংস কেটে নিয়েছে এক কামড়ে।

তারপর এল গ্যালানো হাঙ্গরেরা, আকারে ছোট, কিন্তু স্বভাবে বেশী হিংস্র। যতক্ষণ হাতে হাতিয়ার রইল, বুড়ো একা লড়তে থাকল সেই শত শত শত্রুর সাথে। তার বল্লম ভেঙে গেল ; ছুরি ভেঙে গেল, ভেঙে গেল দাঁড়খানা পর্যন্ত।

সেই ভাঙা দাঁড় দিয়ে নৌকো চালাচ্ছে সান্তিয়াগো, আর পালে পালে হাঙ্গর এসে ভোজ লাগিয়েছে তার শিকার-করা মহামৎস্যের দেহের ওপর। বুড়ো আর তাকাতে পারছে না মাছটার দিকে। মনে মনে শুধু বলছে—বাহির সমুদ্রে অতদূর চলে যাওয়া ঠিক হয় নি আমার। ধারে কাছে থাকলে এমন দুশমনের পাল্লায় পড়তে হত না।

হাভানার কূলে এসে নৌকো যখন লাগলো তখন দু হাজার পাউন্ড মাছটার মাথা আর কঙ্কাল অবশিষ্ট আছে শুধু। এক আউন্স মাংস কঙ্কালে কোথাও লেগে নেই।

ম্যানোলিন ভোর রাত্রে দেখতে এল—বুড়ো ফিরেছে কিনা। রোজই ভোরে সে আসে। আজ এসে দেখল সে ঘুমোচ্ছে। ছুটে চলে গেল হোটেল থেকে খাবার আর কফি আনতে। কে জানে বুড়োটা এ-ক'দিন কী খেয়েছে।

হোটেলে একটা কোলাহল সেই ভোর রাত্রেই। ভাল করে কথাটা বোঝবার জন্য ম্যানোলিন অপেক্ষা করল না, ছুটে গেল উপকূলে। সেখানে দেখল দু হাজারী টাইবুরনের কঙ্কাল—সান্তিয়াগোর নৌকোয় বাঁধা।

খাবার নিয়ে সান্তিয়াগোর কাছে ফিরে গিয়ে সে বলল—"আবার আমি তোমার সাথে বেরুবো কাল থেকে। বেরুবোই।"

সান্তিয়াগো করুণ হাসি হেসে বলল—"কিন্তু আমি যে অপয়া!"

● লেখক পরিচিতি



আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় প্রদেশে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জন্ম হয়। সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করে গিয়েছেন নতুন মহাদেশে। জীবনের জটিলতা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতনতা, আবেগের সংগে সম্পর্ক না রেখে প্রাঞ্জল তীক্ষ্ম ভাষায় বাস্তবের নিঃসংকোচ উদ্‌ঘাটন, এই হল তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য।

এই বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে জোরালো অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর আশ্চর্য রচনা "দ্য ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দ্য সী"র ভেতরে। এটি যে বড় গল্প, না ছোট গল্প, না উপন্যাস, আকারের দিক্ দিয়ে বিচার করে সেকথা বলা খুবই শক্ত। কোন গল্প এত বড় হয় না, কোন উপন্যাসও কেউ লেখে না এত ক্ষুদ্র কলেবরে। কিন্তু সংজ্ঞানির্দেশে যত অসুবিধাই হোক, বইখানির আকর্ষণ দুর্দমনীয়। এর প্রত্যেকটা লাইন একটা আলোর ঝলক, এর প্রত্যেকটা শব্দ একটা বুলেট। রসভঙ্গ বা অঙ্গহানি না করে এর কোথাও এতটুকু পরিবর্তন করাও যে-কোন সাহিত্যিকের পক্ষে অসম্ভব। "আদর্শস্থানীয় আধুনিক রচনা"—এই স্বীকৃতি দিয়েই নোবেল কমিটি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হেমিংওয়েকে এই বইয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করেন।

কাহিনীটি তিনটি মাত্র প্রাণীকে নিয়ে—এক বৃদ্ধ, এক বালক আর একটা অতিকায় মৎস্য। ঘটনাস্থল হাভানা উপকূলের অদূরবর্তী উপসাগরীয় স্রোত। প্রকৃতপক্ষে বিয়োগান্ত হলেও, কাহিনীটির অবসানে পাঠকের অন্তর এক অনবদ্য সৌন্দর্যবোধের প্লাবনে অভিষিক্ত হয়ে থাকে, দুঃখের অনুভূতি সেখানে জেগে ওঠার অবকাশ পায় না।

হেমিংওয়ের অন্যান্য গ্রন্থ হল—'ইন্ আওয়ার টাইম্', 'ফিয়েস্তা', 'মেন্ উইদাউট্ উইমেন্', 'এ ফেয়ার্ ওয়েল্ টু আর্ম্‌স্', 'দ্য সান অল্‌সো রাইজেস্', 'ডেথ ইন দ্য আফটার-ইন্‌টু দ্য ট্রীজ, দ্য ফিফথ কলাম অ্যাণ্ড দ্য ফার্স্ট ফর্টি-নাইন ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যে হেমিংওয়ে অন্যতম কালজয়ী রসস্রষ্টা। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।



দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড

সেদিন সন্ধ্যায় জুলজিক্যাল সোসাইটির বিস্তীর্ণ হল লোকে লোকারণ্য। প্রাণিতত্ত্বের গবেষণায় যাঁরা সবচেয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন লণ্ডন শহরে, সবাই তাঁরা উপস্থিত এখানে। পেছনের আসনগুলি দখল করে বসেছে বিজ্ঞানের ছাত্রেরা, তারা যে সবাই বক্তৃতা শুনে জ্ঞানলাভের আগ্রহ নিয়েই এসেছে, তা নয়। হইচই গোলমাল রঙ্গ তামাসা—এই সবের দিকেই তাদের অনেকের ঝোঁক।

বক্তৃতা করছেন অধ্যাপক ওয়ালড্রন। যেমন বিরাট বপু, তেমনি দরাজ গলা। সৃষ্টিতত্ত্বের একটা বিশদ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ভদ্রলোক। ভাষা তাঁর খুবই জোরালো, মাঝে মাঝে আবার কাব্য-ঘেঁষা। "সে বিশ্বগোলক—জ্বলন্ত বাষ্পের সেই অন্তহীন ঘূর্ণী, উল্কার বেগে অতিক্রম করে যাচ্ছে দিক্‌চিহ্নহীন মহাশূন্য। ছুটতে ছুটতেই সেই বাষ্প ঘনীভূত হচ্ছে, সংহত হচ্ছে, তিলে তিলে শীতল হয়ে আসছে, এখানে ওখানে জেগে উঠছে কুণ্ডন, নাম যার পাহাড় ; এখানে ওখানে দেখা দিচ্ছে তরলিত বাষ্প, নাম যার জল—ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে বিশ্বজোড়া বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ—যার ওপর অভিনীত হবে অনাগত জীবপ্রবাহের জীবননাট্য।"

এর পরই বলতে হত—কীভাবে জীবনের সূত্রপাত হল পৃথিবীতে। বুদ্ধিমান্ ওয়ালড্রন সে জটিল তত্ত্বের ভেতর গভীর ভাবে প্রবেশ করতে চান না। কারণ সমস্যাটির এখনও মীমাংসা হয় নি, নানা মুনির নানা মত নিয়ে এখনও ও-সম্বন্ধে বিতর্কের অন্ত নেই। কেউ বলেন—প্রাণের

বীজ অন্তর্নিহিতই ছিল আদিম বাষ্পকুহেলির ভেতরে। কিন্তু তা কি সম্ভব? সেই জ্বলন্ত গোলকের অনন্ত দাহন সহ্য করেও কি বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল কোনও প্রাণবীজাণুর পক্ষে?

তা যদি না থেকে থাকে, তবে অনুমান করা যেতে পারে যে বিশ্বগোলকের দাহ প্রশমিত হওয়ার পরে প্রাণবীজ বাইরেকার কোনখান থেকে এখানে এসে পড়েছে। কিন্তু বাইরেকার সেই স্থানটি কোথায়? কোন উল্কাপিন্ড কি? অসম্ভব নয়। কিন্তু অসম্ভব নয় বলেই কি সমাধান বলে একে মেনে নিতে হবে? বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি অত সহজলভ্য নয়।

এইজন্যই সেরা বিজ্ঞানীরা জীবসৃষ্টির আদি পর্যায় সম্বন্ধে চিরদিনই নীরব। অন্ততঃ আদি পর্যায়ের প্রথম স্তর সম্বন্ধে। দ্বিতীয় স্তরে অবশ্য দেখা যায় বিশ্বগোলকের পিঠে পিঠে সমুদ্র সব শুকিয়ে আসছে। বিশাল সব বালুচড়া জেগে উঠছে তাদের বুকে। সেই চড়ার কোলে কোলে, কিংবা চারিদিকে চড়া-দিয়ে-ঘেরা সামুদ্রিক হ্রদগুলির পঙ্কিল জলে কিলিবিলি করছে ছোট ছোট নোংরা কীট।

যুগে যুগে সেই ছোট প্রাণীরা ধীরে ধীরে আকার পালটে আয়তনে বড় হয়ে ওঠে। নতুন পৃথিবীর বুকে অফুরন্ত খাদ্য, খেয়ে খেয়ে অতিকায় দানবে পরিণত হয় কেউ কেউ—

ওয়ালড্রন গুরুগর্জনে সভাস্থল প্রকম্পিত করে ঘোষণা করেন—"এইভাবেই সেই বীভৎস মহারাক্ষসগুলোর আবির্ভাব হয় পৃথিবীতে, যাদের এক কথায় আমরা বলি সৌরীয় জীব। উইল্-ডেন বা সোলেন হফেনের কালো পাহাড়ের স্তরে স্তরে এখনও তাদের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে, দেখে আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠি—ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই এই ভেবে যে পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের ঢের, ঢের আগে ওই সৌরীয় রাক্ষসেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এখান থেকে।"

"ভু-উ-ল"—বক্তৃতামঞ্চের ওদিক থেকে গর্জে উঠল একটা দীর্ঘায়িত সমুচ্চ কণ্ঠস্বর।

এই অপ্রত্যাশিত বাধা, এই অশিষ্ট প্রতিবাদ শুনে ওয়ালড্রন এক মুহূর্ত হতবুদ্ধি, স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সৌরীয় রাক্ষসেরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে মানুষের জন্মের ঢের আগে, এ-কথার ভেতরে ভুল আছে কোন্‌খানে? প্রতিবাদকারী নিশ্চয় বক্তার কথাটা বুঝতে পারে নি। তাই ওয়ালড্রন টেনে টেনে আবার সেই একই কথার আবৃত্তি করলেন—যেন তাকে বোঝাবার জন্যই—"মানুষের আবির্ভাবের ঢের আগে ওই রাক্ষুসে জন্তুরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে পৃথিবী থেকে।"

আবার সেই কণ্ঠস্বর—আগের চাইতেও জোরালো, আগের চাইতেও দীর্ঘায়িত—"ভু-উ-উ—ল!"

অধ্যাপক ওয়ালড্রন, সভাপতি মারে এবং সমাগত শ্রোতাদের হাজার জোড়া চক্ষু মঞ্চের সেই বিশেষ কোণটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এইবার—"ওঃ! অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার? তাই বলুন!"

মন্তব্যটা ওয়ালড্রনের। এমন সুরে মন্তব্যটি ছুড়ে মারলেন ভদ্রলোক—যেন চ্যালেঞ্জারের প্রতিবাদে কোনরকম গুরুত্ব আরোপ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না, যেন চ্যালেঞ্জারকে ইতিপূর্বেই বিশ্বজগতের সবাই পাগল বলেই জেনে ফেলেছে—পাগল বা তার চেয়েও খারাপ কিছু অর্থাৎ প্রবঞ্চক।

সত্য কথা বলতে হলে এটা না বলে উপায় নেই যে ওয়ালড্রন ছাড়াও আরও অনেক পণ্ডিত লোক এইরকমই বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে। কারণ? কারণ আছে বইকি!

বছর দুই আগে চ্যালেঞ্জার গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। মহানদ আমাজনের জলে প্রথমে স্টীমার, পরে নৌকো ভাসিয়ে কয়েক হাজার মাইল তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, কয়েকটি মাত্র ওই অঞ্চলের আদিবাসী লাল-চামড়া ইণ্ডিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে।

ফিরে এলেন চ্যালেঞ্জার এক অতি আজগুবি গল্প মুখে নিয়ে। তিনি নাকি হাজার মাইল-ব্যাপী অরণ্যরাজ্য অতিক্রম করে এক ঊষর মহাকান্তারে উপনীত হন, এবং সেই মহাকান্তারের শেষ সীমায় দেখতে পান এক পাহাড়ঘেরা উপত্যকা, যার ভেতরে প্রবেশ করবার কোন পথ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি।

প্রবেশ করতে না পারুন, পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তিনি নাকি এমন এক আশ্চর্য মহা-বিহঙ্গকে দেখতে পেয়েছিলেন, যা আদিম পৃথিবীর সৌরীয় যুগের সেই টেরোড্যাকটাইল না হয়ে যায় না। এ পাখি যখন আকাশে ওড়ে—দুখানা ডানার বিস্তার দাঁড়ায় বিশ ফুট। গায়ে পালক নেই একটিও, ছাই-রঙা চামড়া দূর থেকে দেখায় যেন একখানা নোংরা গয়ের চাদর।

ঠোঁট আছে—ঠিক কুঠারের মত শক্ত আর ধারাল। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, সেই ঠোঁটের ভেতরে দু পাটি বড় বড় ধারাল দাঁত বর্তমান। পাখির আবার দাঁত?

এই টেরোড্যাকটাইলকে চ্যালেঞ্জার নাকি নিজের চোখেই দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস, সৌরীয় যুগের আরও আরও জন্তুদানব—যারা নাকি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা—এখনও বিচরণ করছে ওই পাহাড়-ঘেরা উপত্যকার ভেতরে। তিনি তাদের দেখেন নি।

কিন্তু দেখেছে আর একজন। মেপল হোয়াইট নামে এক মার্কিন ভদ্রলোক চ্যালেঞ্জারেরও আগে ওই অঞ্চলে গিয়েছিলেন, ক্লোভার নামে একটি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। ক্লোভারকে তিনি দেখেন নি, কিন্তু হোয়াইটকে দেখেছেন। অর্থাৎ জীবিত হোয়াইটকে না দেখলেও, মৃত হোয়াইটকে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল অরণ্য-অঞ্চলের এক গ্রামে।

মৃতদেহের পকেটে একখানা ডায়েরি ছিল, তাতে আঁকা ছিল এক বীভৎস মহাজন্তুর ছবি। আদিম যুগের ডাইনোসরদের যে বর্ণনা বিজ্ঞানীরা দিয়ে থাকেন, এই ছবির সঙ্গে সে বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। হোয়াইট যদি কোন ডাইনোসরকে চোখে না দেখে থাকবে, তবে দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে বসে এ-ছবি আঁকতে গেল কেন?

জন্তুটার ছবির পাশে একটা গাছ আঁকা আছে, আঁকা আছে একটা মানুষও। মানুষটার পোশাক দেখে ইওরোপীয় বলেই মনে হয়। সুতরাং সে অবশ্যই ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা। সে অনুপাতে গাছটাকে ধরতে হবে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু, এবং ওই জন্তুটাকে অন্ততঃ আশি ফুট। উচ্চতা এবং গঠন দুদিক থেকেই এটা ডাইনোসরের অনুরূপ।

দেশে ফিরে এসে চ্যালেঞ্জার টেরোড্যাকটাইল এবং ডাইনোসরের গল্প শোনালেন যখন, দেশময় উঠল একটা হাসির অট্টরোল। সেই আদিম পৃথিবীর রাক্ষুসে জন্তু-জানোয়ারেরা এখনও বেঁচে আছে কোন কোন দেশে, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাঁদের বেঁচে থাকবার মত প্রাকৃতিক অবস্থাই এখন পৃথিবীতে নেই।

টেরোড্যাকটাইলের একটা ফটো তুলতে পেরেছিলেন চ্যালেঞ্জার, কিন্তু নদীতে নৌকাডুবির ফলে ফটোখানা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু সেই ফটোই লোককে দেখালেন চ্যালেঞ্জার। মেপল হোয়াইটের আঁকা ডাইনোসরের ছবিও দেখালেন। হাসির ঝড় তাতে থামল না। অবিশ্বাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এই সবই মাত্র ভাগ্যে জুটল অভাগা চ্যালেঞ্জারের।

কাজেই, সেই চ্যালেঞ্জারের প্রতিবাদকে আজ কেন গুরুত্ব দেবেন ওয়ালড্রন?

* * *

সভা আর জমল না তার পরে। ওয়ালড্রন তাড়াতাড়ি করে শেষ করলেন বক্তৃতা। তারপর উঠলেন চ্যালেঞ্জার। সভাপতিকে ও বক্তাকে ধন্যবাদ দেবার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত রয়েছে আগে থেকে।

বিজ্ঞানের ছাত্রেরা আগে থেকেই হট্টগোল শুরু করেছিল, চ্যালেঞ্জারকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা রীতিমত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। হোন না চ্যালেঞ্জার প্রাণিবিজ্ঞানে বিখ্যাত পণ্ডিত, তাঁর সমকক্ষ বিজ্ঞানীরা যখন তাঁকে একবাক্যে প্রতারক বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তখন ছাত্রদের কী দায় তাঁকে সম্মান দেখাবার? পেছনের বেঞ্চি থেকে বেড়াল-ডাক শোনা যেতে লাগল, পাকানো কাগজের গুলি ছুটে আসতে লাগল বক্তৃতামঞ্চ লক্ষ্য করে, অবশ্য চ্যালেঞ্জারের গায়ে লাগল না সেগুলো, গায়ে লাগাবার জন্য নিক্ষেপ করাও হয় নি তা।

চেহারাটিও ভদ্রলোকের এমনি বিটকেল, দেখে মানুষের হাসিই পায় শ্রদ্ধা হওয়ার বদলে। মাথাটি আশ্চর্য রকমের প্রকাণ্ড, কপাল সেই আন্দাজে চওড়া। ঘাড় পর্যন্ত নামানো কালো চুল আর নাভি পর্যন্ত নামানো কালো দাড়ি! কাঁধ আর বুক এমন প্রশস্ত পরিপুষ্ট যে দেখলে লোকটিকে হারকিউলিসের মতই বলবান মনে হবে।

কিন্তু দেহের ওপরদিকটার তুলনায় নিম্নার্ধ বেমানান রকমের খর্ব ও কৃশ। বসে থাকলে তাঁকে যে-রকম জমকালো মানুষ মনে হয়, উঠে দাঁড়ালে মনে হয় তেমনি হাস্যকর জীব। কিন্তু এ ত্রুটিরও ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে প্রকৃতি অন্যভাবে। কণ্ঠস্বরটি দিয়েছে গুরুগম্ভীর। বক্তৃতা যখন দেন, তখন যেন মেঘের গর্জন শোনা যায়।

সেই মেঘের গর্জন আজ শুরু হল দু চারটি মামুলী কথা দিয়ে। "ধন্যবাদ! সভাপতিকে, বক্তা ওয়ালড্রনকে, সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে। এমন কি দায়িত্ববোধহীন শালীনতাজ্ঞানবর্জিত

ছাত্রবৃন্দকেও।" (এইখানে পিছনের বেঞ্চি থেকে দশ বিশটা বেড়াল একসাথে ঐকতানে ডেকে উঠল।)

তারপরই চ্যালেঞ্জার বলতে শুরু করলেন—"মাননীয় বন্ধু ওয়ালড্রনের বক্তৃতাকালে আমি দু দুবার তাঁর মতামতকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কি করব, বন্ধুবাৎসল্যের জন্য তো আর সত্যের মর্যাদা নষ্ট হতে দিতে পারি না! ওয়ালড্রন বলেছেন—প্রাগৈতিহাসিক সৌরীয় মহাজন্তুরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এটি যে ও'র একারই মত, তা নয়। আমি ছাড়া সভ্য পৃথিবীর সব পন্ডিতেরই এই মত।

"কিন্তু সবাই মিলে যদি একই ভুল করা হয় কোন বিষয়ে, ভ্রান্তদের সংখ্যাবাহুল্যের দরুন সে-ভুল নির্ভুল হয়ে যায় না। ওঁরা সবাই একবাক্যে 'সৌরীয় জীবেরা নেই, নেই' করে চিৎকার করতে থাকলেও, সশরীরে পৃথিবীতে বিচরণশীল সেই জন্তু-দানবেরা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না, যেখানে আছে, সেইখানেই বর্তমান থাকবে বহাল-তবিয়তে।"

এরপর আর সভায় শান্তি রক্ষা করার কোন উপায় রইল না। ছাত্রেরা হাজার কণ্ঠে হইহই করতে লাগল। পন্ড হল চ্যালেঞ্জারের বক্তৃতা। কিন্তু বক্তৃতা বন্ধ হলেও পন্ডিতজনদের বিতর্ক বন্ধ হল না। চ্যালেঞ্জার যখন কোনমতেই তাঁর বক্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে রাজী নন, সৌরীয় জীব যে পৃথিবীতে এখনও আছে—এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় ঘোষণা যখন দীর্ঘদিনেও একটুও দুর্বল হয় নি, তখন এ কলহের একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করলেন সবাই।

চ্যালেঞ্জার বলছেন—নিজে তিনি সৌরীয় জন্তুদের দেখেছেন। বেশ, তাহলে তিনি বলে দিন কোথায় গেলে সেই জন্তুদের দেখা যাবে! সভায় উপস্থিত পন্ডিতমন্ডলী তাঁদের দু একজন প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেবেন সেই দেশে। তাঁরা দেখে এসে যখন বলবেন যে, চ্যালেঞ্জারের কথাই ঠিক, সৌরীয়েরা দুনিয়া থেকে লোপ পেয়ে যায় নি, সব বাদানুবাদের অবসান হবে তখন, এতকালের প্রচলিত ধারণাকে সবাই ভুল বলে স্বীকার করে নেবেন।

চ্যালেঞ্জার সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। প্রতিনিধি নির্বাচিত হোক, তাঁদের যাত্রার দিনে তিনি পথের নির্দেশ দিয়ে দেবেন।

* * *

ওই সভাতেই প্রতিনিধি নির্বাচন সমাধা হয়ে গেল। শারীরবিদ্যায় বিখ্যাত অধ্যাপক সামার্লি যাবেন বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে, আর সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিরূপে যাবেন 'ডেইলী গেজেট'-এর রিপোর্টার এডওয়ার্ড ডান ম্যালোন।

ও-দলে আরও একজনকে নিতে হল, তিনি হলেন বিখ্যাত শিকারী লর্ড জন রক্সটন। ইনি দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েকবারই গিয়েছেন। ইনি স্থানীয় আদিবাসীদের সমাজে বিশেষ পরিচিত এবং সাহসে শৌর্যে অদ্বিতীয়।

অভিযাত্রীদের যাওয়া স্থির হল বুথ কোম্পানির পরবর্তী জাহাজেই। অতলান্তিক পার হয়ে ব্রাজিলের পারা বন্দরে নামবেন এ'রা। পারা থেকে স্টীল-লঞ্চ নিতে হবে আমাজনের উজানে যাওয়ার জন্য।

যাত্রার মুহূর্তে চ্যালেঞ্জার এ'দের হাতে দিলেন একখানা আঁটা খাম। বললেন—"পথের নির্দেশ রইল এই খামের ভেতরে। আপনারা কিন্তু কোনমতেই এখন এ-খাম খুলবেন না। খামের ওপর তারিখ এবং সময় লেখা আছে, দেখুন। আমাজনের কূলে ম্যানাওজ শহরে পেঁছে, ওই তারিখে, ওই সময়ে খাম খুলবেন। আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে, এই বিশ্বাসেই আমি খামখানি আপনাদের হাতে দিলাম।"

২

ম্যানাওজ পেঁছে অভিযাত্রীরা আতিথ্যগ্রহণ করলেন মিস্টার শর্টম্যানের। ইনি ইঙ্গ-ব্রাজিল ট্রেডিং কোম্পানির স্থানীয় কর্মাধ্যক্ষ। তাঁর বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় বসে লর্ড জন আর মিস্টার ম্যালোন খোশগল্প করেন, আর অধ্যাপক সামার্লি ছেষট্টি বছর বয়স সত্ত্বেও পতঙ্গ ধরবার জাল হাতে নিয়ে আর ছররা-বন্দুক বগলে করে বনে বনে ঘুরে বেড়ান—নতুন নতুন জাতের প্রজাপতি ধরবার জন্য।

ম্যালোন দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্ছেন যে লর্ড জনের অসীম প্রতিপত্তি এদিককার আদিবাসী-দের ভেতরে। ওরা ও'কে ডাকে 'লাল সর্দার' বলে। উনি নাকি এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন বাস করে গিয়েছেন এক সময়ে। দাস-ব্যবসায়ীদের কবল থেকে স্থানীয় লোকদের উদ্ধার করবার জন্য নিজের খরচায় উনি নাকি রীতিমত লড়াই চালিয়েছেন।

আমাজন মহারণ্যের অজানা অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার জন্য সঙ্গী সাথী মুটে মজুর সংগ্রহ করা সাধারণ অবস্থাতেই খুব শক্ত, কিন্তু লর্ড জনের এমনি খাতির যে তাঁর নাম শুনেই দলে দলে লোক এসে জুটল সঙ্গে যাওয়ার জন্য। মাত্র বারো জন লোক বেছে নিলেন লর্ড জন। এর মধ্যে কেউ নিগ্রো, কেউ ইন্ডিয়ান, কেউ-বা সংকরজাতীয়।

খামের ওপরে যে-তারিখ লিখে দিয়েছেন চ্যালেঞ্জার, তা আসতে এখনও এক হপ্তা বাকী। তবু ধৈর্য ধরে বসে থাকা ছাড়া ও'দের আর কিছু করবার নেই। ও'রা কথা দিয়েছেন যে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা খাম খুলবেন। সে-কথার খেলাপ করা যায় না।

অবশেষে সে-দিন এল। বারান্দায় একটা টেবিল ঘিরে তিনজন বসেছেন। টেবিলের ওপর সেই খাম এবং একটা ঘড়ি। ঠিক বেলা বারোটায় খাম খোলার নির্দেশ আছে। এখনও বাকী আছে কয়েক মিনিট বারোটা বাজতে।

সামার্লি কোনদিনই দেখতে পারেন না চ্যালেঞ্জারকে। কারণ চ্যালেঞ্জার অতিমাত্রায় দাম্ভিক

এবং অসহিষ্ণু। অন্য বিজ্ঞানীদের তিনি মূর্খ বলেই মনে করেন, এবং মনের ধারণা গোপন করবার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করেন না। এই কারণেই তিনি সমধর্মী বিজ্ঞানীদের কাছে অপ্রিয়। আর তিনি অপ্রিয় বলেই তাঁর এই যে অভিনব মতবাদ—প্রাগৈতিহাসিক সৌরীয় জন্তুরা বিলুপ্ত হয় নি পৃথিবী থেকে—তা এমনভাবে ধিক্কৃত হয়েছে।

সামার্লি তো কথায় কথায় চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে 'প্রতারক, ধাপ্পাবাজ' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করে থাকেন। আজ খাম সামনে নিয়ে বসে বসে অধৈর্য হয়ে তিনি বলে উঠলেন—"খামের ভেতর নির্দেশ কী আছে, দেখা যাক। রীতিমত স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট পথের যদি উল্লেখ না থাকে, তাহলে আমি কিন্তু পত্রপাঠ পারায় গিয়ে ফিরতি জাহাজ ধরব। বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করার চাইতে দায়িত্বপূর্ণ অন্য কাজ অনেক আছে আমার।"

"সময় হয়েছে"—বলে লর্ড জন ছুরি দিয়ে খামের মুখ কেটে ফেললেন।

চার-ভাঁজ-করা একখানা সাদা কাগজ বেরুলো খাম থেকে। সাবধানে ভাঁজ খুলে ফেললেন লর্ড জন। একটা পরম বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। তাড়াতাড়ি কাগজটা উলটে ধরলেন। বিস্ময় আরও চরমে উঠল যেন—

"কী? কী? হল কী"—সমস্বরে প্রশ্ন সামার্লি আর ম্যালোনের।

"দু-পিঠই সাদা—" জবাব দিলেন লর্ড জন।

"সা-দা?"—সামার্লি আর ম্যালোন লাফিয়ে উঠলেন।

"একটা অক্ষরও লেখা নেই কোথাও—"

সামার্লি গর্জে উঠলেন—"ঠক! ধাপ্পাবাজ! আগাগোড়া সব মিথ্যে কথা ওর! অকারণে আমাদের আদ্ধেক পৃথিবী ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ালো। এ জোচ্চুরির সাজা—"

"আসতে পারি?"—মেঘ ডেকে উঠল যেন গুরুগুরু শব্দে, বারান্দার নীচে থেকে। এঁরা তিনজন চমকে উঠে তাকিয়ে দেখেন—সশরীরে চ্যালেঞ্জার হাজির।

"যে-দুর্গম জায়গায় যেতে হবে আপনাদের, কাগজে লিখে তার পথের নিশানা দেওয়া সম্ভব নয়। শত শত মাইল মহারণ্য, তাদের কোন নাম নেই। এ-নদী থেকে সে-নদী, সে-সব নদীর নামও ইণ্ডিয়ানেরা ছাড়া কেউ জানে না। কাজেই নিজেই আসতে বাধ্য হয়েছি।"—এই বলে চ্যালেঞ্জার আসন গ্রহণ করলেন।

* * *

প্রথমে স্টীমলঞ্চ, তারপরে দুটো নৌকো। এঁরা নিজেরা চারজন, আর অনুচর বারোজন। আটজন করে এক এক নৌকোয়। দুজন অধ্যাপক আলাদা আলাদা নৌকোতে, তা না হলে তর্ক

এবং কলহের কোলাহলে অন্য সবাইয়ের কান ঝালাপালা। তাছাড়া, মনিবদের যদি অনবরত ঝগড়া করতে দেখে, এই ইণ্ডিয়ান আর নিগ্রোগুলো শাসন মানবে না।

দু দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে—আকাশছোঁয়া সব মহীরুহ। তাদেব তলায় বনভূমি বেলা দুপুরেও গোধূলির আবছা আঁধারে সমাচ্ছন্ন। হিংস্র পশুও চোখে পড়ে না। কদাচিৎ দু একটা ভালুক ছাড়া।

মহারণ্যের বুক চিরে নদী চলে গিয়েছে এঁকে বেঁকে। জনপ্রাণীর দেখা নেই সে-সব নদীর বুকে। এই অভিযাত্রীরাই সেই সুদীর্ঘ জলপথের একমাত্র যাত্রী। কিন্তু চোখে না পড়লেও দূরে দূরে মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। ঢাক বাজে মাঝে মাঝে এদিক থেকে, ওদিক থেকে, নানা দিক থেকেই। এক সঙ্গে চারদিক থেকে বাজে না। এই উত্তরে বেজে উঠল চড়াংচড়াং শব্দে কয়েকটা তীক্ষ্ম বোল, তারপর উত্তরের বাজনা থেমে গিয়ে বেজে উঠল দক্ষিণে ঢাক। এ-যেন বাজনার ভেতর দিয়ে প্রশ্নোত্তর চলছে।

ইণ্ডিয়ানেরা ভয় পেয়েছে। নরমুণ্ডশিকারী ইণ্ডিয়ানেরা ওত পেতে আছে। অভিযাত্রীদের গতিবিধি তারা জানে। সংকেত চলছে উত্তর থেকে দক্ষিণে. পুব থেকে পশ্চিমে। রাত্রির আঁধারের সুযোগে একদিন তারা আক্রমণ করবেই। এ-এলাকা তাদের দেবতা কুরুপুরির খাসমহল। এখানে বিদেশীর প্রবেশ তারা সইবে না।

সে-রাত্রি মাঝনদীতে নোঙ্গর করে রইল দুখানা নৌকো। যাতে কূল থেকে হঠাৎ শত্রু এসে নৌকোয় চড়াও হতে না পারে। কিন্তু দেখা গেল—কোন উৎপাতই হল না। ঢাক বাজতেই থাকল সারা রাত। কিন্তু কুরুপুরির ভক্তেরা দর্শন দিল না কেউ।

পরদিন আবার নৌকো খুলে দেওয়া হল। বড় নদী থেকে মাঝারি নদী, মাঝারি থেকে ছোট নদী. হাজার মাইল অন্ততঃ উজিয়ে এসেছে যাত্রীরা। এখন নদীকে আর নদী বলা যায় না, একটা ক্ষীণস্রোতা নালা। মাঝে মাঝে নৌকো বেধে যাচ্ছে। জলে নেমে ঠেলতে হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জার মাঝে মাঝে পথের হদিস হারিয়ে ফেলছেন। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে তীরভূমি পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে। আগের বার এই পথ অতিক্রম করবার সময় যে সব দিকচিহ্ন লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন, সহজে তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অবশেষে এক জায়গায় এসে জলস্রোত জবাব দিল। সেখানে শুধু নলখাগড়ার বনে ভরতি—একটা অত্যন্ত অগভীর জলা। নৌকো নলের বনে লুকিয়ে রেখে যাত্রীরা এইবার পায়দলে চলতে শুরু করল। মালপত্র কিছু কিছু করে সবাইকে বহন করতে হচ্ছে। অবশ্য বেশির ভাগই অনুচর বারোজনের পিঠে। কিন্তু রাইফেল. ক্যামেরা বা ওই রকম অতিপ্রয়োজনীয় দামী জিনিস বিশ্বাস করে ওদের হাতে দেওয়া যায় না। নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। তা ছাড়া, সুযোগ পেলে মাল নিয়ে পালিয়ে যেতেও পারে ওরা। বড় লোভ ওদের রাইফেলের ওপরে।

নৌকো ছেড়ে দিয়ে ওরা পদব্রজে পথ চলছে। গতি মন্থর, কারণ অরণ্য নিবিড়, তার ভেতর দিয়ে পথ করে চলা শক্ত। প্রায় হপ্তাখানেক পার হয়ে গেলে অনুমান হল একশো কুড়ি মাইল আন্দাজ এসেছে ওরা। অরণ্য এখানে পাতলা, বড় বড় গাছের সংখ্যা কমে এসেছে। এখন চারদিকে শুধু ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ এক বিশাল প্রান্তর। ঠিক সমতল নয়, যেদিকে ওরা চলেছে, সেইদিকেই ক্রমশঃ উঁচু।

এই মহাপ্রান্তর পার হতে তিন চারদিন কেটে গেল। তারপর দেখা দিল এক দুর্গম বাঁশবন। কুড়াল দিয়ে বাঁশ কেটে কেটে তবে তার ভেতর দিয়ে রাস্তা করে এগুতে হচ্ছে। অথচ বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে ভারী ভারী জন্তুরা চলে বেড়াচ্ছে, তার শব্দও পাওয়া যায়।

ওদের হিসাবমত সেই বাঁশবনটা চল্লিশ মাইল গভীর। পার হয়ে এসে পেছন ফিরে দেখে—ডাইনে বাঁয়ে দিগন্ত পর্যন্ত সেটা ছড়িয়ে আছে, এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার রচনা করে।

আবার তেমনি সীমাহীন প্রান্তর, তেমনি সামনের দিকে ক্রমশঃ উঁচু। তবে এবারে বড় গাছ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, ছোট ঝোপঝাড়ও আগের চাইতে কম। সামনে চক্রবালরেখায় একটা গিরিশ্রেণী চোখে পড়ে, তার সানুদেশ খাড়া এবং ন্যাড়া, কিন্তু মাথায় দেখা যায় গভীর বনানী।

"ওই, ওই!"—চ্যালেঞ্জার উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন—"এসে গেছি আমরা। ওই পাহাড়েই আমাদের যেতে হবে।"

সামার্লি এখনও তেমনি সন্দিগ্ধ। বিদ্রূপের সুরে বললেন—"তবে আর কি, এসেই তো গেছি।"

"হ্যাঁ, এসে গেছি বটে"—চ্যালেঞ্জার তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিলেন—"তবে ও-পাহাড়ের ওপিঠে যাওয়ার কোন পথ সেবারে আমি খুঁজে পাই নি।"

"তবে সে সব সৌরীয় জীবদের দেখতে পেলেন কোথায়?"

"ওই পাহাড়ের মাথায়।"

কী আশ্চর্য! পাহাড়ের মাথায় আজও কী যেন দেখা যায় একটা? একটা অতিকায় পাখি?

বসেছিল পাখিটা। ধীরে ধীরে পাখা মেলে আকাশে উড়ল—আশ্চর্য! ও'রা অনুমান করলেন—ওর দুখানা ডানার বিস্তার বিশ ফুট হবে অন্ততঃ।

"ওই! ওই! দেখতে পেয়েছেন, সামার্লি?" চ্যালেঞ্জারের উত্তেজিত প্রশ্ন।

"দেখেছি বই কি! একটা বড়সড় সারস!"—বিদ্রূপের সুরে উত্তর দিলেন সামার্লি।

চ্যালেঞ্জারও উত্তর দিলেন তেমনি সুরে—"সারস? তা হতে পারে। তবে এ-জাতীয় সারসের গায়ে পালক নেই। আর মুখে দুপাটি দাঁত, বর্শার ফলার মত। আর ঠোঁট? তা দিয়ে এক ঠোকর মারলে আপনার মাথা ফুটো হয়ে, ওতে ঘিলু বলে কোন বস্তু যদি থাকে, তা চুইয়ে বেরিয়ে যাবে।"

পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ ওঁরা পেঁছোলেন সেই পাহাড়ের তলায়। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল, তাই ঠিক। পাহাড়টা প্রায় সর্বত্রই সমান খাড়া, গায়ে কোথাও একটি ঘাস নেই। কিন্তু মাথার ওপরে বড় বড় গাছ অনেক আছে। উঁচুতে অন্ততঃ হাজার ফুট হবে পাহাড়টা।

"এ পাহাড়ে ওঠা অসম্ভব"—সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন।

তবু চারদিক ঘুরে দেখে আসতে হবে। ওইখানেই তাঁবু ফেলা হল, রাতটা ওখানে কাটিয়ে, এবং অর্ধেক লোকজনকে ওইখানে রেখে অভিযাত্রীরা সকালে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন পাহাড়ের তলা দিয়ে। পূর্বদিকে অনেকটা নাকি চ্যালেঞ্জার ঘুরে এসেছিলেন আগের বারে, কোন পথ দেখতে পান নি।

পশ্চিম দিকে পাহাড়ের তলায় তলায় সবাই এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় দেখা গেল একটা চিহ্ন। সাদা খড়িমাটি দিয়ে একটা তীর আঁকা! তীরের মুখ পশ্চিম দিকে।

চ্যালেঞ্জার বললেন—"এ নিশ্চয় মেপল হোয়াইটের আঁকা তীর। সে এই পথ দিয়েই এগিয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে পাহাড়ের ওপিঠে ঢুকতে পেরেছিল, তা নইলে ডাইনোসরের ছবি সে আঁকল কী করে? আর ঢুকে যদি থাকে, তাহলে সে প্রবেশপথ এই দিকেই পাওয়া যাবে।"

সামার্লি সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়লেও অন্য সকলে আশান্বিত হয়ে উঠলেন এ-কথায়। দু মাইল আড়াই মাইল পরে পরে পাহাড়ের গায়ে ওইরকম তীর আঁকা, খড়ি দিয়ে। পথের নির্দেশ ছাড়া এ আর কিছুই হতে পারে না। মেপল হোয়াইট এই পথেই গিয়েছিল সন্দেহ নেই।

এক জায়গায় পাহাড়ের তলাতেই বাঁশঝাড়। কী আশ্চর্য! সবগুলি বাঁশেরই মাথায় বল্লমের ফলার মত একটা করে সরু ধারাল ডগা। এ-রকম একটা ব্যাপার কি প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া হতে পারে? তা যদি না হয়, স্বীকার করতেই হবে, এখানে মানুষ আছে।

ভাল করে লক্ষ্য করতেই মনুষ্য-কংকাল দেখতে পাওয়া গেল বাঁশঝাড়ের ভেতরে। কংকালের পাঁজরার ভেতর দিয়ে একটা বাঁশ ফুঁড়ে উঠেছে। কী বীভৎস কান্ড!

তার ওপর, কংকালের পায়ে এখনও সাহেবী বুট পরা রয়েছে। একটা চুরুটের বাক্স পড়ে আছে, তার ওপরে ইংরেজী হরফে "সী" লেখা। চ্যালেঞ্জার বললেন—"এ সেই অভাগা ক্লোভার, মেপল হোয়াইটের সংগী।"

চারদিকে একটা অশিব প্রভাব বাতাসে বিকীর্ণ হয়ে আছে যেন। সবাই ভয়ে ভয়ে চলছে।

অবশেষে বুঝি পথ পাওয়া গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে বুঝি ঝরনা নেমেছিল কোনদিন। এখন তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জলস্রোতের ঢালু পথটি রয়েছে। তা বেয়ে ওঠা যায়। আনন্দে উৎসাহে উঠতে লাগল সবাই সেই পথ বেয়ে। মাঝপথে গিয়ে সেই ঢালু পথ একটা গুহার ভেতর প্রবেশ করল। ভেতরে অন্ধকার।

মোমবাতি সঙ্গেই ছিল, তাই জ্বালিয়ে সবাই অগ্রসর হতে লাগল। গুহা ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসছে। একজন লোক কোনমতে গলে যেতে পারে।

কিন্তু, আর যাওয়া সম্ভব হল না। পথ বন্ধ। নিরেট পাথরের দেওয়াল খাড়া হয়ে আছে সামনে। মেপল হোয়াইট যে পথ দিয়ে পাহাড়ের ওপিঠে পৌঁছেছিল, সে-পথ আর নেই। মনে হয় ভূমিকম্পে পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে এখানে। পথ বন্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

এতখানি আশা ব্যর্থ হল। কিন্তু তবু অভিযাত্রীরা দমবার পাত্র নয়। ঝরনার পথ দিয়ে নেমে এসে তারা আবার পশ্চিম পানে এগুলো পাহাড়ের তলা দিয়ে দিয়ে। এদিকে আর তীর আঁকা নেই কোথাও। কেন থাকবে? হোয়াইট তো আর এদিকে আসে নি!

হোয়াইট আসে নি, কিন্তু এদের যেতেই হল। পথ ক্রমে দুর্গম। সামনে নোংরা জলা পাহাড়ের নীচেই। তাতে অসংখ্য বিষাক্ত সাপ। তারই ভেতর দিয়ে লোকগুলোকে অগ্রসর হতে হচ্ছে।

দু দিন ক্রমাগত চলবার পরে অভিযাত্রীরা ফিরে এল তাঁবুতে। পথ পাওয়া যায় নি। তারা যা দেখেছে—তা এই। পাহাড়টা চক্রাকারে ঘিরে আছে ভেতরের উপত্যকাকে। সর্বত্রই সে পাহাড় সমান দুরারোহ। পেরিয়ে ভেতরে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই।

তবে কি ফিরে যেতে হবে?

হতাশ অবসন্ন অভিযাত্রীরা সান্ধ্যভোজনে বসেছে বিকালবেলাতেই। একখানা চওড়া পাথরের ওপর খাদ্যগুলি সাজানো। লর্ড জন একটা শূকরছানা শিকার করেছিলেন, তাই ঝলসে নেওয়া হয়েছে খাবার জন্য।

লর্ড জন ছুরি দিয়ে কাটতে যাবেন মাংসটা, এমন সময়ে মাথার ওপর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। একটা বিশাল ছায়া! সাঁ-আ করে কী যেন উড়ে গেল, একটা উৎকট দুর্গন্ধ পেছনে রেখে। এক বিশাল পাখি। বিশ ফুট আকাশ ঢাকা পড়েছে তার দুটো পাখায়।

ঝলসানো শূকরছানা অদৃশ্য হয়েছে সামনে থেকে।

"টেরোড্যাকটাইল! টেরো—থুড়ি—" —চ্যালেঞ্জার হঠাৎ সংযত হয়ে গেলেন সামার্লির দিকে তাকিয়ে—"থুড়ি, সারস একটা।"

সামার্লির মুখখানা দেখবার মত। লজ্জা এবং বিস্ময় সমানভাবে ফুটে উঠেছে সেখানে। তিনি ধীরে ধীরে বললেন—"চ্যালেঞ্জার, তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি। টেরোড্যাকটাইলই বটে এটা, সারস নয়।"

চ্যালেঞ্জার হাত বাড়িয়ে সামার্লির করমর্দন করলেন। প্রথম কিস্তি তিনিই জিতেছেন। উদার হওয়া তাঁর পক্ষে সোজা।

লর্ড জন বললেন—"কিন্তু পাহাড়ে ওঠার উপায় কী?"

চ্যালেঞ্জার বললেন—"এক সময়ে আমি আল্পস পর্বতে উঠতাম। এরকম খাড়া পাহাড়ে আমি আগেও উঠেছি দড়ির সাহায্যে। আগের বারে আমি দড়ি সঙ্গে আনি নি। এবারে এনেছি। কাল সকালে আমরা চার জন অন্ততঃ পাহাড়ে উঠতে পারব।"

৩

পরের দিন সন্ধ্যার পরেই সেই পাহাড়েরই মাথায় এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের চারপাশে চারজন বসে আছেন—চ্যালেঞ্জার, সামার্লি, লর্ড জন আর ম্যালোন। কুড়াল দিয়ে পাথর কেটে কেটে, লোহার সিক পুঁতে পুঁতে, দড়ি বেঁধে বেঁধে এঁরা পাহাড়ে উঠেছেন।

অনুচরেরা সবাই নীচে পড়ে আছে। এভাবে পাহাড়ে উঠতে ভয় পায় তারা।

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে আসে। উপত্যকার ভেতর থেকে ভেসে আসতে থাকে নানারকম উৎকণ্ঠ বীভৎস আওয়াজ। এ সব কি সেই প্রাগৈতিহাসিক জীবদের গর্জন? একটা একটানা মর্মন্তুদ কান্না কেঁদে চলেছে কোন্ এক নিরীহ জন্তু। অসীম যন্ত্রণায় সেই গোঙানির পর্দায় পর্দায় প্রাণবায়ু যেন একটু একটু করে দেহপিঞ্জর থেকে বেরিয়ে আসছে। চারটি সভামানুষ পাহাড়ের মাথায় বসে শিউরে শিউরে উঠছে সেই কান্না শুনে।



ঝলসানো শূকরছানা অদৃশ্য হয়েছে সামনে থেকে।
পৃষ্ঠা—১৫০

থপ্! থপ্! থপ্! একটা ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। আগুনের চার পাশে একটা বেড়া তারা তৈরি করেছে, কাঁটাগাছ কেটে কেটে। ওই মাটি-

কাঁপানো পায়ের শব্দ যার, সে কি এই কাঁটার বেড়া দেখে নিরস্ত হবে? অভিযাত্রীদের বুকের ভেতর গুরগুর করছে।

সে এল। বাইরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে জন্তুটাকে দেখা যাচ্ছে। বুনো শুয়োরের সঙ্গে তার মুখ আর দেহের মিল আছে খানিকটা। কিন্তু এমন অতিকায় শুয়োরের কথা মানুষ কখনও কল্পনা করতে পারে নি। এ যেন একটা সচল পাহাড়!

তার ওপর, ওই শিংগুলো! মাথার ওপর থেকে দুটো শিং বেরিয়েছে হাতির দাঁতের চাইতে মোটা আর লম্বা। তার ওপর, নাক থেকে আর একটা। আর সেই নাসিকার খড়্গের ঠিক নীচে মাড়ি থেকে একটা নিম্নমুখী দাঁত। দেবদারু গাছের গুঁড়ির মত মোটা পাগুলোতে বড় বড় ধারাল নখ, কোন সিংহের থাবাতেও অত-বড় নখ কখনও দেখেন নি লর্ড জন।

আজগুবী দুঃস্বপ্নের মত এই মহাজন্তুর আবির্ভাব আড়ষ্ট করে ফেলেছে অভিযাত্রীদের। সে এসে বেড়া ঠেলছে। কাঁটাগাছের ধারাল কাঁটা তার চামড়া ভেদ করতে অক্ষম। বেড়া যদি ভেঙে পড়ে, রাইফেল সম্বল করে ওই দানবের সম্মুখীন হওয়া—এই রাত্রিবেলায়—এত কাছাকাছি পাল্লায়—

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ও ঘায়েল হলেও হতে পাবে। কিন্তু চারজনের ভেতর অন্ততঃ দু একজন ওর থাবায় ঘায়েল হবার আগে নয়। কী তাহলে করা যায়?

লর্ড জন হঠাৎ এক কান্ড করে বসলেন। আগুন থেকে তুলে নিলেন একটা জ্বলন্ত কাঠ, আর তাই হাতে করে ছুটে বেরিয়ে গেলেন বেড়ার দরজা খুলে। জন্তুটা সামনেই, সোজা তার কুৎকুতে চোখের ওপর ঠেসে ধরলেন সেই কাঠের আগুনটা। একটা পৈশাচিক আর্তনাদ করে জন্তুদানবটা পেছন ফিরে দুড়দুড় করে দৌড়লো মাটি কাঁপিয়ে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার যন্ত্রণার চিৎকার শোনা গেল বনের ভেতর থেকে।

হ্যাঁ, সাহসের মত সাহস বটে লর্ড জনের। কিন্তু কোন বড়াই নেই তাঁর কথায়—শুধু বললেন—"আগুনের কাছে জানোয়ারেরা সবাই জব্দ।"

"কী জাতের জীব এটা?"—সামার্লিকে প্রশ্ন করলেন চ্যালেঞ্জার।

"ঠিক তো বুঝতে পারছি না—"

"আমিও সঠিক শ্রেণী নির্ণয় করতে পারব না এক্ষুনি। তবে পুরাকালের সেই মাংসাশী ডাইনোসরদের কোন গোষ্ঠী নিশ্চয়ই—"

রাত দুপুর হয়ে এল। স্থির হয়েছে পালা করে এক একজন জেগে পাহারা দেবেন, বাকী সবাই ঘুমোবেন ততক্ষণ। প্রথম পাহারা সামার্লির, শেষ পাহারা ম্যালোনের।

ম্যালোন নবীন যুবা, অভিজ্ঞতার চাইতে সাহস অনেক বেশী। সামার্লিকে অন্যমনস্ক দেখে সে বন্দুক হাতে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল বেড়ার ভেতর থেকে। উদ্দেশ্য একা একা বনভূমিটা

পর্যবেক্ষণ করে আসবে। তার পাহারা সেই শেষ রাত্রে। কম্বলখানা এভাবে সাজিয়ে রেখে এসেছে যে বন্ধুরা মনে করবে ম্যালোন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। পাহারার পালা আসবার আগেই সে ফিরে আসবে, এমন আশা তার আছে।

আশ্রয় শিবির থেকে বেরিয়ে উপত্যকায় নামতেই একটা ছোট জলস্রোত সে দেখতে পেল। কুলকুল করে বয়ে চলেছে অরণ্যভূমির বুক চিরে। সেই শীর্ণা নদীর কূল ধরে ধরে সে অগ্রসর হল। পদে পদে কত যে বিস্ময়! প্রথমেই চোখে পড়ে জানা-অজানা সাদা আর হলদে ফুলের সমারোহ। ফুলের ওপর পা না দিয়ে হাঁটবার উপায় নেই এক এক জায়গায়।

আর সেই ফুলবনের আশেপাশে বড় বড় সাপ। পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত লম্বা ময়াল। পাশ কাটিয়ে যেতে পা সিরসির করে, পা উঠতে চায় না।

অরণ্যভূমির মাঝখানে এক জায়গায় পড়ে আছে চাপ চাপ রক্ত আর বৃহৎ মাংসখন্ড। বোঝা গেল—এসব সেই অভাগা জীবটারই দেহাবশেষ, যার মরণ আর্তনাদ একটু আগেই পাহাড়ের মাথায় বসে তারা শুনতে পেয়েছিল।

নিহত জীবটা কী জাতীয় ছিল তাও ম্যালোন দেখতে পেল। একটু দূরে পাঁচ ছটা অতিকায় জন্তু সামনের পা বাড়িয়ে বড় বড় গাছের মগডাল ভেঙে পাতা খাচ্ছে। এ যুগের হাতির চাইতে মোটা দেহ, তালগাছের সমান উঁচু তারা। পরে চ্যালেঞ্জারের কাছে শোনা গিয়েছিল—এদের নাম ইগুয়ানোডন. আকার এত বড় হলেও স্বভাবে এরা অতি নিরীহ. অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের হিংস্র জন্তুরা এদের মেরে খায় অনায়াসে।

এক জায়গায় শোনা গেল অনেক পাখির কর্কশ ডাক। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে সামনে দেখতে পেল একটা অতি সুগভীর ডোবা. তার ভেতরে অন্ততঃ হাজারখানেক সেই পাখি—যাদের টেরোড্যাকটাইল বলে অভিহিত করেছেন চ্যালেঞ্জার। পুরুষ পাখি, মেয়ে পাখি, বাচ্চা পাখি এবং ডিম—কী নেই সেখানে? একটা অসহ্য পূতিগন্ধ ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

নদীর ধার দিয়ে মাইল পাঁচেক যাওয়ার পরে দেখা গেল নদীটা পড়েছে এক হ্রদে। হ্রদটা খুব ছোট নয়। মাঝে মাঝে চড়া আছে। আর হ্রদের ওপারে সেই পাহাড়, যা বেষ্টন করে রয়েছে উপত্যকাটিকে। অবাক্ বিস্ময়ে ম্যালোন দেখল—সেই পাহাড়ের গায়ে সারি সারি আলো জ্বলছে। ওখানে মানুষ বাস করে তাহলে। কী ধরনের মানুষ তারা?

হ্রদের ধারে একটা উঁচু পাথরের মাথায় শুয়ে শুয়ে কত যে আশ্চর্য জীবজন্তু দেখতে পাচ্ছে ম্যালোন! বৃহদাকার এল্ক হরিণ, যা এ যুগে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। দুটো আর্মাডিলো এসে জল খাচ্ছে। তারপরই এল এক মূর্তিমান বিভীষিকা। মাটি কাঁপছে তার পায়ের ভারে। পাখির মত মাথা, কুঁজো পিঠে ত্রিকোণ সব আঁইশ, তালগাছের চাইতে উঁচু সেই জন্তুদানব, যার ছবি মেপল হোয়াইট এঁকেছিল তার ডায়েরিতে। এর নাম পরে শোনা গিয়েছিল—স্টেগোসাউরাস!

আশ্রয় শিবিরে ফিরে আসবার মুখে ওই স্টেগোসাউরাস বা তার নিকট জ্ঞাতি অন্য কোন সৌরীয় দানব তাড়া করল ম্যালোনকে। প্রাণ নিয়ে সে বেঁচে ফিরল বটে, কিন্তু ফিরে যা দেখল—তা তার কল্পনার অতীত ছিল। বেড়া ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে আছে, অনেকখানি জায়গায় রক্তের ঢেউ খেলছে, আর সবচেয়ে সর্বনাশের কথা, তার সঙ্গীরা কেউ কোথাও নেই।

পাগলের মত চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল ম্যালোন, চিৎকার করে ডাকতেও লাগল সঙ্গীদের নাম ধরে। নাঃ, কোন সাড়া নেই।

টিনে ভরা খাদ্যবস্তুগুলি একটিও নেই, কিন্তু রাইফেলগুলি পড়ে আছে। এ কী রহস্য? সৌরীয় জন্তু কেউ যদি ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে থাকবে, তাহলে খাদ্যগুলো কী হল? রান্না খাবারের ওপর লোভ হতে পারে একমাত্র মানুষের বা মানুষের মতই কোন জীবের।

সারাদিন সারারাত ম্যালোন পাগলের মত সেই পাহাড়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। শেষ রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি, চমকে জেগে উঠে দেখল—লর্ড জন সামনে। কিন্তু এ কী বেশ তাঁর! জামা প্যান্ট ছেঁড়া, টুপি নেই, চোখ গর্তে ঢুকেছে, অনাহার অনিদ্রার কালো ছাপ চোখে মুখে স্পষ্ট!

দু কথায় লর্ড জন ম্যালোনকে সব বুঝিয়ে দিলেন। চ্যালেঞ্জারের পাহারা ছিল, বলা বাহুল্য তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন। কয়েক শত বনমানুষ এসে আচমকা হানা দেয় এখানে। বীভৎস চেহারা তাদের, অমানুষিক শক্তি দেহে। হনুমানের চাইতে এদের অনেক বেশী সাদৃশ্য মানুষের সঙ্গে, গরিলা শিম্পাঞ্জির চাইতেও। লেজ নেই, খাড়া হয়ে হাঁটে, দাড়ি আছে, তাছাড়া পরস্পরের সঙ্গে এরা কথা বলে এক দুর্বোধ্য ভাষায়।

এরা এসে অভিযাত্রী তিনজনকে বেঁধে নিয়ে গেল, এবং নিয়ে গেল খাদ্যগুলিকেও। লর্ড জন কোনমতে পালিয়ে এসেছেন—চ্যালেঞ্জার ও সামার্লি মৃত্যুর মুখে। শুধু তাঁরা নন, কয়েকজন কালো মানুষও ওই বনমানুষদের হাতে বন্দী। সবাইকে নিয়ে ওরা জমায়েত হয়েছে এখান থেকে খানিকটা দূরে, পাহাড়ের মাথায়। এক্ষুনি সেখানে যাওয়া চাই ম্যালোন ও লর্ড জনের, রাইফেল নিয়ে।

চারটি রাইফেল এবং ভাণ্ডারের সব গুলিবারুদ সঙ্গে নিয়ে দুজনে যখন যথাস্থানে উপনীত হলেন, তখন এক কল্পনাতীত দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁদের। অন্ততঃ হাজার বনমানুষ দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের মাথায়। পুরুষেরা এক জায়গায়, মেয়ে বনমানুষেরা ও শিশুরা অন্য জায়গায়। একটা কালো মানুষকে ধরেছে দুটো বনমানুষ। একজন দু হাত, একজন দু পা। দোলা দিচ্ছে তাকে। জোরে জোরে দোলা। দোলাতে দোলাতে সবেগে ছুড়ে ফেলে দিল মানুষটাকে। সে গিয়ে পড়ল হাজার ফুট নীচে, সেই বাঁশঝাড়ের ওপর, যার প্রত্যেকটা বাঁশ বল্লমের ফলার মত উদ্যত হয়ে আছে মানুষকে গেঁথে ফেলবার জন্য। ম্যালোনেরা বুঝতে পারল অভাগা ক্লোভারের মৃত্যু কেমন করে ঘটেছিল।

কিন্তু এখন আর মুহূর্ত চিন্তা করবার সময় নেই। বনমানুষেরা এবার সামার্লিকে ধরেছে ছুড়ে ফেলে দেবার জন্য। কিন্তু ছুড়তে আর হল না তাদের। রাইফেলের দুটো গুলি বক্ষ ভেদ করল ওই দুটো বনমানুষের. তারা লুটিয়ে পড়ল।

তারপর গুলিবৃষ্টি। দলে দলে বনমানুষ পড়ছে। সামার্লি আর চ্যালেঞ্জার ছুটে এসে বন্ধুদের সাথে মিলেছেন। আর মিলেছে এসে ছয় জন কালো মানুষ। তারা নিজেদের ভাষায় কী যেন সব কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল লর্ড জনের কাছে, আর তাঁর জুতোর ওপর মুখ ঘষতে লাগল।

এই কালো মানুষেরা এ উপত্যকায় এসে বসতি করেছে কয়েক'শ বছর মাত্র। কিন্তু বনমানুষেরা এখানে আছে অনাদি কাল ধরে। কালোরা আসার পর থেকেই চিরস্থায়ী যুদ্ধ চলেছে তাদের সঙ্গে এই বনমানুষদের। কালোরা কোনদিন পারে নি বনমানুষদের সঙ্গে। তাই সমস্ত উপত্যকাটা ওদের ছেড়ে দিয়ে কালোরা হ্রদের ওপারে বসতি স্থাপন করেছে।

কিন্তু খাদ্যের জন্য তাদের এপারে আসতেই হয়. আর এলেই বনমানুষের হাতে ধরা পড়তেও হয় মাঝে মাঝে। ধরা পড়লেই মৃত্যু।

এইবার কালোরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাবে।

অভিযাত্রীদের তারা নিয়ে গেল নিজেদের বাসস্থানে। সেখানে সমস্ত কালোরা তৈরী হল বনমানুষদের বিরুদ্ধে অভিযান করবার জন্য। এমন সুযোগ আর আসবে না। এই সাদা মানুষেরা সাহায্য করবে তাদের। এদের হাতে বজ্র আছে। এবার আর নিস্তার নেই বনমানুষদের।

সত্যই বজ্রধর নবাগতদের সাহায্যে কালোরা এবার নির্মূল করে ফেলল বনমানুষদের। গুটি পঞ্চাশ মেয়ে বনমানুষ ও তাদের কতকগুলি শিশু ছাড়া সব নিহত হল বন্দুকের গুলিতে আর কালোদের তীরের আঘাতে। উপত্যকা রক্তে লাল হয়ে গেল।

তারপর কয়েক দিন দ্বীপটা দেখে বেড়ালেন অভিযাত্রীরা। টেরোড্যাকটাইল ডোবা থেকে কৌশলে একটা বাচ্চা ধরে নিয়ে এলেন লর্ড জন। অতি বৃহৎ এক কাঠের বাক্স তৈরি করে তাইতে বন্ধ করে বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিলেন চ্যালেঞ্জার।

তারপর কালোরাই পথ দেখিয়ে দিল পাহাড় থেকে নামবার। তাদের বাসস্থানের একটা গুহার ভেতর দিয়ে এই পথ। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নামতে নামতে এই পথ পাহাড়ের বাইরে এসে শেষ হয়েছে। পাহাড়ের গায়েতেই শেষ হয়েছে অবশ্য. সমতল মাটি থেকে একশো ফুট ওপরে। দড়ি ছিল অভিযাত্রীদের সঙ্গে। তারই সাহায্যে সহজেই নামতে পারল সবাই। কষ্ট যা হল, সে শুধু টেরোড্যাকটাইলের বাক্স নামাবার সময়।

তবু সে কষ্ট সার্থক বলতে হবে। কারণ লন্ডনে পৌঁছে চার অভিযাত্রী যখন নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন কেউ তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে না। আগে যেমন

চ্যালেঞ্জারকে অবিশ্বাস করেছিল, এবার তেমনি করতে লাগল সামার্লিকেও। অবশেষে জ্যান্ত টেরোড্যাকটাইল সভাস্থলে উড়িয়ে দিলেন চ্যালেঞ্জার।

তখন প্রাণের ভয়ে সব ছুটে পালায়।

কিন্তু পালালে কি হবে, সত্যই যে প্রাগৈতিহাসিক জীবেরা এখনও পৃথিবীর কোন কোন অংশে টিকে আছে, এ-কথায় আর সন্দেহ করবার উপায় রইল না। চ্যালেঞ্জারের জয়জয়কারে মুখরিত হল লন্ডন মহানগরী।

টেরোড্যাকটাইলটা? সেটা উড়তে উড়তে অতলান্তিকের দিকে চলে গেল। ও কি নিজের দেশে পৌঁছুতে পেরেছিল মহাসাগর পেরিয়ে? কে বলবে?



স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

লেখক পরিচিতি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রতিভার আলোক বিকীরণ করেছিলেন যেসব দিক্‌পাল সাহিত্যিক, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল তাঁদের অন্যতম। এঁর আবির্ভাব ১৮৫৯, মৃত্যু ১৯৩০।

অভিজাত বংশের উচ্চশিক্ষিত সন্তান আর্থার কোনান ডয়েল প্রথম জীবনে ছিলেন চিকিৎসা ব্যবসায়ী। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ শুরু হয়, তখন দেশাত্মবোধের প্রেরণায় আর্থার চিকিৎসক-রূপে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিন বৎসরকাল রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ সংস্রবে থাকার ফলে উত্তর জীবনে নানা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার বহুবিধ উপকরণ তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প

ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাস, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, বৈজ্ঞানিক কাহিনী—সব কিছু রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু সাহিত্য জগতে তাঁর অবিনশ্বর সৃষ্টি শার্লক হোমস্ সিরীজ-এর গোয়েন্দা গ্রন্থাবলী। শার্লক হোমস্‌কে সম্মুখে রেখে কোনান ডয়েল অপরাধবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে নব চিন্তাধারা সভ্যজগৎকে উপহার দিয়েছিলেন, তাতে অপরাধী-নির্ণয়ের মূল পদ্ধতিটাই উলটে গিয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন এই মহামনীষী আবার আত্মার অবিনশ্বরতায় ষোল-আনা বিশ্বাসী ছিলেন। পরলোক এবং প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর গবেষণা ছিল প্রচুর।

শার্লক হোমস্ গ্রন্থাবলী, চ্যালেঞ্জার গ্রন্থাবলী, ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী প্রভৃতি নিয়ে শতাধিক পুস্তক স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। চ্যালেঞ্জার গ্রন্থাবলীর অন্যতম চমকপ্রদ কাহিনী 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' বা বিলুপ্ত পৃথিবীর এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পাঠে বাংলার কিশোরেরা আনন্দ লাভ করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।



হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম

পাঁচশো বছর আগের কথা।

রীমস্ শহরের বাইরের মাঠে বেদে এসেছে এক দল। প্রতি বছরই একবার আসে ওরা। গুনচটের পোশাক পরা, কানে মাকড়ি বাদামী রঙের নোংরা মানুষ এক এক দলে তিন চার জন করে শহরের এক এক পাড়ায় ঢুকে পড়ে। চুপড়ি বিক্রি করে, ছুরি কাঁচি বিক্রি করে আরও নানারকম টুকিটাকি বেসাতি যাচাই করে ঘরে ঘরে গিন্নীদের কাছে।

বিকালবেলায় বেদেরা সব ছাউনিতে ফেরে। তখন শহর থেকে জনস্রোত বইতে থাকে মাঠের দিকে। এখন আর কেনাবেচার পাট নয়। বেদেনীরা সব গণৎকার বনে গিয়েছে জনে জনে। আর তাদের দিয়ে হাত গোনাবার জন্য শহরবাসীদের কী যে আকুলি-বিকুলি! নগদ পয়সা গুনে দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা শুনে আসে আর রীতিমত সোয়াস্তি পায় তা শুনে। "মামলায় পড়েছ?—তুমি নির্ঘাৎ জিতবে।" "রোগ হয়েছে? এই শিকড়টা নিয়ে গলায় ধারণ কর, সাত দিনে সেরে যাবে।" "আরে, এই মেয়ে তোমার? এ যদি রাজরানী না হয় তো হাত গোনা ছেড়ে দেব আমি"—ইত্যাদি ইত্যাদি—

সেদিন বিকালবেলায় পড়শীদের সঙ্গে প্যাকেটও বেদের ছাউনিতে গিয়েছে মেয়েটিকে কোলে নিয়ে। ভারী সুন্দর মেয়ে তার এই অ্যাগনেস। মাত্র দেড় বছর বয়স—এক তাল মাখনের মত কোমল দেহ. এক রাশ ফুলের মত আলো করে আছে মায়ের কোল।

খেটে খাওয়া বস্তিবাসিনী মেয়ে এই প্যাকেট। অ্যাগনেসের বাপ সেই যে কবে বিদেশ গিয়েছে চাকরি করতে, আর ফেরে নি। কিন্তু সে-দুঃখ সহজেই ভুলতে পেরেছে প্যাকেট অ্যাগনেসের মুখ চেয়ে। এমন মেয়ে আর কার আছে? মেয়ের রূপ দেখে দেখে মায়ের আর আশ মেটে না—তাকে কোলে চেপে, তার গাল টিপে, তার সর্বাঙ্গে চুমো খেয়ে খেয়ে তাকে যেন পাগল করে দেয়। আর তার মেয়েকে সাজাবার কী ধুম! প্রতিটা বাড়তি পয়সা সে রেখে দেয় মেয়ের নতুন নতুন জামা করবার জন্য। এক জোড়া লাল ভেলভেটের জুতো সে নিজে তৈরি করেছে ওর ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ের মাপে, তাতে বসিয়েছে নানা রঙের পুতি আর কাচকড়া। সে জুতো পায়ে দিলে কী বাহারই যে খোলে মেয়ের! সত্যি যে দেখে অ্যাগনেসকে, সে আর চোখ ফেরাতে পারে না।

সেদিন ছাউনির বেদেনীরা যেন ক্ষেপে গেল অ্যাগনেসকে নিয়ে। সবাই তাকে একবার কোলে নিতে চায়। প্রত্যেকে তার হাত গোনে, আর দরাজ গলায় তার অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ঘোষণা করে। কেউ বলে—এ তাতারের রানী হবে, কেউ বলে চীনের সম্রাজ্ঞী। অনেক অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি মাথায় নিয়ে অবশেষে সন্ধ্যার পরে প্যাকেট ঘরে ফিরল।

অ্যাগনেস মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে সাবধানে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে প্যাকেট একবার পাড়া বেড়াতে বেরুলো। উদ্দেশ্য—যেসব পড়শী বেদের ছাউনিতে যায় নি, তাদের শুনিয়ে দিয়ে আসবে—বেদেনীরা কে কী বলেছে অ্যাগনেসের সম্বন্ধে। কোথায় চীন, কোথায় তাতার—এসব কারও জানা আছে কিনা, জিজ্ঞেস করেও দেখবে।

আধ ঘণ্টার বেশী দেরি হয় নি অ্যাগনেসের মায়ের।

ফিরে এসে দেখল—দরজাটা কেমন যেন আলগা হয়ে আছে। ঘরে ঢুকে দেখল—অ্যাগনেস নেই।

অ্যাগনেস নেই, তার বদলে রয়েছে একটা অদ্ভুত রকমের কুৎসিত বিশ্রী বছর চারেক বয়সের ছেলে। সে যে কী কুৎসিত—তা বলে বোঝানো যায় না। কালো তো বটেই, একটা চোখের ওপর মস্ত এক আব, পিঠে ধনুকের মত কুঁজ—

কে এ ছেলেটা? কোথা থেকে এল? তার চেয়ে বড় কথা—অ্যাগনেস কোথায় গেল? ঘরের ভেতর তন্নতন্ন করে খুঁজেও মেয়েকে পেল না যখন, প্যাকেট ঘর থেকে বেরিয়ে এল হাহাকার করতে করতে। ছুটে এল পড়শীরা। তারা শুনল সব, ঘরের ভেতর গিয়ে ছেলেটাকে দেখল—

এ কাজ নিশ্চয় বেদেদের। ওই শয়তানের বাচ্চা ছেলেটা নিশ্চয় বেদেদেরই ছেলে। ছাউনি থেকেই তারা নিশ্চয় প্যাকেটের পিছু নিয়েছিল মেয়েটি চুরি করবার জন্য। ওর পাড়া-বেড়ানোর সুযোগে মেয়েটিকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে, এবং কী নিষ্ঠুর পরিহাস—বিনিময়ে রেখে গিয়েছে ওই অতি কুৎসিত বেদের বাচ্চাকে।

ক্রুদ্ধ পড়শীরা লাঠি সোটা নিয়ে ছাউনির দিকে ছুটল, বেদের গোষ্ঠীকে মেরে সাবাড় করে ওরা অ্যাগনেসকে কেড়ে নিয়ে আসবে।

কিন্তু হায়, বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। পাখি উড়ে গেছে। মাঠে চিহ্নমাত্র নেই ছাউনির। না, চিহ্ন আছে—এখানে ওখানে ছাইগাদা। তা ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই—গাধা ঘোড়া ছাগল নেই, বেদে বেদেনী বেদের ছাউনি—কোথাও কিছু নেই।

রাতের ভেতরেই চোরের দল কতদূর গিয়ে পড়ল কে জানে। অ্যাগনেসের আর সন্ধান হল না। সেই শয়তানের বাচ্চার মত বীভৎস ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নগরপালের কাছে। নগরপাল তাকে পাঠালেন প্যারি রাজধানীতে।

আর প্যাকেট? সে কয়েকদিন আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল নিজের ঘরে। অ্যাগনেসের সেই লাল ভেলভেটের জুতোর একটি পাটি বেদেনীরা ফেলে গিয়েছে ঘরের কোণে, সেইটি বুকে করে সে পড়েই রইল।

অবশেষে একদিন সকালে পড়শীরা দেখল—ঘরে প্যাকেট নেই। কোথায় সে গিয়েছে, তার আর সন্ধান পেল না কেউ।

* * *

প্যারি রাজধানীতে সেদিন সেণ্ট কোয়াসিমোডোর উৎসব। দলে দলে মেয়েপুরুষ রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে আনন্দ করবার জন্য। পথে এক জায়গায় একটি অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে সবাই।

একটি ছেলে—বছর চারেকের। এমন অদ্ভুত রকমের কুৎসিত যে মানুষের বাচ্চা হতে পারে, তা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। কালো তো বটেই, এক চোখ এক বিরাট আব দিয়ে ঢাকা, পিঠটা কুঁজো, হাত-পা ছুড়ে ছুড়ে সে যে কী বিকট সুরে চেঁচাচ্ছে!

ছেলেটাকে রীম্‌স্‌-এর নগরপাল পাঠিয়েছেন এখানে। রাজধানীর কর্তারা একে রাজপথে শুইয়ে রেখেছেন—যদি কোন দয়ালু নাগরিক দয়াপরবশ হয়ে নিরাশ্রয় শিশুকে প্রতিপালন করার ভার নেন—এই আশায়। তা ওর চেহারা দেখেই সবাই মূর্ছা যাওয়ার যোগাড়, আশ্রয় দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না কেউ।

কেউ বলে—ওটা শয়তানের বাচ্চা, ওর ওই আবটা ফাটিয়ে দেখ, ওর ভেতর থেকে খোদ শয়তান বেরিয়ে পড়বে এক্ষুনি। কেউ বলে—শয়তানকে যখন হাতে পাওয়া গিয়েছে, ছেড়ে দেওয়া কিছু নয়, আগুন জেবলে ওকে পুড়িয়ে মারা উচিত।

শেষ পর্যন্ত হয়তো ছেলেটাকে আগুনেই ফেলে দিত রাস্তার লোক, কারণ সে যুগে কুসংস্কারের প্রভাবে অজ্ঞ লোকেরা না করত, এমন কোন নিষ্ঠুরতাই ছিল না।

কিন্তু ছেলেটা রক্ষা পেয়ে গেল। নোৎরদাম মহাগির্জার আর্কডিকন ক্লড ফ্লোরো সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন; তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ওর দিকে। তিনি কী ভেবে বললেন—"একে আমিই নেব।"





ক্লড ফ্লোরোর বয়স এমন কিছু বেশী নয়। অভিজাত বংশের সন্তান, সুপারিশের জোরে প্রথম যৌবনেই ধর্মমহামণ্ডলে উচ্চপদ লাভ করেছেন, রাজধানীর শ্রেষ্ঠ গির্জার আর্কডিকনরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। নোৎরদামেতেই তিনি বাস করেন, সেইখানেই তিনি নিয়ে গেলেন বাচ্চাটাকে। সেন্ট কোয়াসিমোডোর উৎসবের দিন ওকে পেয়েছেন, তাই ওর নামকরণ করলেন কোয়াসিমোডো।

নাগরিকেরা চোখ ঠারাঠারি করল, অর্থাৎ যোগ্যই মিলেছে যোগ্যের সাথে। ক্লড ফ্লোরোর বদনাম আছে ঐন্দ্রজালিক বলে। তিনি নাকি রাত্রিবেলা নোৎরদামের সাততলার ছাদে আগুন জ্বালিয়ে মন্তর-তন্তর আওড়ান, সোনা তৈরি করেন, শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোকাবিলা তাঁর হয়। সে লোক যদি পথের মাঝে শয়তানের বাচ্চাকে কুড়িয়ে পায়, তবে তাকে আদর করে নিয়ে যাবে বইকি!

যাই হোক, লোকের জল্পনায় কোয়াসিমোডোর কিছু আসে যায় না, সে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। ক্লড ফ্লোরো তাকে আশ্রয় দিয়েছেন এই পর্যন্ত। তাকে আদর করা দূরে থাকুক, দিনান্তে একটা কথাও তাকে বলেন না হয়তো। কিন্তু কোয়াসিমোডোর তাতে কী! কুকুর যেমন প্রভুর পায়ে পায়ে ঘোরে, সেও তেমনি ঘোরে ক্লডের পায়ে পায়ে। ক্লড যখন নীরবে অধ্যয়ন করেন নোৎরদামের ছাদে বসে, সে নীরবে তাকিয়ে থাকে তাঁর মুখের পানে। তার চোখে ক্লড পিতা এবং দেবতা। ক্লডের জন্য সে জীবন দিতে পারে।

কোয়াসিমোডো যত বড় হয়, তত হয় কুৎসিত। একটা চোখ একদম বুজে গিয়েছে আবের তলায়, আর একটা চোখে সদাই এক হিংস্র দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যে দেখে, সেই আঁতকে ওঠে। অবশ্য বেশী লোক তাকে দেখতে পায় না, কারণ সে নোৎরদামের বাইরে কদাচিৎ যায়।

আর্কডিকন ওকে দিয়েছেন নোৎরদামের ঘণ্টাবাদকের কাজ। পেল্লায় পেল্লায় ডজন দুই ঘণ্টা আছে গির্জায়। সেগুলি যখন এক সাথে বাজতে শুরু করে, সারা প্যারি শহর সেই বাজনার ধ্বনিতে গমগম করে। কোয়াসিমোডোর তখন কী আনন্দ! উত্তেজনার বশে সে এক এক সময় লাফিয়ে চড়ে বসে কোন একটা ঘণ্টার পিঠে। ঘণ্টা দোলে, সেও দোলে। পায়ের তলায় সাততলা পরিমাণ গভীর গর্ত, পড়লে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কোয়াসিমোডোর দিন যায় এমনিভাবে, ক্রমে তার বয়স হল চব্বিশ পঁচিশ। কুশ্রী চেহারায় যেমন তার জুড়ি নেই দুনিয়ায়, তেমনি জুড়ি নেই দৈহিক শক্তিতে। রুখে দাঁড়ালে যে কোন তিন চারটা সমর্থ পুরুষকে সে মেরে ঠান্ডা করে দিতে পারে, যদি অবশ্য তারাও অসাধারণ রকমের বলিষ্ঠ না হয়।

সেদিন প্যালেই দ্য জাস্টিসে একটা আনন্দানুষ্ঠান। নেদারল্যান্ড থেকে একদল দূত এসেছেন একটা বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে। ফ্রান্সের যুবরাজের সঙ্গে নেদারল্যান্ডের রাজকন্যার বিবাহ। সেই দূতদের একটা নাটকের অভিনয় দেখানো হবে।

নাটকটি রচনা করেছে এক দরিদ্র ভদ্রসন্তান, গ্রিঙ্গয়ার তার নাম। অশেষ পরিশ্রম করে সে নিজেই অভিনেতাদের শিক্ষা দিয়েছে, মঞ্চসজ্জা করেছে নিজের হাতে। আশা আছে যে অভিনয় দেখিয়ে খুশী করতে পারলে সে অনুষ্ঠানের কর্তাদের কাছ থেকে মোটা পুরস্কার পাবে একটা। অর্থের তার বড় দরকার। এক হোটেলে সে থাকে। হোটেলওয়ালা বলেছে—আজই তার বকেয়া পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে না দিলে গ্রিঙ্গয়ারকে আর সে ঢুকতে দেবে না হোটেলে। তাই প্রাণপণ করে বেচারী খাটছে অভিনয়ের সাফল্যের জন্য।

প্যালেই দ্য জাস্টিসের বিশাল সৌধে তিল ফেলবার স্থান নেই। নাটক দেখতেই যে এত লোক এসেছে, তা নয়, এসেছে বিদেশী দূতদের দেখবার জন্য। একটা ভিখারী—অনেকেই তাকে চেনে, ক্লোপিন তার নাম—থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে—"দে বাবা, একটা ফ্রাংক ফেলে দে এদিকে!" হচ্ছেও তার বেশ দু পয়সা।

অভিনয় শুরু হল। অসম্ভব গোলমাল করছে লোকে। বিশেষ ওই ক্লোপিনটা কিছুতেই থামছে না। যখনই নাটকে একটা সঙ্গিন ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, হতভাগা চেঁচিয়ে উঠছে—"দে বাবা, একটা ফ্রাংক ফেলে দে!" আর হাসির অট্টরোল পড়ে যাচ্ছে জনতার ভেতরে। নাটক ভেসে যাচ্ছে।

বিদেশী দূতেরা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—"অভিনয় ভাল লাগছে না। তার চাইতে তোমাদের সেই পোপ-নির্বাচনের খেলাটা শুরু কর। দেখা যাক—সেটা কেমন লাগে—"

পোপ মানে বোকাদের পোপ। আজই তার মিছিল বেরুবার কথা, অনুষ্ঠানসূচীতে সে কথা লেখা আছে। উপস্থিত জনতার ভেতর যে লোকটা সবচেয়ে কুশ্রী, তাকে রাংতার মুকুট মাথায় পরিয়ে "বোকার পোপ" নির্বাচিত করা হয়, আর তাকে সামনে নিয়ে একটা মিছিল সারা শহর ঘুরে বেড়ায়। হুল্লোড় চেঁচামেচির অন্ত থাকে না। শহরের যাবতীয় বেপরোয়া উচ্ছৃংখল লোক যোগ দেয় মিছিলে।

অভাগা গ্রিঙ্গয়ার! তার নাটকের অকালমৃত্যু হল। যে কথাটা তার কেবলই মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে—সেটা হল এই যে আজ রাত্রে তাকে রাস্তায় কাটাতে হবে, এবং অনাহারে কাটাতে হবে। হোটেলে সে ঢুকতে পাবে না।

ওদিকে পোপ-নির্বাচনের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে ঠিক এই মিছিলের দিনটার আগে আর কখনও কোয়াসিমোডো তার গির্জার বাইরে আসে নি, এলে সে ছাড়া আর কেউ নিশ্চয়ই বোকার পোপ হতে পারত না। আজ সে দৈবের তাড়নাতেই বাইরে এসেছে নিশ্চয়। গ্রিঙ্গয়ারের নাটক না জমুক, কোয়াসিমোডো এবং আরও কয়েকজনের বিয়োগান্ত জীবন-নাট্য জমিয়ে তোলবার ভার নিয়েছে স্বয়ং নিয়তি।

কোয়াসিমোডো বোকার পোপ নির্বাচিত হল। তাকে রাংতার মুকুট পরিয়ে পোপ বানানো—তাতেও দেরি হল না। তারপর তাকে এক দোলায় বসিয়ে সেই দোলা কাঁধে তুলল চার জন।

দোলারই বা কী শ্রী! ছেঁড়া জুতো, ভাঙা কলসি আর জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় দিয়ে দোলা সাজানো হয়েছে।

মিছিল চলেছে রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে। কোয়াসিমোডোর একঘেয়ে জীবনে এ বৈচিত্র্য মন্দ লাগছে না নেহাত।

রাস্তার ধারে এক জায়গায় ছোটখাটো ভিড় জমেছে একটা। সেই ভিড়ের মাঝখানে একটি মেয়ে নাচ দেখাচ্ছে। আশ্চর্য রূপসী মেয়েটি। পথের ধারে এমন রূপ? এ যেন গোবরে পদ্মফুল। দর্শকেরা তার নাচ দেখতে এমন মশগুল হয়ে আছে যে অদূরবর্তী পোপের মিছিলের দিকেও দৃষ্টিপাত করছে না কেউ। এক ফ্রাংক, দুই ফ্রাংক—অযাচিতভাবেই লা-এমেরালডাকে উপহার দিচ্ছে প্রত্যেকে। মাটিতে পড়ছে মুদ্রাগুলি, আর তা পা দিয়ে টেনে টেনে এক জায়গায় জমা করছে এক ছাগশিশু।

লা-এমেরালডার মত তার ছাগশিশুরও সৌন্দর্য অপরূপ। দুধের মত সাদা সারা অঙ্গ, শুধু মাথায় ক্ষুদে ক্ষুদে শিং দুটো আর চার পায়ের খুর চারখানা সোনার গিলটি করা। এমেরালডা যদি নাচ না দেখিয়ে শুধু তার এই জালিকে দেখাত, তাহলেও রোজগার তার কম হত না।

নাচতে নাচতে এমেরালডা এক একবার এক একজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একবার একজনের সামনে দাঁড়াতে গিয়েই সে কেঁপে উঠল, নাচের তাল কেটে গেল তার। সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে সরে গেল।

এমেরালডা চিনেছে একে। সন্ধ্যার পরে শহরের যে-কোন স্থানে সে নাচুক, এই লোকটিকে সে দর্শকের ভেতর দেখতে পাবে। এ যেন দু-চোখ দিয়ে এমেরালডাকে গিলে খেতে চায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এমেরালডা এখন ভয় পায় ওকে দেখলে।

চারদিকে ঘুরে এমেরালডা একবার দর্শকদের অভিবাদন করে এল, জালি ততক্ষণ মুদ্রাগুলো জড়ো করে ফেলেছে। সেগুলি থলের ভিতর পুরে জালিকে কোলে তুলে নিয়ে ফুলন্ত গোলাপ-লতার মত এমেরালডা দ্রুতপদে চলে গেল রাস্তা ধরে।

যে-লোকটিকে দেখে ভয় পেয়েছিল এমেরালডা, সেও বিরক্তমুখে এসে দাঁড়াল রাস্তায়। ওদিক থেকে বোকা পোপের মিছিল তখন এসে গিয়েছে। মিছিলের পুরোভাগে দোলার ওপরে কোয়াসিমোডো।

লোকটি কোয়াসিমোডোকে ওই অবস্থায় ওই বিটকেল সাজপোশাক-পরা অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভীষণ রেগে গেল হঠাৎ। তীক্ষ্ন ভাষায় গালি পাড়তে লাগল তাকে। কোয়াসিমোডো কানে শোনে না—নোৎরদামের দু ডজন ঘণ্টার ঐকতান বাজনা নিত্য নিত্য শুনে শুনে সে একেবারে বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছে ইদানীং।

লোকটির কথা সে শুনতে পেল না, কিন্তু তার ক্রুদ্ধ ভাবভঙ্গী বুঝল। তাড়াতাড়ি সে দোলা থেকে নেমে পড়ল।

মিছিলের লোকেরা তা শুনবে কেন? তারা কি অত সহজেই তাদের পোপকে যেতে দেবে? পোপ বাদ দিয়ে পোপের মিছিল হয় নাকি? তারা ভর্ৎসনাকারী আগন্তুককে শাসাতে শুরু করল।

তাতে কিন্তু ফল হল উলটো। কোয়াসিমোডোই রুখে দাঁড়াল এবার মিছিলওয়ালাদের ওপরে। তার সেই ক্রুদ্ধ মহিষের মত মূর্তি দেখে কেউ আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। ক্লড—হ্যাঁ, এই আগন্তুকই ক্লড ফ্লোরো—তাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়লেন।

এই গলিরই বিপরীত মুখ থেকে ছোট একদল রাজসৈন্য আসছিল ঘোড়া ছুটিয়ে। হঠাৎ গলির মাঝামাঝি তাদের কানে গেল একটা আর্তনাদ—বিপন্ন কোন রমণীর আর্তনাদ বলেই মনে হয় যেন। তারা আরও তাড়তাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে এল বিপন্নকে রক্ষা করবার জন্য।

রাজসৈন্যদলকে আসতে দেখে ক্লড ফ্লোরো সুট করে একটা চোরাগলিতে ঢুকে পড়লেন। তাঁকে পালাবার সুযোগ দেবার জন্যই কোয়াসিমোডো দাঁড়িয়ে রইল পথ আগলে। তার মুখে মাথায় একটা রুমাল চাপানো—যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। ক্লডই চাপিয়েছিলেন এ-রুমাল· কারণ কোয়াসিমোডোর মুখ একবার যে দেখবে, সে তো আর ভুলবে না!

যে-মেয়েকে নিয়ে এত ঝামেলা, সে পালাতে পারে নি তখনও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার কোলের সাদা ছাগশিশুটা এক একবার আর্তস্বরে ব্যা ব্যা করে ডেকে উঠছে রাজসৈন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য।

সৈন্যরা কোয়াসিমোডোকে ধরে বেঁধে ফেলল। যতই অমানুষিক শক্তি তার দেহে থাকুক, গোটা একটা সৈন্যদলের সঙ্গে লড়তে যাওয়ার কোন মানে হয় না, তা বোঝে কোয়াসিমোডো। কাজেই সে বাধা দিল না। করল না পালাবারও চেষ্টা। প্রভুকে সে পালাবার সময় দিতে চায়।

তরুণ সৈন্যাধ্যক্ষ এমেরালডার দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি যেতে পার।"

এমেরালডা সৈন্যাধ্যক্ষের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। মিষ্টি বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"প্রভুর নামটি জানতে পারি?"

তরুণ সৈন্যাধ্যক্ষ সুন্দরী বেদেনীর প্রশ্ন শুনে হাসলেন, হেসেই বললেন—"নাম? আমার নাম ফিবাস।"

২

অভাগা গ্রিঙ্গয়ার পথে পথে ঘুরছে ততক্ষণ। কোথায় যাবে? হোটেলে ঢুকতে গেলে মার খেতে হবে। হায় নাট্যকারের বরাত! নাটক যে জমল না—সেটা তার দোষ নয়, গোলমাল

করেই দশজনে জমতে দিলে না বইটাকে। ফলে একটি ফ্রাংক সে পেল না পুরস্কার, ফলে উপবাস আসন্ন ও অনিবার্য।

দিশেহারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে পথে পথে ঘুরছে। রাত দুপুর হয়ে গেল। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় এসে পড়েছে—খেয়ালই করতে পারছে না। শহরের এসব গলি-ঘুঁজি তার একেবারেই অপরিচিত। এমন সব নোংরা জায়গা সুরম্য প্যারি শহরে যে আছে, সে ধারণাই ছিল না তার।

যে দিকেই যায়—আবর্জনার পাহাড়। চারদিকে বোটকা গন্ধ। মাঝে মাঝে লোক দেখা যায়—তারা প্রত্যেকেই ভিখারী। কেউ কানা, সামনে লম্বা লাঠি ঠকঠক করে পথ চলছে। কেউ পথ চলছে—একটা ধামার ভেতর বসে বসে পা তার পঙ্গু, খাড়া হয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই। বলা বাহুল্য, এ কানাও কানা নয়, এ পঙ্গুও পঙ্গু নয়। সব ভান।

দুজন নয় দশজন নয়—শত শত ভিখারী। এত ভিখারী এত রাত্রে এখানে করে কী? কেনকতক এসে গ্রিঙ্গয়ারকে ধরল—

"আমাকে ধরছ কেন?" ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করে গ্রিঙ্গয়ার—"আমি পুলিস ডাকব—"

"পুলিস?"—অট্টহাস্য করে ওঠে ভিখারীরা—"এখানে পুলিস? আমাদের এ অঞ্চলে আমাদের রাজ্য। ফরাসী দেশের পুলিসের বা সৈন্যদলের কোন এক্তিয়ার নেই এখানে। আমাদের রাজ্যের নাম জানো না? কোর-দ্য-মিরাক্‌ল। আজব দেশ! চল, আজব দেশের রাজার কাছে। এখানে বাইরের লোক যারা ঢোকে তাদের ফাঁসিই দিই আমরা। চল, সেই ফাঁসিরই ব্যবস্থা করি গিয়ে।"

ফাঁসি? ওরে বাব্বা! ফাঁসি যাবার মত কী অপরাধ সে করেছে, গ্রিঙ্গয়ার তা বুঝে উঠতে পারে না। না হয় অজান্তে নিষিদ্ধ দেশে এসেই পড়েছে, তার দরুন দু ঘা মেরে তাড়িয়ে দিলেই তো যথেষ্ট সাজা হয়। লঘু পাপে এমন গুরু দণ্ডের কথা এর আগে কেউ শুনেছে না কি?

গ্রিঙ্গয়ারের কোন আপত্তিতে কান দিলে না কেউ। হিঁচড়ে নিয়ে গেল তাকে রাজার কাছে। একটা ছোট মাঠের ভেতর সারি সারি আগুন জ্বলছে। একপাশে উঁচু কাঠের বাক্সের ওপরে বসে আছে এক ছেঁড়াকাপড়-পরা ভিখারী। সেই নাকি এদের রাজা। তার দিকে এক নজর তাকিয়েই কিন্তু গ্রিঙ্গয়ার চিনল তাকে—এ সেই ক্লোপিন, সন্ধ্যাবেলায় প্যালেই-দ্য-জাস্টিসে "দে বাবা একটা ফ্রাংক ফেলে দে" বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার নাটকের পিণ্ডি চটকাচ্ছিল যে ভিখারীটা।

বিদেশে বিভুঁয়ে চেনা লোক দেখলে একটু সাহস হয়। কোর মিরাক্‌ল তো প্যারির

বুকের ওপরে থেকেও ভদ্র প্যারিবাসীর পক্ষে বিভুঁয়ের চরম! কাজেই এই ভিখারীর রাজ্যে ক্লোপিনকে দেখে ভরসা পেল গ্রিঙ্গয়ার।

"রাজা! আপনি আমাকে দেখে থাকবেন আজই সন্ধ্যায়—সেই প্যালেই-দ্য-জাস্টিসে। আমারই নাটক সেখানে আমিই অভিনয় করছিলাম। আপনি তো উপস্থিত ছিলেন সেখানে।"

"তা ছিলাম"—তিক্ত স্বরে বলল ক্লোপিন—"তাতে কী? সন্ধ্যাবেলায়ই তুমি অনেক বিরক্ত করেছ। এখন রাত দুপুরে ঝামেলা করো না। ভালো মানুষের মত ঝুলে পড়। ওরে, কেউ ফাঁসিকাঠটা খাটিয়ে ফেল। আর ওদের ডাক—মিশর-বোহেমিয়ার চিউক হুডিয়ানিকে আর গ্যালিলির বাদশা রুশোকে। আমি থিউনের রাজা একা হুকুম দিলে তো হবে না।"

কয়েকজন গিয়ে নেশায় ধরাশায়ী ডিউক এবং বাদশাকে জাগাবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করতে লাগল। আর কয়েকজন খাটিয়ে ফেলল একটা ছোট আকারের ফাঁসিকাঠ। একটা টুলের ওপর গ্রিঙ্গয়ারকে খাড়া করে দেওয়া হল সেই ফাঁসিকাঠের ঠিক নীচে। ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেওয়া হল তার গলায়।

গ্রিঙ্গয়ার ভগবানকে ডাকছে মনে মনে। এদের কারও প্রাণে এক বিন্দু দয়া নেই, ভরসা শুধু সেই দয়াময় ভগবান।

থিউনের রাজা ক্লোপিন বলছে—"একজন দাঁড়া আসামীর পেছনে। আমি এক, দুই, তিন গুনব। তিন গোনবার সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে টুলটা ফেলে দিবি। ব্যস!"

এই বলে সঙ্গে সঙ্গে গুনে চলল—এক—দুই—

কিন্তু তিন গোনবার আগে থিউনের রাজা ঢোক গিলল—"ওরে, একটা কথা ভুলে গেছি যে! ফাঁসিতে লটকাবার আগে তো একবার মেয়েদের জিজ্ঞেস করতে হয়—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ"—ধরাশায়ী মিশব-বোহেমিয়ার ডিউক এতক্ষণে উঠে বসে বলল—"হাঁ, যদি কোন মেয়ে ওকে নিতে রাজী হয়, তবে ওকে ফাঁসি দেওয়া চলবে না।"

"ফাঁসির দরকারও থাকবে না"—ডিউকের কথার সমর্থন আসে গ্যালিলির বাদশার কাছ থেকে।

ফাঁসকাঠ ঘিরেই দাঁড়িয়েছিল অনেক নারী। আরও অনেকে মাঠের এখানে-ওখানে আগুন জেবলে খাবার তৈরি করছিল। নানাবয়সের নানারকমের ভিখারিনী। বুড়ীরা তো নিস্পৃহ—সবাই এক কথায় বাতিল করে দিল গ্রিঙ্গয়ারকে। "ওকে নিয়ে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে? ও না জানে চুরি করতে, না পারে ছোরা বসাতে। ভিক্ষে করতে তো জানেই না! দেখছ না—ও ভদ্দর লোক?"

যাদের বয়স অল্প, তারা দু একজন এগিয়ে এসে ভাল করে দেখল গ্রিঙ্গয়ারকে। চেহারা ওর অপছন্দ করবার মত নয়। কিন্তু ওই সমস্যা! ওকে বসিয়ে খাওয়াবে কে?

থিউনের রাজা ধৈর্য রাখতে পারছে না আর সে চেঁচিয়ে বলল "তাহলে ওর ফাঁসিই হোক? কোন মেয়ে যখন ওকে নিচ্ছে না—"

একটি মেয়ে ঠিক তক্ষুনিই এসে ঢুকেছে মাঠে। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল "আমি নেব! আমি নেব! ফাঁসি দিও না ওকে!"

সে মেয়ে লা-এমেরালডা।

গ্রিঙ্গয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে দিল থিউনের রাজা। পাদরী ডাকতে হল না, বাইবেল পড়তে হল না, একটা মেটে হাঁড়ি এমেরালডা এগিয়ে দিল গ্রিঙ্গয়ারের দিকে, আর গ্রিঙ্গয়ার লাথি মেরে সেটা ভেঙে ফেলল। এই হল কোর-মিরাকল বা আজব দেশের বিয়ে।

বিয়ের পর এমেরালডা ওকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। রান্না করল, জালিকে খেতে দিল, গ্রিঙ্গয়ারকেও খেতে দিল। ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলছিল—যা পেল, গোগ্রাসে গিলে ফেলল গ্রিঙ্গয়ার। তারপর নিজের ঘরের ভেতরই আলাদা বিছানা করে ওকে শুতে দিল এমেরালডা। স্পষ্ট ভাষায় বলল—"ও বিয়ে বিয়েই নয়। শুধু তোমার প্রাণটা বাঁচাবার জন্যই হাঁড়ি-ভাঙার তামাশায় যোগ দিতে হয়েছে আমাকে। তুমি এখানে থাকতে পাবে—এই পর্যন্ত। তোমাতে-আমাতে সম্পর্ক কিছু নেই। সে-রকম সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা যদি কর, তোমার প্রাণটি যাবে, নিশ্চয় জেনো।"

গ্রিঙ্গয়ার অল্পে খুশী। জোর তো কিছু নেই। প্রাণ বাঁচিয়েছে বলে লা-এমেরালডার ওপর সে কৃতজ্ঞ। বেশী আশা করে উপকারিণীর বিরক্তি সে উৎপাদন করবে না।

* * * *

কোয়াসিমোডোর বিচার হচ্ছে। একটি সুন্দরী বেদেনীকে প্রকাশ্য রাজপথ থেকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল—এই তার অপরাধ। রাজসৈন্যদল এসে মেয়েটিকে রক্ষা করে। সাক্ষ্য দিলেন নিজে কাপ্তেন ফিবাস, যিনি রক্ষা করেছিলেন ওকে।

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি দোষ স্বীকার করছ?"

হায় রে! কোয়াসিমোডো যে বদ্ধ কালা, তা বিচারক কেমন করে জানবেন?

বিচারকের মুখ নড়তে দেখে সে বুঝল—তাকেই কিছু জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে সে বলল—"আজ্ঞে আমার নাম কোয়াসিমোডো।"

বিচারক রেগে গেলেন, কারণ তিনি ভেবেছেন—লোকটা পরিহাস করছে তাঁর সঙ্গে, এক প্রশ্নের আর এক উত্তর দিয়ে। গলা চড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি আর একবার জিজ্ঞেস করলেন—"দোষ স্বীকার করছ কি না?"

কোয়াসিমোডো বলল—"বয়স? তা চব্বিশ পঁচিশ হবে!"

বিচারক আর তার কুৎসিত মূর্তির দিকে দৃক্‌পাত করলেন না—খসখস করে দণ্ডাজ্ঞা লিখে ফেললেন—"একঘণ্টা ধরে চাবুক মেরে আর-এক ঘণ্টা রোদে ফেলে রাখা হবে।"

একে তো গুরুতর অপরাধ, তায় বীভৎস চেহারা, তার ওপরে খোদ বিচারককে পরিহাস—কঠোর দণ্ড হবে বইকি!

পরদিন সকালে চৌমাথায় উপুড় করে বেঁধে তার পিঠে একঘণ্টা ধরে চাবুক মারল জল্লাদ। পিঠ কেটে ধারায় রক্ত ছুটছে, আর দর্শক জনতা করছে উল্লাসের ধ্বনি। কোয়াসিমোডোর মুখ থেকে প্রথম চাবুকের ঘায়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার একটা গোঙানির শব্দ শোনা গিয়েছিল, তারপর আর কোন সাড়া দেয় নি সে এক ঘণ্টার ভেতরে। মুখ গুঁজড়ে সে পড়ে আছে, একমাত্র চোখে যেন রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে, মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে ফেনা।

এক ঘণ্টা ক্রমাগত চাবুক মেরে তারপর জল্লাদ চলে গেল—রুমাল দিয়ে চাবুকের রক্ত মুছতে মুছতে। কোয়াসিমোডোর দেহটা যেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে—তা মুছিয়ে দেবার কেউ নেই কোথাও।

রোদ চড়ছে। আরও একঘণ্টা এই রোদে তাকে পড়ে থাকতে হবে। বিচারকের তাই আজ্ঞা।

রোদ চড়ছে। পিপাসা পাচ্ছে কোয়াসিমোডোর। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গলা বুক জ্বলে যাচ্ছে। অসহ্য যাতনায় হতভাগ্য কঁকিয়ে উঠল—"জল! এক ফোঁটা জল!"

জনতা তখনও যায় নি। তারা আরও কিছু মজা দেখবার আশায় ছিল। সে-আশা ওই যে পূর্ণ হচ্ছে বুঝি! জানোয়ারটা জল খেতে চাইছে। হাঃ হাঃ হাঃ—চাবুক খেয়ে কাঁদল না, এখন জলের জন্য কাতরাচ্ছে? অ্যাঁ? অবাক্ কাণ্ড তো!

লা-এমেরালডা নাচ দেখাচ্ছে নদীর ধারে। তাকে ঘিরে আছে ছোটখাট এক জনতা। একটু আগে এই জনতাই পরম কৌতুকে কোয়াসিমোডোর চাবুক-খাওয়া দেখছিল। তখন ওরা মজা পাচ্ছিল বেশী, না এখন, তা ওদের জিজ্ঞেস করলে, ওরা হয়তো একটু ভেবে বলবে—"তা দুটোতেই মজা আছে তো! সমান সমানই বলতে হবে।"

দূর থেকে ভেসে আসছে সেই কাতর আর্তনাদ—"এক ফোঁটা জল গো, এক ফোঁটা জল দাও!" জবাই করার সময় শূকর যেরকম করে আর্তনাদ করে—সেই রকম ভাবেই হাহাকার করছে কোন্ অভাগা। জনতা শুনেও শুনল না, কিন্তু নাচতে নাচতে এমেরালডা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। এ কী কান্না? রাজধানীর বুকের ওপর কোন্ অভাগা এমন জলের অভাবে শুকিয়ে মরছে? কেউ জল দেবে না? লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের সামনে একটা মানুষ জলের অভাবে শুকিয়ে মরে যাবে?

জালি মুদ্রাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করছিল, তার দিকে ছুটে গিয়ে এমেরালডা জালিকে বুকে তুলে নিল। পড়ে রইল কষ্টার্জিত অর্থ, সে ছুটল স্বর লক্ষ্য করে—"আহা-হা! কে কাঁদে গো জলের জন্য? এই যে জল! এই যে—"

ছুটতে ছুটতে এমেরালডা গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সেই অভাগার পাশে যার রক্তাক্ত

দেহ ঘিরে হাজার মানুষ তখনো মজা দেখছে। "এই যে জল—খাও গো, জল খাও—" নিজের পিঠে ঝোলানো জলের বোতলটি কোয়াসিমোডোর মুখে তুলে ধরল এমেরালডা।

জনতা নিস্তব্ধ। ব্যাপারটা তারা বুঝতে পারছে না বোধ হয়। দু একজন—বেয়াড়া রকম সাবধান যারা—মাথা নেড়ে বলল—"তা, বিচারক এমন কথা তো বলেন নি যে জল চাইলে ওকে জল দেওয়া যাবে না। তবে, মজাটা মাটি হল।"



জলের বোতলটি কোয়াসিমোডোর মুখে তুলে ধরল এমেরাল

* * *

সেদিন রাত্রে।

ক্লড ফ্লোরোর ভাই জিহান বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। রাত্রি এক প্রহরের সময় জিহান নোৎরদামে গিয়ে দাদাকে ধরেছে—"কিছু বাড়তি টাকা দাও, বিশেষ দরকার।"

ক্লডের এই এক দুর্বলতা। ছোট ভাইকে প্রাণের মত ভালবাসেন। পড়াশোনা খাওয়া-দাওয়ার জন্য ওকে দরাজ-হাতে অর্থ তো তিনি দিয়েই থাকেন, তবু মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত অর্থের জন্য জিহান এসে উৎপাত করে, ক্লডও না দিয়ে পারেন না। রাগ যতই দেখান, শেষ পর্যন্ত দিতেই হয়।

আজও দিতে হল। কিন্তু দেবার পর গোপনে তিনি পিছু নিলেন জিহানের। এত রাত্রে অর্থ নিয়ে জিহান কীভাবে ওড়ায়, তা দেখতে হবে। নিজের চোখে দেখা থাকলে পরের বার জিহানকে ধমকানো যাবে সেই কথা বলে। তিনি পিছু নিলেন।

রাস্তায় জিহান গিয়ে মিলল এক সৈনিক পুরুষের সঙ্গে—"ফিবাস, চল স্ফূর্তি করে আসা যাক।"

ফিবাস? নামটি শ্বনেছেন তো ক্লড! সেদিন যে এমেরালডাকে উম্ধার করেছিল—সেই না?

তিনি পিছ্ব নিলেন। আগে আগে যাচ্ছে জিহান আর ফিবাস। ফিবাস বলছে—"একটি ফ্রাংক নেই পকেটে। অথচ এক বান্ধবী নিমন্ত্রণ করেছে—না যাওয়াটা কেমন হয়?"

"যাবে বইকি! নিশ্চয় যাবে। আমি তোমায় ধার দেব—" সোৎসাহে বলে ওঠে জিহান। "বন্ধ্ব যদি বিপদের সময় বন্ধ্বকে না দেখে, তবে দেখবে কে?"

এক হেটেলে ঢ্বকে দ্ববন্ধ্ব খানাপিনা করল, তারপর দ্বজন চলে গেল দ্বদিকে। ক্লড পিছ্ব নিলেন ফিবাসের। কে তার বান্ধবী, দেখতে হবে। এমেরালডা নয় তো? ভাবতেই মাথায় খ্বন চেপে যায় ক্লডের।

নদীর ওপরই একটা কাঠের ঘর। জানালা দিয়ে লাফ দিলে নদীর জলে পড়তে পারে মান্বষ।

হঠাৎ একটা চিৎকার সেই ঘর থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে একটা মান্বষ সীন নদীর জলে।

বাড়িটা এক ব্বড়ীর। সে এক রাত্রির জন্য ওপরের ঘরখানা ভাড়া দিয়েছিল লা-এমেরালডাকে।

প্বলিস এসে দেখল—কাপ্তেন ফিবাস মারাত্মক রকম আহত হয়ে পড়ে আছেন ঘরে। আর অদ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সেই বেদেনী, যাকে লোকে জানে লা-এমেরালডা বলে।

ক্লডই যে ওপরের জানালা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন নদীর জলে, তা প্বলিস জানল না। কারণ ফিবাস বা এমেরালডা কেউ তাঁর অস্তিত্বই টের পায় নি, যতক্ষণ না তিনি ছোরা বসিয়েছিলেন ফিবাসের ব্বকে। আর তাঁর ম্বখ ঢাকা ছিল তখন।

৩

লা-এমেরালডার বিচার হচ্ছে। কাপ্তেন ফিবাসকে মারাত্মক ভাবে জখম করার অপরাধে।

প্যারির জনতা কী চপলমতি! কাল পর্যন্ত এমেরালডা বলতে প্যারি শহরের প্রত্যেকটা মান্বষ ক্ষেপে উঠত। তার নাচ, তার র্বপ, তার জালি—সব নিয়ে সে যেন তাদের চোখে পরীরাজ্যের কোন কুহ্বকিনীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমেরালডাকে একবার দিনান্তে যে-প্বর্বষ দেখতে না পেত, সে মনে করত দিনটা ব্থাই গেল।

আর আজ? চকিতে পাশা উলটে গিয়েছে। এমেরালডা ছোরা মেরেছে কাপ্তেন ফিবাসকে? কী ভয়ানক! উঃ! মেয়েটা এমন সাংঘাতিক?

যারা বেশী চালাক, তারা মাথা নেড়ে বলল—"মেয়ে তুমি কোথায় দেখেছ? ও হল শয়তানের সহচরী, খাঁটি ডাইনী। তা নইলে অমন করে হাজার লোককে ম্বগ্ধ করে রেখেছে

এতদিন? আর ওই ছাগলটা! ওটাই হল ছদ্মবেশী শয়তান। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে শয়তানী মতলব জোগায় ডাইনীকে!”

বিচার শুরু হল। এমেরালডা শুধু বলে—সে কিছু জানে না। একটা লোক কোথা থেকে এসে ফিবাসকে ছুরি মারল, মেরেই জানালা দিয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়ে পালাল। ফিবাস মরে গিয়েছে মনে করে এমেরালডা পড়ল অজ্ঞান হয়ে। আর সে কিছু জানে না। আততায়ীর মুখ সে দেখতে পায় নি। মুখ তার রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল।

সে-কথা কি আর আদালত বিশ্বাস করে?

তাছাড়া, এক সময় এমেরালডাকে সব অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করতেই হল!

হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হল—নির্যাতনের মুখে পড়ে। যন্ত্রণাগারে নিয়ে গিয়ে পুলিস তার পায়ে লোহার জুতো পরিয়ে দিল। সে জুতোর পেঁচ আছে একটা। পেঁচ কষে দিতেই জুতো ছোট হয়ে আসছে, চেপে দুমড়ে পিষে ফেলছে এমেরালডার কোমল পা দুখানা।

যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল এমেরালডার মুখ। সে ককিয়ে উঠে বলল—“কী? কী স্বীকার করতে হবে, বল। স্বীকার করছি, সব স্বীকার করছি আমি।”

“বল- তুমি ডাইনী?”

“হ্যাঁ—আমি ডাইনী।”

“তুমিই ছোরা বসিয়েছে ফিবাসের বুকে?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ—বসিয়েছি! বসিয়েছি।”

ব্যস, আর যায় কোথায়! বিচারক যন্ত্রণাগারে এসেই তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে নিলেন। তারপর বিচারাসনে ফিরে গিয়ে রায় দিলেন—“আসামী অপরাধ স্বীকার করেছে। ওকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হল।”

এখন গ্রিঙ্গয়ার গোপনে হাজির ছিল বিচারালয়ে।

লা-এমেরালডাকে সত্যিই ভালবাসে কোর-মিরাক্‌লের বাসিন্দারা। সেদিন রাত্রে যখন এমেরালডা ঘরে ফিরল না, গ্রিঙ্গয়ার চিন্তায় পড়ে গেল। প্রভাতে সে থিউনের রাজা, মিসর-বোহেমিয়ার ডিউক এবং গ্যালিলির সম্রাট্‌কে জানাল সে কথা। সবাই হুকুম দিল, “আজ ভিখারীরা শহরের যে-দিকেই যে যাক, চোখ-কান খোলা রাখবে, লা-এমেরালডার খবর সংগ্রহ করার জন্য।”

খবর কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করল গ্রিঙ্গয়ারই। এক বেদেনী ছোরা মেরেছে কাপ্তেন ফিবাসকে। বিচার হচ্ছে তার প্যালেই-দ্য-জাস্টিসে।

খবর পেয়ে গ্রিঙ্গয়ার বিচারালয়ে গিয়ে এক কোণে দাঁড়াল। চাক্ষুষ দেখল লা-এমে-রালডাকে। সে গিয়ে খবর দিল কোর-দ্য-মিরাক্‌লে।

ভিখারী রাজ্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এ রাজ্যের বাসিন্দা দু একজন ফাঁসিতে লটকে থাকে অমন। তাতে এরা বড় একটা কিছু মনে করে না। কায়দায় পেলে ওরাও এদের ছেড়ে কথা কয় না। এরাও সভ্য মানুষদের লটকাতে পিছ-পা হয় না। চিরদিন চলছে এমনি। কিন্তু তা বলে লা-এমেরালডাকে?

না, এ কিছুতেই হতে পারে না। ছাড়িয়ে আনতে হবেই এমেরালডাকে। কি করে কী হবে—পরামর্শ করতে বসল থিউনের রাজা, মিসর-বোহেমিয়ার ডিউক, গ্যালিলির সম্রাট্।

মন্ত্রণাসভায় প্রধান মন্ত্রীর পদ পেল গ্রিঙ্গয়ার। ভিখারী হিসাবে তার কোন কৃতিত্বই নেই. কিন্তু সভ্য সমাজের সঙ্গে সংঘাতে সে নিশ্চয়ই ভাল পরামর্শ দিতে পারবে, কারণ সে নিজে শিক্ষিত ও সভ্য।

লা-এমেরালডার ফাঁসি হবে। কিন্তু ফাঁসির আগে হওয়া চাই প্রায়শ্চিত্ত। সেই রকমই রীতি। নোৎরদাম গির্জার সামনে ফাঁসির আসামীকে নিয়ে দাঁড় করানো হয়, কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর আর্কডিকন এসে তাকে আশীর্বাদ করেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। তারপর তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

লা-এমেরালডাকেও নিয়ে আসা হল নোৎরদামের সামনের প্রাঙ্গণে। পেছনে অগণ্য লোক। যারা একদিন রূপসী বেদেনীর নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে তারিফ করেছে, তারাই আজ তারস্বরে অভিশাপ করছে তাকে ডাইনী শয়তান বলে। জনতার প্রীতি এমনি বালির বাঁধই বটে।

রূপসী এমেরালডা! আজ কোথায় তার সে-রূপ! মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে. কালো হয়ে গিয়েছে, চোখ দুটি সর্বদাই যেন কী বিভীষিকা দেখছে. মাথার চুলে জটা বেঁধেছে, গায়ে সামান্য একটা শেমিজ ছাড়া আর কিছু নেই. লোহার জুতোর পেষণ পা-দুখানাকে করে রেখে গিয়েছে ক্ষতবিক্ষত।

তাকে এনে দাঁড় করানো হল গির্জার দেয়ালের ঠিক নীচে। সশস্ত্র প্রহরীরা জনতাকে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে, কাজেই এমেরালডার সামনে খানিকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। আর্কডিকন এলেন, নিয়ম-মাফিক অনুষ্ঠান সব একে একে সমাধা হল, তারপর ক্লড ফ্লোরো কাছে সরে এলেন এমেরালডার। জনতা বুঝল উনি অপরাধিনীকে ধর্মকথা শোনাচ্ছেন নিম্নস্বরে।

কিন্তু তা তো নয়, নিম্নস্বরে কথা কইছেন অবশ্য ক্লড, কিন্তু সে-কথা ধর্মকথা মোটেই নয়। তিনি বলছেন—“এখনও আমি বাঁচাতে পারি তোমায়. তুমি শুধু স্বীকার কর তুমি আমার হবে।”

এমেরালডা বলছে—নিম্নস্বরেই বলছে, কারণ গলা উঁচু করে কথা কইবার মত শক্তি তার দেহেই নেই আর—সে বলছে—“আমি শতবার মরতে প্রস্তুত কিন্তু তোমার মত শয়তানের কুপ্রস্তাবে রাজী হব না।”

"তবে মর—" বলে ক্রুদ্ধ আর্কডিকন পেছনে হটে গেলেন, নোৎরদামে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন নদীর দিকে। খেয়া নৌকোয় নদী পার হয়ে দিশাহারার মত ছুটে চললেন মাঠঘাট বন পাহাড় পেরিয়ে। দূরে—লোকালয় থেকে যত দূরে হয়। বিবেকের কশাঘাত তাঁকে উদ্দামবেগে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ তিনি কী করলেন? মহামান্য ধর্মযাজক তিনি, নারীর সৌন্দর্যের মোহে এ কী পদস্খলন হল তাঁর? হত্যা করলেন একটা নির্দোষ যুবককে, আবার সেই হত্যার পাপ মিছেমিছি মাথায় চাপিয়ে ফাঁসিতে ঝোলালেন ফুলের মত কোমল এক নিষ্পাপ বালিকাকে! কোন্ নরকে যে তাঁর স্থান হবে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

এদিকে ঘটেছে এক অঘটন—

ক্লড তো চলে গেলেন। তারপরই, নোৎরদামের দেয়াল বেয়ে ফাঁকা প্রাঙ্গণে লাফিয়ে পড়ল কোয়াসিমোডো, আর প্রহরীরা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এমেরালডাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার তর তর করে ওপরে উঠে গেল নোৎরদামের। দেয়ালের গায়ে গায়ে অনেক খোদাই করা মূর্তি রয়েছে, তাদেরই গায়ে মাথায় পা রেখে রেখে অনায়াসে ওপর নীচ করা যায়। অন্ততঃ কোয়াসিমোডো তা অনেকবারই করেছে আগে।

প্রহরীরা শোরগোল শুরু করল। সৈন্যদল এসে পড়ল। জনতা চিৎকার করতে লাগল একপাল রক্তলোলুপ নেকড়ের মত। দরজার দিকে ছুটল সবাই, ভেতরে গিয়ে কেড়ে আনবে অপরাধিনীকে।

কিন্তু কোয়াসিমোডো ও কী বলছে? গির্জার মাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে—"স্যাংচুয়ারি! স্যাংচুয়ারি!" স্যাংচুয়ারি কাকে বলে? কোন অপরাধী বা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি গির্জার ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেয়, তবে তাকে সেখান থেকে টেনে বার করবার ক্ষমতা রাজশক্তির নেই, বা তাকে বার করে দেবার অধিকার ধর্মযাজকদের নেই। যতক্ষণ পলাতক গির্জার ভেতর থাকবে, রাজদণ্ড স্পর্শ করতে পারবে না তাকে।

তাহলে উপায় কী? কোন উপায় নেই। সৈন্যদল ফিরে গেল, জনতাও ফিরে গেল নৈরাশ্যে। ফাঁসিটা দেখতে পাওয়া গেল না, কী আপসোস!

ক্লড গির্জায় ফিরলেন অনেক রাত্রে। এসে গির্জার ছাদে এমেরালডাকে দেখে তিনি তো অবাক্। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তখন দানবীয় উল্লাসে অন্তর তাঁর নৃত্য করে উঠল। হরিণী পালাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে আশ্রয় নিয়েছে বাঘের গুহায়!

কিন্তু তিনি যা ভেবেছিলেন তা হল না। কোয়াসিমোডো চোখে চোখে রাখছে এমেরালডাকে। ছাদের ওপর একটা ছোট্ট নিরালা ঘরে সে এমেরালডাকে রেখেছে, তাকে খাবার এনে দিয়েছে, বসন এনে দিয়েছে, আর রাত্রিবেলায় এমেরালডার ঘরের দ্বারে নিজে শুয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে।

কোয়াসিমোডো তার পিপাসার জলের ঋণ প্রাণ দিয়ে শোধ করবে।
পরের রাত্রে আর এক চমকপ্রদ ঘটনা।



এমেরালডাকে কাঁধে তুলে নিল কোয়াসিমোডো। পৃঃ—১৭৩

কোর-মিরাক্‌ল থেকে অভিযান করে বেরুলো হাজার ভিখারী। বন্দুক-তরোয়াল থেকে শুরু করে কোদাল কুড়ুল পর্যন্ত. যে যা অস্ত্র পেয়েছে, তাই নিয়ে তারা যাত্রা করেছে, নোৎরদাম থেকে তাদের আদরের এমেরালডাকে কেড়ে আনবার জন্য। রাজ-সৈন্য এসে পড়ার আগেই তারা কাজ সমাধা করবে। তাই দ্রুত পথ চলছে তারা, যথাসম্ভব নিঃশব্দে।

কিন্তু সজাগ প্রহরী কোয়াসিমোডোর চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য কি তাদের! নিস্তব্ধ নিশীথে নোৎরদামের ছাদে দাঁড়িয়ে কোয়াসিমোডো দেখল—পিলপিল করে কাতারে কাতারে মানুষ এসে গির্জায় ওঠবার চেষ্টা করছে। একটা বিরাট মই দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে তাই বেয়ে উঠছে তারা। প্রায় পঞ্চাশটা লোক উঠেছে মইয়ে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ওপরের লোকগুলি লাফিয়ে পড়ে আর কি ছাদের মাথায়।

কোয়াসিমোডো সেই সময় মইয়ের মাথা ধরে দূরে ঠেলতে লাগল। দানবের শক্তি তার দেহে। পঞ্চাশটা মানুষের ভারে মইয়ের মাঝখানটা ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে। কোয়াসিমোডোর ঠেলায় সেই ধনুক সোজা হল, তারপর হেলতে লাগল বাইরের দিকে। একটা ভয়ার্ত হাহাকার উঠল ভিখারী-দের দলের ভেতর। মই পড়ছে! মই পড়ছে!

মই পড়ল, পঞ্চাশটা মাথা রাস্তার পাথরের ওপর ফটফট করে ফেটে ঘিলু আর রক্ত ছিটকে বেরিয়ে গেল। ওদিকে রাজসৈন্যরা এসে পড়ছে—বাকী ভিখারীরা পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

অভাগিনী এমেরালডা! তার এক বন্ধুর হাতে অন্য বন্ধুরা মার খেয়ে গেল, উদ্ধার হল না অভাগিনীর।

গ্রিঙ্গয়ার দাঁড়িয়ে ছিল একটু নিভৃতে। ক্লড এসে তার গায়ে হাত দিলেন—"এমেরালডাকে উদ্ধার করতে চাও তো এসো।"

গ্রিঙ্গয়ার যেন হাতে চাঁদ পেল, সে আশায় আশায় সঙ্গে চলল ক্লডের। ক্লড পেছনের দরজা দিয়ে নোৎরদামে ঢুকলেন, তারপর ওকে বললেন—"ছাদের ঘরে এমেরালডা আছে। তাকে গিয়ে বল—ফিবাস তার অপেক্ষায় আছে, তাহলেই সে আসবে—"

এমেরালডাও শুনেছে যে ছোরার আঘাতে মৃত্যু হয় নি ফিবাসের। নিজেও সে এই কয়েক-দিন বিশ্রাম পেয়ে একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে। রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুয়ে ছিল, ক্লডের ভয়ে। কিন্তু গ্রিঙ্গয়ার যখন ডেকে বলল—"আমি গ্রিঙ্গয়ার, ফিবাস তোমার অপেক্ষায় আছে শীঘ্র এসো" —তখন সে বেরিয়ে আসতে আপত্তি করল না। গ্রিঙ্গয়ার তাকে নিয়ে নেমে এল। ক্লড মাথায় মুখে কাপড় চাপা দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি ওদের পথ দেখিয়ে নদীর ধারে নিয়ে গেলেন।

ডিঙ্গি তৈরী ছিল। বহুদূর গিয়ে ডিঙ্গি থামল। আরোহীরাও নামল। গ্রিঙ্গয়ার জালিকে নিয়ে নামল, এমেরালডা নিজেও নামল ধীরে ধীরে। সব শেষে নামলেন ক্লড।

গ্রিঙ্গয়ার এই সময় এক কাণ্ড করল। সে কাউকে কিছু না বলে নিজের মনে কোথায় চলে গেল। এমেরালডা ফিবাসের জন্য পাগলিনী ; গ্রিঙ্গয়ারের সঙ্গে তার একটা বিবাহ হয়েছিল, তা সে যে-রকম বিবাহই হোক। সে-বিবাহকে কোন মূল্যই দিচ্ছে না ও। অভিমান হল গ্রিঙ্গয়ারের। যাক এমেরালডা ফিবাসের কাছে। গ্রিঙ্গয়ার ফিরেও তাকাবে না।

গ্রিঙ্গয়ার চলে গেল, এমেরালডা টের পাবার আগেই। যখন হুঁশ হল, তখন আর কোন উপায় নেই। সে দেখল—তার সম্মুখে ক্লড।

ক্লড বললেন—"শেষবার জিজ্ঞেস করছি, তুমি আমার হবে কি না? যদি না হও, তুমি মরবে।"

এমেরালডা বলল—"মরব, তবু তোমার হব না।"

ক্লড বললেন—"তবে মর।"

কাছেই রোলাণ্ড প্রাসাদের বাইরে একটা ভাঙা কুঠরি। এমেরালডাকে ধরে ক্লড সেইখানে এসে ডাকতে লাগলেন—"ভগ্নী গুডুল! ভগ্নী গুডুল!"

এক শীর্ণা বৃদ্ধা বেরিয়ে এল, চোখে তার হিংস্র দৃষ্টি—

ভগ্নী গুডুল, তুমি বেদেনীদের অভিশাপ না দিয়ে জল খাও না, এই একটা বেদেনীকে এনেছি। তুমি একে ধরে রাখো তো। আমি সৈন্যদের ডাকি, একে ফাঁসিতে লটকাব।"

গুডুল দু হাজ্ডিসার হাতে এমন শক্ত করে এমেরালডার হাত ধরল—হাত ভেঙে যায় বুঝি—"যাও, ডাক সৈন্যদের! দাও এটাকে ফাঁসি! দুনিয়ার সব বেদেনীকে ফাঁসি দাও। ওরা শেষ হয়ে যাক! আমার অ্যাগনেসকে ওরা চুরি করে নিয়েছে! আমার অ্যাগনেস! আমার অ্যাগনেস! তার একপাটি লাল জুতো যে এখনও আমি বুকে করে রেখেছি! আজ এই কুড়ি বচ্ছর!"

"একপাটি লাল জুতো?"—এমেরালডা চেঁচিয়ে ওঠে—"আমারও বুকে যে একপাটি লাল জুতো রয়েছে!"

"কই, দেখি, দেখি!"—গুডুল এত অবাক্ হয়েছে যে এমেরালডার হাত ধরে রাখার কথা আর তার মনে নেই।

আর অভাগিনী এমেরালডা—সেও এমন একটা চমক খেয়েছে যে হাত ছাড়া পেয়েও পালিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করল না। বুকের ভেতর থেকে বার করল একটা থলে। তার ভেতর রয়েছে একপাটি ক্ষুদে জুতো, পুঁতি-বসানো লাল ভেলভেটের জুতো—

আকুল স্বরে কাঁদতে কাঁদতে গুডুলও বার করেছে তার বুকের ভেতর থেকে সেই জুতোরই আর একপাটি।

"আমার অ্যাগনেস! আমার অ্যাগনেস!"

"মা! মা! মা! মা!"

সৈন্য নিয়ে ক্লড এলেন যখন, তখন প্যাকেট আর অ্যাগনেস জড়াজড়ি করে বসে আছে, আর হাপুস নয়নে কাঁদছে—দুজনেই কাঁদছে মা, মা করে।

সে-দুজনকে আলাদা করা সৈন্যদেরও সাধ্য হল না, তারা এক সাথে দুজনকেই টেনে নিয়ে চলল।

প্রত্যূষে নোৎরদামের ছাদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ক্লড আর কোয়াসিমোডো। দূরে বধ্যভূমি দেখা যায়। সেখানে ফাঁসিকাঠে একটা বালিকার দেহ হাওয়ায় দুলছে।

আর সেই মৃত বালিকার একখানা পা আঁকড়ে ধরে ঝুলছে আর একটা বুড়ী। সেও মরে গিয়েছে।

কী যেন দুর্নিবার আকর্ষণে সেই দৃশ্য টানছে ক্লডকে। ভালো করে দেখবার জন্য তিনি এগুতে লাগলেন। এক পা, দুই পা, একেবারে ছাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছেন ক্লড। হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল। ক্লডের মনে হল—তিনি পড়ে যাবেন এক্ষুনি। ভয়ার্তকণ্ঠে ডেকে উঠলেন—"কোয়াসিমোডো!"

কোয়াসিমোডো তাকিয়ে দেখল, কিন্তু হাত বাড়িয়ে টেনে আনল না প্রভুকে।

ক্লড পড়লেন সেই সাততলার ছাদ থেকে।

● ভিক্টর হ্যুগো

*　　　　*　　　　*

ফাঁসির আসামীদের মৃতদেহগুলো ফেলে দেওয়া হল মণ্টফকনের গুহায়।

এমেরালডার ফাঁসির বছর দুই পরে কোনও এক বিশেষ প্রয়োজনে সেই গুহার ভেতর ঢুকতে হয়েছিল সরকারী লোকদের। তারা দেখল—একটা নারীদেহের গলায় রয়েছে একটা রেশমী থলি। ফাঁসির সময় এমেরালডার গলায় এই থলি অনেকেই দেখেছিল।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার—এমেরালডার কঙ্কালকে জড়িয়ে রয়েছে একটা পুরুষের কঙ্কাল। এর পিঠে কুঁজ এখনো লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া এর মৃত্যু যে ফাঁসিতে হয় নি, তাও বোঝা যাচ্ছে। ফাঁসি যার হয়, তার গলার হাড় ভাঙে, এর ভাঙে নি।

কেউ কেউ বলল—এ সেই নোৎরদামের কোয়াসিমোডো।

• লেখক পরিচিতি



ভিক্টর হ্যুগো

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল মহামনীষী ভিক্টর মারি হ্যুগোর জন্ম হয় ফরাসী দেশে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। কৈশোর থেকেই সাহিত্য সাধনার দিকে ছিল তাঁর প্রবল আসক্তি, ততোধিক অনুরাগ ছিল সমাজের সর্বস্তরে মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের দিকে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি যে অনবদ্য সাহিত্যমঞ্জুষা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন, তা শুধু ফরাসী সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করে নি, যুগ যুগ ধরে সাহিত্য-রসিক সমাজকে এক সুমহান্ আদর্শবাদের সন্ধান দিয়ে চলেছে।

হ্যুগোর বৈশিষ্ট্যই হল অতি সাধারণ মানবের ভেতরে অতিমানবতার উন্মেষ সাধন। সামান্য সূচনা থেকে যেভাবে এর বিকাশ তিনি ফুটিয়ে তোলেন সংঘাত ও বিবর্তনের মাধ্যমে, তা শুধু মহত্তম স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। দীনতম পরিবেশের ভেতর নরদেবতার আবির্ভাব যে সচরাচরই ঘটে থাকে, তাই যেন হ্যুগো-সাহিত্যের চরম প্রতিপাদ্য। জাঁ ভ্যালজাঁ, গেলিয়াট, কোয়াসিমোডো প্রভৃতি চরিত্র ওই আবির্ভাবের দরুনই ধন্য হয়েছে, অমরত্ব লাভ করেছে।

লে মিজারাবল, হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম, টয়লার্স অব দি সী, নাইন্‌টি থ্রী, ক্রমওয়েল, লাফিং ম্যান প্রভৃতি গ্রন্থ মানবজাতির চিরন্তন সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর প্রত্যেকটি রচনাই রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। মানুষের ভেতর যতদিন অমৃতের পিপাসা বর্তমান থাকবে, ততদিন সমাদর থাকবে এদের।

হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম উপন্যাস—হ্যুগোর অন্যান্য রচনার মতই ঐতিহাসিক পটভূমির ওপরে সামাজিক কাহিনী। এ-কাহিনীর এক প্রান্তে লা-এমেরালডা, অন্য প্রান্তে কোয়াসিমোডো—বিউটি ও বীস্ট—পরী ও পশু। এমেরালডা মধুরে মধুর, কোয়াসিমোডো ভীষণে মধুর। পশুত্বের অন্তস্তল থেকে মানবতার জাগরণ ঘটেছে কোয়াসিমোডো চরিত্রে, সৃষ্টিচাতুরীর চরম উৎকর্ষ প্রকটিত হয়েছে ওর ভেতরে।

হ্যুগো শুধু উপন্যাস রচনাই করেন নি, নাটকেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অবশ্য বলিষ্ঠ আদর্শবাদের আলোক বিচ্ছুরণ করে তাঁর উপন্যাসগুলিই অর্জন করেছে কালজয়ী প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যু হয়।



অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সইয়ার

বড় নদী অর্থাৎ মিসিসিপি। তারই কূলে ছোট্ট শহর একটা। লোকসংখ্যার দিকটা বিবেচনা করলে গ্রাম ছাড়া একে আর কিছুই বলা চলে না, তবে পুলিস ফাঁড়ি কাছারি আদালত নায় পৌরসভা—সবই এতে রয়েছে কিনা, তাই ভদ্রতার খাতিরেই শহর বলতে হয় একে।

শহর ছোট্ট, কিন্তু নামটি জমকালো। সেন্টপিটার্সবার্গ। উত্তর আমেরিকার প্রথম শ্বেতকায় বাসিন্দাদের কেমন একটা অভ্যাস ছিল—পিতৃভূমি ইওরোপের বড় বড় নগরগুলোর নামে তাদের এই নতুন জংলা দেশের উঠতি উপনিবেশগুলির নামকরণ করা। তারই ফলে এই গ্রামের নাম হয়েছে সেন্টপিটার্সবার্গ, এর কয়েক মাইল দূরে এর মতই ছোট্ট আর একটা গ্রাম যা গজিয়ে উঠেছে, তাকে বলা হয় কনস্তান্তিনোপল।

এখন এই সেন্টপিটার্সবার্গের সব চাইতে ডানপিটে ছেলে হচ্ছে টম সইয়ার, বয়স বছর বারো। বাপ-মা নেই, মাসীর বাড়িতে মানুষ। মাসী পলি মানুষটি ভাল, মুখে যতই খরখর করুন, টমকে ভালবাসেন প্রাণের মত। তারই দরুন কড়া শাসন বস্তুটার সঙ্গে কোন দিনই পরিচয় হয় নি টমের, একটা ছোট্ট ছেলের মগজে যতরকম বদ বুদ্ধির সমাবেশ ঘটা সম্ভব, তা

ঘটেছে ওর মগজে। মারামারিতে ও পয়লা নম্বরের ওস্তাদ, আবার স্কুলে মাস্টারের হাতে বেত খাওয়াটাও ওর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

মাস্টার বেচারির দোষ নেই, দোষীর সাজা দিতে তিনি বাধ্য। টম পড়া তো করবেই না কোনদিন, বইয়ে কালি ঢেলে আনবে, ক্লাসে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি আঁকবে, নিত্য নতুন দুষ্টামির প্যাঁচে ফেলে নিরীহ শিক্ষকের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। একদিন হয়েছে কী, টম যথারীতি দেরি করে স্কুলে এসেছে। মাস্টার হাঁকলেন—"তোর এত দেরি কেন রে?" টম নিঃসংকোচে জবাব দিল—"রাস্তায় হাক ফিনের সঙ্গে দেখা হল কিনা, তাই একটু গল্প করছিলাম।"

স্কুলঘরের ভেতর সেই মুহূর্তে যদি বজ্রপাত হত, তাহলেও এর চেয়ে বেশী হতচকিত ভয়ার্ত হয়ে পড়ত না টমের সহপাঠীরা। মাস্টারমশাইয়ের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ডান হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে বেতের দিকে এগুচ্ছে। হাক ফিন? সেই হাঘরের বাচ্চার সঙ্গে গল্প? আবার সেই গল্পের কথা জাঁক করে এসে মাস্টারের কাছে ঘোষণা করা? সপাং-সপাং-সপ্-সপাং—

এখন হাক ওরফে হাকলেবেরী ফিন ছেলেটা উত্তরাধিকারসূত্রে বদনামের ভাগী। ওর বাপ বদ্ধ মাতাল, ভবঘুরে এবং চোর। কিছুদিন থেকে সে আর এ-গাঁয়ে বাস করছে না, কোন্ চুলোয় গিয়েছে, জানেও না কেউ। ত্রিসংসারে তার থাকবার ভেতর আছে ওই একটিমাত্র ছেলে—হাক তার নাম। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় হাককে সে নিয়ে যায় নি, হাকও বাপের খবরদারির হাত থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

সে কী খায়, সে কথা কেউ জানে না। সে কোথায় থাকে, সেটা অবশ্য জানে কেউ কেউ। রোজারদের খড়ের গাদায় তাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোতে দেখেছে কেউ কেউ কখনো কখনো। বৃষ্টি-বাদলার দিনে অবশ্য তাকে অন্য আশ্রয় খুঁজতে হয়। সে আশ্রয় হল—রাস্তার ধারের যে কোন একটা খালি পিপে। একটা পিপের ভেতরে ঢুকে আর একটা পিপে টেনে সামনে খাড়া করে দিলেই দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা হয়ে গেল, যার ভেতর শুয়ে বসে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বুড়ো আঙুল দেখানো খুবই সোজা।

হাকের পোশাক এক বিচিত্র বস্তু। কত জায়গায় যে তা ছেঁড়া, কত রকম রং-এর তালি যে তাতে, দেহের অনুপাতে কত লম্বা যে সে-পোশাক, এসব নিয়ে অন্যেরা যতই হাসাহাসি করুক, হাক তাতে কান দেয় না কখনও।

হাক স্কুলে যায় না, স্কুলের ছাত্রদের ওপর কড়া নিষেধ আছে মাস্টারমশাইয়ের কেউ যেন হাকের ত্রিসীমানাতেও কখনও না যায়। কারণ সে মাতালের ছেলে, নিজেও অবশ্যই একদিন মাতাল হবে, এখনই তো তাকে চুরুট খেতে দেখা যায় রাস্তায় রাস্তায়।

সেই হাক, সেই অসভ্য আঁস্তাকুড়বাসী পারিয়া ছোকরা, তার সঙ্গে কিনা টম দহরম মহরম করে এল? আর সেই কথা আবার এসে জোর গলায় মাস্টারমশাইকে বলতে গেল? আসলে

অবশ্য আড়ালে আড়ালে সব ছেলেই হাকের সঙ্গে আলাপচারি করে, ব্যবসাবাণিজ্যও চালায়। মার্বেলের বদলে ভাঙা ছুরি, বোতামের বদলে কাঁচপোকা, ভাঙা দাঁতের বদলে মরা ব্যাং—এই রকম লেনদেনের জোর বাণিজ্য তো চিরদিনই চলছে ছেলেমহলে।

হ্যাঁ, সব ছেলেই হাক ফিনের সঙ্গে কারবার করে থাকে। তবে আজ ধরা পড়েছে টম সইয়ার, মারও খেয়েছে বেধড়ক। কেন যে অত জাঁক করে সত্যি কথা বলতে গেল হতভাগা। অন্য কোন ওজর কি মাথায় এল না তার? অবশ্য, ওজর যা-ই খাড়া করুক, মার কিছু হতই। কিন্তু এ-রকম গোবেড়েন হত না।

আসল ব্যাপারটা হয়েছিল এই, হাক ফিনের সঙ্গে একটা সাংঘাতিক বন্দোবস্ত করে এসেছে টম। ব্যবস্থাটা এত বেশী সাংঘাতিক যে তা করে আসার পর থেকে মাথা আর ঠিক নেই বেচারির। ভয়ে, উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় সে অধীর হয়ে আছে একেবারে। তাই মাস্টার প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি কথাটাই টুক করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মিথ্যে একটা আবিষ্কার করতে হলে যে সময়টুকু তার পেছনে দিতে হয়, তা পায় নি ও।

এখন বন্দোবস্তটা হল এই। ঠিক রাত দুপুরে ওরা দুজনে আজ কবরখানায় যাবে। ভূত দেখবার জন্য।

ভূত? হ্যাঁ, ভূতই। খোঁড়া উইলিয়াম মারা গিয়েছে আজ চার দিন হল। তাকে কবর দেবার পর তিন দিন পেরিয়েছে। আজই রাত দুপুরে সে কবর থেকে উঠবে ভূত হয়ে। তাকে দলভুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্বপরিচিত লোকদের প্রেতাত্মারাও অবশ্য জমায়েত হবে তার কবরের পাশে। সবে জড়িয়ে একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা হবে নিশ্চয়। হাতে পেয়ে সে-অভিনয় দেখবার সুযোগ কি ছাড়তে পারে টম আর হাকের মত দুটো বেপরোয়া দুর্ধর্ষ বালক? যাবে ওরা, যাবেই। কাছাকাছি লুকিয়ে থেকে ভূতেদের আনাগোনা স্বচক্ষে দেখে আসবে।

ব্যাপারটা হল এই। এমন একটা বন্দোবস্ত পাকা করে আসবার পরে হিসেব করে মিথ্যে কথা বলা টমের পক্ষেও সম্ভব হয় নি, তাই সে মার খেয়েছে।

*　　　*　　　*

দোতলার শোবার ঘরে দুদিকে দুটো বিছানা। এক বিছানাতে টম, অন্যটাতে তার ভাই সিড। সিডের নাক ডাকতে শুরু হয়েছে পাক্কা তিন ঘণ্টা আগে, টম কিন্তু ঘাপটি মেরে আছে তার লেপের নীচে। খবরদার, ঘুম-টুম কাছেও এসো না। ঠিক রাত এগারটায় হাক আসবে। এসে বেড়াল-ডাক ডাকবে একবার। ঘুম যদি এসে যায়, টম যদি সে ডাক শুনতে না পায়, হাক একাই চলে যাবে কবরখানায়, আর কাল সত্যি-মিথ্যে জড়িয়ে এমন সব গল্প শোনাবে টমকে, শুনে শুনে হাত কামড়াতে হবে টমকে।

নাঃ, প্রাণ গেলেও ঘুমিয়ে পড়া চলবে না কোনমতে।

ঘড়িটা বেজেই চলেছে থেকে থেকে। আধ ঘণ্টা পরে পরে বাজে, কোনবার একটামাত্র টং কোনবার অনেকগুলো টং টং। আটটা টং টম শুনেছে, তারপর একটা। নয়টা টং টম শুনেছে তারপর আবার একটা। দশটা টংও সে শুনেছে, তারপর আবার একটা টং শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে চুপি চুপি উঠে বসেছে বিছানার ওপরে। হাক আসবে এগারোটায়। যতক্ষণে রোজারদের খড়ের গাদার ভেতর থেকে আড়ামোড়া ভেঙে সে বেরিয়ে আসছে নিশ্চয়।

আরও কিছুক্ষণ গেল, তারপর নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে টম কোট গায়ে দিল। নিঃশব্দে জুতো পরল পায়ে। নিঃশব্দে—যাতে সিড হতভাগা কিছু টের না পায়। পেলে সে এখন কিছু বলবে না, তা টম জানে, কারণ টমকে সে যমেরই মত ভয় করে। এখন বলবে না কিছু কিন্তু কাল সকালেই উঠে পলি মাসীর কাছে আটখানা করে এমনভাবে লাগাবে—উঃ, এই সিডটা যদি ফেউয়ের মত লেগে না থাকত পেছনে!

"মিয়াও!"

একটা মিহি বেড়াল-ডাক শোনা গেল রাস্তার ওপরে। ঠিক টমের জানালার নীচে। টম ততক্ষণে তৈরী। নিঃশব্দে জানালা খুলে বেরিয়ে গেল। না, লাফিয়ে নামতে হবে না। একটা স্লেট-পাথরের ছাউনি-দেওয়া চালা নেমে গিয়েছে এইখানে, এই ঘরেরই জানালার নীচে দিয়ে। চালাটাতে কাঠকুটো ছাড়া আর কিছু থাকে না। জানালা দিয়ে বেরিয়ে সেই চালার ঢাল বেয়ে সাবধানে নেমে গেল টম। নীচেই বাড়ির দেওয়াল, দেওয়ালের নীচেই রাস্তা, সেই রাস্তাতেই হাক।

হাক ফিসফিস করে বলে—"আজ আর ঘুমোস নি তাহলে, সেদিনকার মত!"

"ধ্যেৎ! আজ আর ঘুমোলে চলে? এমন একটা সুযোগ—"

দুই বন্ধু দ্রুত কবরখানার দিকে হেঁটে চলে। রাস্তায় জনমনিষ্যি তো নেই-ই, একটা কুকুর পর্যন্ত না। আকাশে এক ফালি চাঁদ রয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝেই সে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে। আঁধারে আঁধারে দুটিতে চলেছে বেশ নিশ্চিন্দি।

নিশ্চিন্দি? তা হবে হয়ত। কিন্তু এটা ঠিক যে কবরখানা যত কাছে আসছে, ওদের গতিবেগ তত ঢিমে হয়ে আসছে। হাকের মনে কী হচ্ছে কে জানে, কিন্তু টমের তো এক একবার দুর্নিবার ইচ্ছে হচ্ছে টেনে পেছন পানে দৌড় মারবার জন্য। নিতান্ত, হাকের মত একটা নগণ্য জীবের কাছে চিরকালের জন্য খেলো হয়ে যেতে হবে, শুধু এই ভয়েতেই সে সাহসে বুক বেঁধে পথ চলেছে এখনও।

আহা! যদি সে কোনমতে জানতে পারত যে হাকের মনের ভাবটাও সেই মুহূর্তে ঠিক তারই মত, তাহলে কি আর সে এক পা-ও এগোয়? সে-রাত্রির অভিযানের তাহলে সেইখানেই ইতি হয়। এ-কাহিনীরও ইতি টানতে হয় সেখানেই।

বাস্তবিক, ভূত যতক্ষণ ভবিষ্যতের দর্শনীয় থাকে, ততক্ষণই তাকে দেখার আগ্রহ থাকে। ভূত যখন বর্তমানের বস্তু হয়, তখন সে বিভীষিকা ছাড়া আর কিছু নয়। রাত বারোটা বাজের

সঙ্গে সঙ্গেই খোঁড়া উইলিয়াম কবর থেকে বেরুবে এবং অপেক্ষমাণ আত্মীয় ভূতদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করবে কবরের চারধারে ঘুরে ঘুরে। আর ততক্ষণে হাক ফিন আর টম সইয়ার তাদের কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ভূতনৃত্য দেখে সারা অঙ্গে আনন্দ-শিহরন অনুভব করবে—

আনন্দ-শিহরন না ছাই। কবরখানার আধমাইল দূরে থাকতেই যে শিহরন তারা অনুভব করছে, তা আনন্দের মোটেই নয়, ভয়ের। এ-ভয়কে তারা দাবিয়ে রেখেছে শুধু লজ্জা দিয়ে। টম ভাবছে পালিয়ে গেলে আর হাকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না, হাক ভাবছে টমের সম্বন্ধে ঠিক ওই কথাই। কাজেই মনের ভাবনা মনেই রেখে তারা গুটি গুটি এক সময়ে গিয়ে কবরখানায় ঢুকল।

সদ্য-খোঁড়া কবরটাই খোঁড়া উইলিয়ামের, তাতে সন্দেহ নেই। সেই কবরের ঠিক পাশেই তিনটি ঝাড়ালো এল্‌ম্‌ গাছ। তার পেছনে স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকা চলে। লুকোলো ওরা দুজনে, কিন্তু লুকিয়েও ভূতের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না, এ-ভয়কে তারা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। কেবলই পেছনপানে তাকায়—ওই বুঝি কে ধরতে আসছে। থেকে থেকেই কান খাড়া হয়ে ওঠে—ওই বুঝি কার খোনা-সুরের কথা শোনা যায়।

চাঁদের আলো ক্ষীণ ফুটেছে, ক্ষণে ডুবছে, তারই ভেতর অপলক চোখে ওরা তাকিয়ে আছে সদ্য মাটি-ওলটানো কবরটার দিকে। রাত বারোটা বাজলেই ওই মাটি ফুঁড়ে উঠে পড়বে খোঁড়া উইলিয়াম—না, না, থুড়ি, খোঁড়াটোড়া নয়, মিস্টার উইলিয়াম! মিস্টার! মরা মানুষের সম্বন্ধে অসম্ভ্রম করে কথা কইতে নেই, বিশেষতঃ কবরখানায় বসে, রাত বারোটার সময়।

ঢং! ঢং! ঢং!—

গির্জার ঘড়িতে রাত বারোটা বাজে ওই! হাক ফিন আব টম দুজনেই দুটো পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ অনড়। ওই আসে বুঝি! ওই ওঠে বুঝি—

না, উঠছে না কেউ! কিন্তু ওই না আসছে কারা? কথা কইছে ফিসফিস করে? তিনটি আবছা মূর্তি দেখা যায়। ওই রে! ভূত না হয়ে যায় না, সত্যিই ভূতেরা এল। এইবার কবর ফুঁড়ে—

ভূত তিনটে কাছে এসে পড়েছে—কথা শোনা যাচ্ছে। হাক ফিন ফিসফিস করে বলল—"খোনা সুরের কথা তো নয়! ওরা ভূত নয় তাহলে! মানুষ! অন্ততঃ কথা কইছে যেটা, সেটা নিশ্চয় মানুষ—"

মানুষ? চকিতে ভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে টম সইয়ার সতর্ক হয়ে উঠল। মানুষ হলে তার সাথে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা করা চলে। তাতে পিছ-পা নয় টম সইয়ার। আর মানুষের সাথে ভূত অমন ঘনিষ্ঠ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কথা কইতে কইতে আসবে, এ তো সম্ভব নয়। মানুষ যদি হয়, তিনটেই মানুষ।

● অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সইয়ার

কাছে এসে পড়েছে। একেবারে কাছে। কবরের কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু মানুষ তিনটেই আসে নি। তারা একখানা হালকা ঠেলাগাড়িও নিয়ে এসেছে। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শুধু ছেলে দুটো।

একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে টুপি বগলে নিয়ে। হাক চমকে উঠে বলল—"ওরে! ডাক্তার রবিনসন নয়? যে ভাঙ্গা হাত-পা জোড়া দেয়?"

"নিশ্চয় ডাক্তার রবিনসন। কিন্তু অন্য লোক দুটো—"

ঠিক তক্ষুনি অন্য লোক দুটো মাথার টুপি ঠেলাগাড়ির ওপর ফেলে দিয়ে গাড়ি থেকে দুখানা কোদাল তুলে নিল। চাঁদও বেরিয়ে পড়ল সেই মুহূর্তে, আর ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে একটা ছেলে ফিসফিস করে উঠল "ইঞ্জন* জো"! আর একটা জবাব দিল—"জেফ পটার!"

এই দুটো লোক—বিশেষ করে ইঞ্জন জো যে কোন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এত রাতে কবরখানায় আসে নি, এটা বুঝতে যে কোন লোকেরই বেশী দেরি হওয়ার কথা নয়। দুনিয়ার হেন দুষ্কর্ম নেই—যা ইঞ্জন জো করতে না পারে, বা না করেছে। ওর সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকেরা কত কীই যে বলে আড়ালে! প্রকাশ্যে অবশ্য বলে না কেউ কিছু। ওকে ভয় করে সবাই যমের মত।

টম কানে কানে বলে—"একদম নড়ন-চড়ন নয়। আমরা এখানে আছি জানলে ইঞ্জন জো ওই কোদালের দুই কোপে আমাদের দুজনের ধড় থেকে মাথা আলাদা করে ফেলবে—"

হাক শুধু নীরবে ওর গায়ে একটা টিপুনি দিল, যার অর্থ—"সে কি আর জানি নে আমি? আমি একদম চুপ থাকব।"

ততক্ষণে ইঞ্জন জো আর পটাব দুজনে কাজে লেগে গিয়েছে। কাজটা যে কী, তা দেখে হাক আর টমের চক্ষু ছানাবড়া। ওরা কোদাল দিয়ে খোঁড়া-উইলিয়ামের কবরটা খুঁড়ে ফেলছে আবার। এ কী ভয়ানক কথা! পাদরী সাহেব মন্ত্র পড়ে যাকে সমাধিস্থ করে গিয়েছেন, তার মৃতদেহ আবার কবর থেকে তোলা যে ভয়ানক অন্যায়, বে-আইনী এবং পাপের কাজ, তা বালক হলেও টমেরা জানে।

প্রশ্ন হতে পারে—খোঁড়া উইলিয়াম যদি নিজেই ভূত হয়ে কবর থেকে ঠেলে উঠত, তাহলে টমেরা করত কী! কেন? কিছুই করত না, সেটাতে কিছু অন্যায়ও দেখতে পেত না। মরার পরে কবর থেকে সবাই ওঠে। ভূত হয়ে ওঠে। একটা ছায়ামূর্তির আকারে ওঠে। রক্তমাংসের দেহ নিয়ে ওঠে না কেউ। জো আর পটারে মিলে তো নিশ্চয় সেই রক্তমাংসর দেহটাকে তুলতে চাইছে!

লোক দুটো খুব যে তাড়াতাড়ি খুঁড়তে পারছে, তা নয়। ওরা মদ খেয়ে এসেছে। বেশ বোঝা যায়, প্রচুর মদ খেয়ে এসেছে। পটার তো মোটেই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। ডাক্তার

*ইঞ্জন=ইণ্ডিয়ান। আমেরিকার আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের রক্ত এর দেহে ছিল বলেই একে ইঞ্জন বলে সাদারা।

রবিনসন ক্রমাগতই তাড়া দিচ্ছে "তাড়াতাড়ি কর হে! কোন পাহারাওয়ালা যদি এদিক পানে এসে পড়ে, তবেই সর্বনাশ!"

ওরা ঘোঁৎঘোঁৎ কী যে জবাব দিচ্ছে, বোঝা যায় না। তবে স্বর শুনে বেশ বোঝা যায় জবাবটা মোটেই মোলায়েম নয়। ওরা বিরক্ত হচ্ছে, ওরা রেগে আছে রবিনসনের ওপরে, একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইবার সময় ওদের মত ইতর জনের যে-রকম সম্ভ্রমের সুরে কথা কওয়া উচিত তা ওরা কইছে না।

যা হোক, অবশেষে কবর খোঁড়া হয়ে গেল। ভেতরে শায়িত মৃতদেহটা দেখে শিউরে উঠল হাক আর টম। কিন্তু ইঞ্জন জো-রা একটুও বিচলিত হল না, একান্ত অবহেলার সঙ্গে দেহটা ধরে দুজনে তুলে ফেলল কবর থেকে, তারপর সেটাকে ছুড়ে ফেলল ঠেলাগাড়ির ওপর। তারপর তারা যেন পরম উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকতে লাগল।

রবিনসন তাদের তাড়া দিল—"আরে, তোমরা এ করছ কী? এইখানে দাঁড়িয়ে চুরুট খাওয়ার সময় না কি এখন? যত শীগগির পারা যায়, কবর ভরতি করে রেখে এখান থেকে সরে পড়া দরকার।"

ইঞ্জন জো রুক্ষস্বরে বলল—"সবে পড়ার আগে আর পাঁচটি ক্রাউন চাই হে ডাক্তার! চটপট বার করে দাও, তবেই ঠেলাগাড়ি চলতে শুরু করবে। নইলে, ও রইল ওইখানে।"

রবিনসন রেগে উঠল—"এ কী রকম কথা? প্রথমেই কথাবার্তা ঠিক হয়ে যায় নি? কথামত একশো ক্রাউন মজুরি ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে পুরো টাকাটাই আমি তোমাদের আগাম দিয়ে দিই নি? তবে এখন আবার পাঁচ ক্রাউন চাইছ কী বলে?"

ইঞ্জন জো মুচকি হেসে বলল—"তোমার বাবা একদিন শীতের রাত্রে আমাকে তার বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, মনে আছে? এই পাঁচ ক্রাউন তারই ক্ষতিপূরণ। আমি শুধু একটা রাতের জন্য তোমাদের গোয়ালঘরে মাথাটা গুঁজে থাকতে চেয়েছিলাম, আর কিছু নয়। তোমার বাবার সেই ব্যবহারের বদলা নিতে হলে তোমাকে এখন চাবুক মারা দরকার আমার পক্ষে, আমি তা না করে শুধু পাঁচটি ক্রাউন বাড়তি চাইছি—"

পটার লোকটা নেশায় চুর হয়ে রয়েছে একদম। সে রুখে উঠল হঠাৎ—"চাবুক মারা দরকার যদি হয়, তবে মারবই বা না কেন—? না দেয় পাঁচ ক্রাউন, নেই, ওকে গোবেড়েন করে বদলা নাও—" এই বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে ডাক্তারের ওপরে।

ওদের ভাবগতিক দেখে ডাক্তার আগে থাকতে তৈরী ছিল। পাশ থেকে একখানা কাঠ তুলে নিয়ে পটারকে মারল এক ঘা। একে নেশায় বেসামাল ছিল পটার, তারপর এই ঘা খেয়ে সে সটান পড়ে গেল মাটিতে। আঘাতের জন্য না হোক, নেশার জন্য অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওর কোমরে ছিল একখানা ছোরা। ইঞ্জন জো চোখের পলকে সেই ছোরা তুলে নিয়ে

বিঁধিয়ে দিল ডাক্তারের বুকে। ডাক্তার একবার দু হাত শূন্যে তুলে কী যেন বলতে গেল। কোন কথাই বেরুলো না মুখ দিয়ে, সে দড়াম করে পড়ে গেল ঠিক পটারের দেহের ওপরে। তারই রক্তে পটারের সর্বাঙ্গ লাল হয়ে গেল।

এল্‌ম্‌ গাছের আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই চোখে দেখেছে টম সইয়ার আর হাক ফিন।

২

সেন্টপিটার্সবার্গের মাইল তিনেক ভাটিতে, মিসিসিপির বুকে একটা দ্বীপ—নাম তার জ্যাকসন। দু মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া এই দ্বীপটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা, কোন মানুষ এখানে বাস করে না বা আসে না।

সেদিন রাত্রি-বেলা একখানা ছোট ডিঙ্গি এসে লাগল এই জ্যাকসন দ্বীপে, ডিঙ্গি থেকে লাফিয়ে নামল তিনটি ছেলে। টম সইয়ার, তার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু জো হার্পার, আর হাক ফিন। এরা সংসার ত্যাগ করে এসেছে, জলদস্যুর দল গড়ে সমুদ্রে সমুদ্রে লুঠতরাজ করে বেড়ানোই এদের সংকল্প। তার জন্য চাই একখানা জাহাজ। সেই জাহাজ যতক্ষণ দখলে না আসছে, ততক্ষণ এই বিজন দ্বীপে আত্মগোপন করে থাকাই এদের উদ্দেশ্য।

বাড়ি থেকে কিছু কিছু রুটি মাংস ওরা সংগ্রহ করেই এনেছে, তা ছাড়া বড় নদীতে ছিপ ফেললেই মাছ ধরা যায়। তারও ওপরে রয়েছে কাঁকড়া, কচ্ছপের ডিম, কত কী সুখাদ্য। সুতরাং খাবারের অভব এদের হবে না।

দস্যুজীবনে টম আর বেন আব হাক—এসব নাম অচল। তাই নামও ওরা পালটে ফেলেছে। টম নাম নিয়েছে 'স্পেনিশ দরিয়ার বিভীষিকা'। অন্য দুজনারও অমনি সব গালভরা নাম সে-ই বাছাই করে দিয়েছে—'গ্যালিলি সমুদ্রের আতঙ্ক', 'দক্ষিণ সমুদ্রের টাইফুন' ইত্যাদি—

আসল কথা—ভীষণ ভয় পেয়েছে টম আর হাক, ওই ডাক্তার রবিনসনের হত্যাকান্ড নিয়ে। ভয় পেয়ে পালিয়েছে ওরা, সংগে নিয়েছে ওই বোকা হার্পারকে, ভেতরের কথা একতিলও তার কাছে ফাঁস না করে।

পটার ধরা পড়েছে খুনের দায়ে। কারণ ছোরাখানা যে তার, তা অনেকেই সনাক্ত করেছে। তার ওপর তার সর্বাংগে রক্ত মাখা ছিল, ওই রবিনসনেরই রক্ত। সবচেয়ে মোক্ষম প্রমাণ তার বিরুদ্ধে, ইঞ্জন জোর সাক্ষ্য। জো স্পষ্ট বলেছে—পটারই ঝগড়ার মুখে ছোরা বিঁধিয়ে দেয় ডাক্তারের বুকে। ডাক্তার মরতে মরতেও তাকে জাপটে ধরে এবং দুজনে জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে যায়।

পটারকে রাখা হয়েছে গাঁয়ের জেলখানায়। ইঞ্জন জো খোস মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাঁয়ে। সেই কারণেই টমেদের আতঙ্ক। তাদের কেবলই ভয়—সে-রাত্রে কবরখানায় তাদের উপস্থিতির কথা ইঞ্জন জো হয়তো কোন রকমে জেনে ফেলবে। আর তা যদি জানে, নিজের জান বাঁচাবার জন্য

সে কি আর দুটো বাচ্চা ছেলেকে খুন করতে এক সেকেণ্ডের জন্যও দ্বিধা করবে? সুতরাং পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই সুপরামর্শ।

তাই তারা পালিয়েছে। দিনও কাটছে সুখে স্বচ্ছন্দে। অর্থাৎ প্রথম দিনটা। নদীতে সাঁতার কাটা, বনে বনে ইণ্ডিয়ানদের ধাঁচে লড়াই করা, ছিপ ফেলে মাছ ধরা, বালি খুঁড়ে কচ্ছপের ডিম বার করা—উত্তেজনার অন্ত নেই।

এক দিন কাটল। দ্বিতীয় দিনে রাত্রিবেলায় এল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। একদম ভিজে বেড়াল করে দিয়ে গেল ওদের। উৎসাহ উদ্দীপনাও কমে এল অনেকখানি। প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবতে লাগল—বাড়ি ফেরার কথা।

তৃতীয় দিনে আর কেউই মনের কথা মনে লুকিয়ে রাখতে পারে না। টমকে একা ফেলে দুই বন্ধু তখুনি বাড়ি ফিরতে চায়। টম তাদের বোঝালো—এরকম মার-খাওয়া কুকুরের মত লেজ পায়ের ভেতর লুকিয়ে কুঁইকুঁই করতে করতে ঘরে ফেরা একান্ত কাপুরুষের কাজ হবে। ঘরে ফিরতেই যদি হয়, সে-ফেরাটার ভেতরেও একটা জৌলুস যাতে থাকে, তা করতে হবে। সে কানে কানে একটা প্রস্তাব করল ওদের কাছে। আর সে প্রস্তাবে অতি উৎসাহের সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল তারা।

গ্রামের ভেতর এই তিন দিন ছেলে-বুড়ো সকলেই শোকাচ্ছন্ন। পলি মাসীর বা হার্পারের মায়ের কথা তো ছেড়েই দাও—তাঁরা তো রাতদিন চোখের জল ফেলছেনই—নিঃসম্পর্কীয় লোকেরাও গাঁয়ের তিন তিনটি ছেলের এইভাবে উধাও হয়ে যাওয়াতে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে ডানপিটে ছেলে তিনটি সাঁতার কাটতে কাটতে হয়তো বড় নদীর মাঝামাঝি চলে গিয়েছিল, সেইখানে কোন ঘূর্ণিতে পড়ে তলিয়ে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত। স্টীমার নিয়ে, জাল ফেলে অনেক তারা ঘুরেছে নদীর বুকে, একটা দেহকেও না পেয়ে অবশেষে গাঁয়ে ফিরেছে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

আজ গির্জায় তাদের আত্মার শান্তির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রামের কারও আর আসতে বাকী নেই গির্জায়। সকলেই কেঁদে কেঁদে দু-চক্ষু লাল, মহিলারা মাঝে মাঝেই রুমাল চোখে তুললেন। নাম-করা দুরন্ত ছেলেরাও আজ নিঃশব্দে চলাফেরা করছে, কথা কইছে চুপি চুপি।

পাদরী উঠলেন। ধরা গলায় বক্তৃতা দিলেন, পবিত্র বাইবেল থেকে নানা মহাজনের উক্তি উদ্ধৃত করে। টম সইয়ার বা জো হার্পার—যাদের দাঁসাপনা সারা গ্রামে কুখ্যাত, তাদের তিনি চিত্রিত করলেন প্রভু যীশুর একান্ত আপন বলে চিহ্নিতকরা নিরীহ ধর্মপ্রাণ শিশুরূপে। এমন কি হাক ফিন, জীবনে যে গির্জায় আসে নি কখনও, তাকেও তিনি আশীর্বাদ জানাতে কার্পণ্য করলেন না এতটুকু।

সার্বজনীন শোক যখন চরমে উঠেছে, কান্নার শব্দে যখন পাদরীর বক্তৃতাও ডুবে যাচ্ছে, ঠিক তখনই একটা হতবুদ্ধির ব্যাপার ঘটল গির্জার ভেতরে। গদগদ স্বরে একটি স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন পাদরী, তিনি মাঝপথে হঠাৎ থেমে পড়লেন। থেমে গিয়ে তাকিয়ে রইলেন সমুখপানে, যেন দু-চোখ এক্ষুনি ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে তাঁর। প্রেক্ষাঘরের শেষপ্রান্তে গ্যালারি, তার নীচে মজুদ থাকে আবহমান কালের ভাঙা ভাঙা বেঞ্চি। সেইখান থেকে বেরিয়ে তিনটি মূর্তি ঠিক পাদরীর বেদীর দিকে এগিয়ে আসছে। হলটার মাঝ বরাবর যে লম্বা রাস্তা রয়েছে, এগিয়ে আসছে সেই রাস্তা বেয়ে।

পাদরী তাকিয়ে আছেন নিশ্চুপ হয়ে, তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে এক জোড়া দু-জোড়া করে চক্ষু ক্রমশঃ নিবন্ধ হতে লাগল সেই অগ্রসরমান তিন মূর্তির দিকে। যে তাকায়, সেই যেন পাথর বনে যায়। আস্তে আস্তে সারা গির্জায় চেপে বসল এক অখণ্ড নীরবতা।

সেই তিন মূর্তি এসে ক্রমে বক্তৃতামঞ্চের ওপরে উঠল। পাদরী এক পা পিছিয়ে গেলেন যেন? আশ্চর্য কী! পাদরী হলেই তিনি ভূতের ভয় থেকে মুক্ত হবেন, এমন কি কথা? এ তিনটি যে ভূত নয়, তা তিনি কেমন করে বুঝবেন? সবাই জানে—এরা বড় নদীতে ডুবে মরেছে, আজ এখন ভর দুপুর বেলায় দুশো মানুষের সামনে এরা দর্শন দিচ্ছে বলেই যে এদের জ্যান্ত মানুষ বলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নিতে হবে, এমন শিক্ষা পাদরী সাহেব পান নি।

কিন্তু পাদরী না নিন, পলি মাসী নিলেন, এবং তাঁর দেখাদেখি হার্পার-গিন্নীও। তাঁরা দুজনে 'টম রে!' 'জো রে' বলে চেঁচিয়ে উঠে পড়ি কি মরি করে ছুটতে ছুটতে আলুথালু বেশে এসে উঠে পড়লেন মঞ্চের ওপরে, আর ছেলে-দুটোকে জাপটে ধরে তাদের কাঁধের ওপর অঝোরে চোখের জল ছেড়ে দিলেন।

এর পরেও কি আর সন্দেহ করা চলে যে তারা জ্যান্ত নয়?

গির্জাময় একটা তাণ্ডব কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। মহিলারা চেঁচায়, বাচ্চারা কাঁদে, কিশোরেরা স্থানকালপাত্র ভুলে শিস দেয়—যার যা ইচ্ছে, সে তাই করে যায় নির্বিচারে। তিনটি পলাতক বালককে বাইবেল-খ্যাত সেই অপব্যয়ী পুত্রের চাইতে বেশী সমাদরে গ্রহণ করল সেন্টপিটার্সবার্গ। টম সইয়ার এই পরামর্শই দিয়েছিল বন্ধুদের—নাটকীয় মুহূর্তে দর্শন দিয়ে তাদের প্রত্যাবর্তন-টাকে রোমাঞ্চে মণ্ডিত করে তুলতে হবে। ফিরে এসেছে তার আগের রাত্রে। গির্জার গ্যালারির তলায় লুকিয়ে থেকেছে অনেকগুলি একঘেয়ে ঘণ্টা। কিন্তু তাতে কী? সব ভাল যার শেষ ভাল। গ্রামে এখন তারা তিনজন বীর বলে স্বীকৃত। শুধু ছেলেমহলে নয়, বুড়োদের চোখেও তারা বাহাদুর এখন।

সেদিক দিয়ে টম বা হাকের অভিযোগ করার কিছু নেই। কিন্তু তবু তারা সুখী নয়। ওই পটার হতভাগার জন্য অশান্তির শেষ নেই তাদের। ও জেলখানায় রয়েছে। ওর বিচার আসন্ন।

ওর বিরুদ্ধে যা প্রমাণ জমেছে, তাতে ওর প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। অথচ টম আর হাক—ওরা স্বচক্ষে দেখেছে হত্যাকাণ্ডটি পটার করে নি, করেছে অন্য লোক। সেই অন্য লোকই এখন পটারের বিরুদ্ধে পয়লা নম্বর সাক্ষী।

সেই অন্য লোক ইঞ্জন জো যে মিথ্যা কথা বলে পাপকর্মের সহকারীকে নিঃসংকোচে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, আসলে পটার যে নির্দোষ এবং ইঞ্জন জো নিজেই যে হত্যাকারী, এ কথা ভালরকম জেনেও কি ছেলে দুটো তা সময় থাকতে প্রকাশ করতে সাহস পাবে না? তাদের ভাব দেখে তা আশা করা যায় না যে পাবে।

ইঞ্জন জো'র ভয়ে তারা জ্যাকসন দ্বীপে পালিয়েছিল। মন টেকে নি বলে সেখান থেকে ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু মনে সাহস আসে নি সেই অভিযান থেকে। এখনও তারা ইঞ্জন জো'র ভয়ে কম্পমান। সর্বনাশ! ও যদি এদের সন্দেহ করে, তাহলে তো এদের জীবনের দাম এক সেন্টও নয়! টুঁটিটি টিপে ধরবে, আর দমটি বার করে দেবে।

তবু বিবেক দংশন করে। জেনে শুনে একটা নির্দোষ লোককে ওরা ফাঁসিতে ঝুলতে দেবে? বিবেকের তাড়নায় ওরা পটারকে ঘন ঘন দেখতে যায়। জেলখানা বলতে এমন কিছু কড়াকড়ি ব্যাপার নয় এখানে। গ্রামের সীমানায় একটা ভাঙা ঘর। তার ভেতরে পটার থাকে, দরজায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ। পাহারাও নেই, কিছুই না।

পালাবার মতলব থাকলে এরকম জায়গা থেকে যে-কোন বন্দীর পক্ষেই পালানো সোজা। কিন্তু পটারের সে-মতলবই নেই। উৎসাহ নিবে গিয়েছে তার জীবন থেকে। অল্পস্বল্প ছোটখাট দুষ্কর্ম সে সারা জীবনই করেছে, কিন্তু কোন বড় অপরাধ কখনও করে নি! আর এ একেবারে নরহত্যা?

সে কেঁদে কেঁদে কেবলই বলে—"বাবা টম, এই মদেই আমাকে খেয়েছে। নেশায় চুর হয়ে আমি যে কি করছি, তা আমি নিজেই জানি নে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, হুঁশ হতেই ইঞ্জন জো বললে—"তুই খুন করেছিস।" অবিশ্যি করেছি। তা নইলে করলে কে? আমার ছোরায় খুন হয়েছে, আমার গায়ে ডাক্তারের রক্ত লেগে রয়েছে, তাতে বন্ধুলোক হয়ে ইঞ্জনও বলছে খুন আমিই করেছি ; কাজেই আমি যে খুনী, তাতে সন্দেহ নেই। ওই নেশা! ওই নেশা! ওই নেশার বশে কে যে কখন কী করবে, কিছু ঠিক নেই।"

এই সরলপ্রাণ নেশাখোরটাকে ফাঁসি দিচ্ছে ইঞ্জন জো। নিজের দোষ ঢাকবার জন্য। টমেরা যদি সত্যকথা বলতে ভয় পায়, ইঞ্জনের চাইতে তারাও কম দোষী হবে না ধর্মের চোখে। না, সত্যকথা বলতেই হবে তাদের।

কিন্তু তারপর? ইঞ্জন জো কি ওদের ছেড়ে কথা কইবে? নিজে মরবার আগে ওদেরও মেরে রেখে যাবে নিশ্চয়।

তবু—না, সত্যকথা বলতেই হবে।

কাল পটারের বিচার। রাত-দুপুরে নিঃশব্দে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল টম। কোথায় গেল জানল শুধু হাক ফিন। টম ঘরে ফিরে এল শেষ রাত্রে। সিড কিছুই জানল না তার গতিবিধির কথা।

পরদিন বিচারকক্ষে তিলধারণের স্থান নেই। জজ থ্যাচার বসেছেন মামলার বিচার করবার জন্য। সরকার পক্ষের উকিল সাক্ষীর পর সাক্ষী হাজির করে যাচ্ছেন। প্রধান সাক্ষী অবশ্য ইঞ্জন জো। সে হলফ করে বলল—নিজের চোখে সে দেখেছে—পটার ওই বৃহৎ ছোরাখানা দিয়ে খুন করেছে ডাক্তার রবিনসনকে।

সাক্ষীর পর সাক্ষী। কেউ শেষ রাত্রে পটারকে নদীতে স্নান করতে দেখেছে—অবশ্যই গায়ের কাপড়ের রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলবার জন্য। কেউ ছোরাখানা সনাক্ত করতে এসেছে—ও-ছোরা সে বহুদিন থেকে পটারের কোমরে দেখে আসছে।

একজন উকিল অবশ্য আছেন পটারের পক্ষে। কিন্তু কোন সাক্ষীকে তিনি একটি জেরাও করছেন না। আদালতসুদ্ধ লোক বিরক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর ওপরে। ভদ্রলোক কি মক্কেলটাকে বাঁচাবার তিলমাত্র চেষ্টাও করবেন না? এ কেমনধারা উকিল?

সব সাক্ষী যখন নিজের নিজের কথা শেষ করে চলে গেল, তখন উঠলেন আসামীর উকিল। উঠেই বিচারককে সম্বোধন করে বললেন—"ধর্মাবতার! আগে আমি ভেবেছিলাম যে আসামীর পক্ষে এই কৈফিয়ত আমি খাড়া করব যে যা সে করেছে, তা নেশায় বেহুঁশ হয়েই করেছে। সুতরাং আইনের চোখে দয়া পাওয়ার যোগ্য সে। প্রার্থনা করব ভেবেছিলাম যে চরম দণ্ড যেন তার ওপর প্রয়োগ করা না হয়। কিন্তু অতি সম্প্রতি এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যাতে আমি সে অভিপ্রায় পরিবর্তন করাই সংগত মনে করছি। আমি এখন দু একজন সাক্ষী তলব করতে চাই, যারা এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের ওপর নতুন আলোকপাত করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার প্রথম সাক্ষী টম সইয়ার, তাকে আদালতে হাজির করবার অনুমতি দিন।"

আদালতকক্ষে কি বাজ পড়ল হঠাৎ? এমনধারা চমকে উঠল কেন দুশো নরনারী, যারা বিচার দেখতে এসেছে?

টম সইয়ার আদালতেই আছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে এসে কোনমতে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। প্রশ্নের উত্তর দেবে কি, গলা দিয়ে কথাই বেরুতে চায় না তার। ইঞ্জন জো'র দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সে, কোনমতে যেন চোখোচোখি না হয় তার সঙ্গে। চোখোচোখি হলে সে আর সত্যকথা বলতে পারবে না।

উকিল বার বার তাকে সাহস দিচ্ছেন, বলছেন—"তোমার কোন ভয় নেই, সত্যকথা বল তুমি—।"

এইভাবে সাহস দিয়ে দিয়ে উকিল তার মুখ দিয়ে এই কথাটি বার করে নিলেন যে—হত্যাকাণ্ডের রাতে সে তার বন্ধু হাক ফিনকে নিয়ে ভূত দেখবার জন্যে কবরখানায় গিয়েছিল। এল্ম্ গাছের আড়াল থেকে সে দেখেছে যে পটার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পরে ইঞ্জন জো পটারের ছুরি তুলে নিয়ে নিজের হাতে বিঁধিয়ে দিয়েছে রবিনসনের বুকে।

আর কিছু বলতে হল না টমকে।

হঠাৎ একটা ঝনঝন শব্দ। জানালা ভেঙে পড়ল একটা। আর সেই জানালা দিয়ে এক লাফে আদালত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ইঞ্জন জো।

পুলিস যখন ছুটে বেরুলো, তখন ইঞ্জন জো অদৃশ্য।

পটার খালাস পেলো। হুলিয়া বেরুলো ইঞ্জন জো'র নামে।

কাল রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে টম উকিলের কাছেই গিয়েছিল।

৩

টম? এখন টম সেন্টপিটার্সবার্গের মুকুটহীন রাজা।

সবাই জানে—ও একটা ক্ষণজন্মা ছেলে।

স্কুলে এখনও সে বেত খায় প্রায়ই, কিন্তু বেত মারবার সময়ে মাস্টার ওয়াল্টার্স মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নেন তার কাছে।

কিন্তু এত গৌরবেও মনে শান্তি নেই বেচারী টমের। ইঞ্জন জো সেই যে পালিয়েছে, এখনও ধরা পড়ে নি। টমের সন্দেহমাত্র নেই যে সে তক্কে তক্কে আছে টমকে ধরবার জন্য। ধরতে পারলেই খুন করবে। প্রতিহিংসা না নিয়ে ওসব লোক ছাড়ে কখনও?

ইঞ্জন জো'র ভয়ে নিজের গতিবিধি সংযত করতে হয়েছে টমকে। গ্রামের ভেতর যখন তখন যেখানে সেখানে আর ঘোরে ফেরে না। বাড়ি থেকে স্কুল, স্কুল থেকে বেরিয়ে এক একদিন এক এক জায়গায়। নির্জন নিভৃত এমন সব জায়গা, যেখানে ইঞ্জন জো কখনও তাকে দেখতে পাওয়ার প্রত্যাশাও করবে না।

কার্ডিফ পাহাড় গ্রামের সীমান্তে। এই পাহাড়ের মাথায় মাথায় সে আজকাল প্রায়ই লুকিয়ে বেড়ায়। সঙ্গে থাকে হাক ফিন। তারও ওই একই ভয় কিনা! তাকে অবশ্য সাক্ষ্য দিতে হয় নি, কিন্তু নিজে সাক্ষ্য দেবার সময় টমটা যে তারও নাম করেছিল।

কার্ডিফ পাহাড়ের ওধারে একটা উপত্যকা, সেখানে বহুকালের পরিত্যক্ত একটা ভাঙা বাড়ি। একদিন পাহাড় থেকে নেমে টম আর হাক সেই বাড়িটা দেখতে গেল। সত্যই ভেঙে

ভেঙে পড়ছে বাড়িটা। কিন্তু দোতলায় ওঠবার কাঠের সিঁড়িটা, খুবই নড়বড়ে হয়ে গেলেও, এখনও খাড়া আছে। সিঁড়ি বেয়ে ওরা দুজনে ওপরে উঠে গেল।

আর তারপরই দুটো লোক এসে ঢুকল নীচের তলায়। বলা বাহুল্য, টম আর হাক সঙ্গে সঙ্গে দোতলার মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, যাতে ভাঙা মেঝের ফাঁকে ফাঁকে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

একটা লোক টমেদের চেনা। অর্থাৎ গ্রামে ওকে অনেক সময়েই দেখে থাকে ওরা। লোকটা সম্প্রতি এসেছে এদিকে। স্পেনের লোক, কালা-বোবা। একমুখ দাড়ি-গোঁফ আর মাথায় স্পেন দেশের বিটকেল চওড়া টুপির দরুন ওর মুখ কখনোই কেউ দেখতে পায় না।

অন্য লোকটাকে ওরা দেখে নি আগে। ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক-পরা, ভিখিরীর মত চেহারা, কিন্তু এদিকে বেশ গাঁট্টা জোয়ান।



স্পেনদেশীয় লোকটাকে কালা-বোবা বলেই জানত ওরা, কিন্তু আজ ওদের অবাক্ করে দিয়ে সেই বোবা লোকটাই বলে উঠল—"আর এভাবে চলবে না বেশী দিন। প্রতিহিংসার ব্যাপারটা মিটলেই টেক্সাস চলে যাব। সেখানে পুলিসের কড়া-কড়ি নেই এমন।"

টমের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এ কণ্ঠস্বর তো ইঞ্জন জো'র!

টম গা টেপে হাকের, হাক চিমটি কাটে টমকে।

ততক্ষণে ইঞ্জন জো নীচের ঘরে সাবেক কালের উনুনের পাশে গিয়ে বসেছে। একটা গর্তের ভেতর থেকে বার করেছে চৌকো একটা কাঠের বাক্স। ভিখিরী লোকটা কৌতূহল দমন করতে না পেরে তার ডালা তুলে হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। হাতে করে তুলল একমুঠো মোহর।

ইঞ্জন জো বলল—"বহুদিন আগে এদিকে একটা বড় দল এসেছিল ডাকাতের। তাদেরই গুপ্তধন এসব। তারা হঠাৎ পুলিসের তাড়া খেয়ে এদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়, ধনরত্ন নিয়ে যেতে পারে নি। আমরা যদি নিয়ে যেতে পারি, ভোগে লাগবে।"

ওর কথায় বোঝা গেল—খুব শীগগিরই ওরা টেক্সাসে পালাতে চাইছে। কেবল ওই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা হাঁসিল করার অপেক্ষা। ওটা না করে এদেশ থেকে কিছুতেই যাবে না ইঞ্জন জো।

কিন্তু এখানে আর আসার সুবিধা না হতে পারে। কাজেই এই মোহরের বাক্সটা এখান থেকে আজই তুলে নিয়ে যেতে হবে। আপাততঃ নিয়ে যাবে তার দু নম্বরের ঘরে, তারপর টেক্সাস।

ইঞ্জন জো আর ভিখারীতে মিলে সেই ভারী বাক্সটা বয়ে নিয়ে বাইরে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

টম আর হাক পিছু নিল না। দু নম্বরের ঘর! নিশ্চয় কোন হোটেলের দু-নম্বরের ঘর। দুটি মাত্র হোটেল তো গ্রামে! কোন ঘরে জো থাকে, খুঁজে নেওয়া সহজ হবে। তারপর ও যখন বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে বা মাতাল বেহুঁশ হয়ে থাকবে, তখন গুপ্তধনটা টম আর হাক মিলে তুলে নিয়ে আসবে। চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে দোষ কী?

ঠিক হল, রোজ রাতে হাক পাহারা দেবে ইঞ্জন জোকে।

গ্রামে ঢুকে একটার পর একটা হোটেল ঘুরে দেখল ওরা। একটা হোটেল দু নম্বরে আজ কয়েক বছর ধরে একই ভাড়াটে রয়েছে। সে তো কোনমতেই জো নয়! কাজেই অন্য হোটেলে—

হ্যাঁ, এখানকার দু নম্বর ঘরের বাসিন্দা রহস্যময় লোক। একে দিনের বেলায় কখনো বাইরে দেখা যায় না। রাতে ঘরে আলো জ্বলে বটে, কিন্তু লোকটা বেরোয় না মানুষের সামনে। গভীর রাতে দরজা খোলার বা বন্ধ করার শব্দ অবশ্য পাওয়া যায়। এই লোকই নিশ্চয় জো।

কথা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। রাত্রে হাক পাহারা দেবে এই দু নম্বর ঘরের আশেপাশে। ইঞ্জন জো'কে বেরিয়ে যেতে দেখলেই সে ছুটে গিয়ে ডেকে আনবে টমকে। তারপর দুজনে মিলে ওর ঘর থেকে গুপ্তধনের বাক্সটি নিয়ে সরে পড়বে। ঘরের চাবি খোলবার জন্য শত শত চাবি যোগাড় করে ফেলল ওরা।

পর পর দু রাত টম বিছানায় জেগে কাটাল—কখন হাকের কাছ থেকে ডাক আসে—এই প্রতীক্ষায়। না, সে-ডাক আর এলো না। তৃতীয় দিন সকালেই টমকে যেতে হল গাঁয়ের বাইরে। অনেকদিন থেকেই স্কুলের ছেলেমেয়েরা বনভোজনের আয়োজন করছে। সেই বনভোজনের তারিখটা পড়ল ওই দিন। এতে যোগ না দিয়ে কি টম পারে? তাকে যেতেই হবে। ফিরতে রাত হবে। স্টীমারে করে যাওয়া—কত রাতে স্টীমার ফিরবে কে জানে। এর মধ্যে কি হাক এসে ডাক দেবে? টম মনে মনে আশা করছে যে আজকের রাতটাও কেটে যাবে, হাক আজও আসবে না।

যা হোক, বনভোজনের দলে তাকে ভিড়তে হলই। বড় নদীতে স্টীমার ভাসিয়ে ম্যাকডুগালের গুহার নীচে তারা গিয়ে নামল। কার্ডিফ পাহাড়েরই একটা অংশে এই গুহা।

দলে দলে ছেলেমেয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গুহায় ঢুকল। প্রবেশমুখে একটা পুরোনো কাঠের দরজা বসানো আছে, কিন্তু তা কোনদিন বন্ধ করে না কেউ।

গুহা যে কত দূর চলে গিয়েছে পাহাড়ের নীচে নীচে তা কেউ জানে না। যারা গুহা দেখতে যায়, তারা একটা নির্দিষ্ট সীমানার ভেতরেই ঘোরাফেরা করে। তার চাইতে দূরে গেলে পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। একটা গুহা থেকে আর একটা গুহা বেরিয়েছে, তা থেকে আর একটা, মাঝে মাঝে লম্বা ঢাকা গ্যালারি চলে গিয়েছে, তার থেকে ডাইনে বাঁয়ে বেরিয়েছে আরও অসংখ্য ছোট বড় গুহা। মাঝে মাঝে আবার ছোট ছোট জলস্রোত। মোটের ওপর, হারিয়ে যাওয়ার ভয় না থাকলে, বেড়িয়ে বেড়াবার অতি চমৎকার জায়গা হত, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের পক্ষে।

অসংখ্য ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করছে এ-গুহা থেকে ও-গুহা। প্রত্যেকের হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি, কারণ অনেক গুহার ভেতর রীতিমত অন্ধকার।

অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে টমও ছুটোছুটি করছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে বেকি থ্যাচার, জজ থ্যাচারের মেয়ে। দুজনে ঘুরতে ঘুরতে দূরে, আরও দূরে চলে যাচ্ছে, আরও দূরে—নিরাপদ সীমানা তারা কখন পেরিয়ে গিয়েছে, হুঁশ নেই তাদের।

* * *

রাত্রিবেলা হাক এসে ডাকল "মিয়াও"—

টমের কোন সাড়া নেই। আবার বেড়াল-ডাক ডাকল হাক। এবারও সাড়া নেই। এমন তো হবার কথা নয়। টম চিরসজাগ। সে সাড়া দেয় না কেন আজ? বারবার বেড়াল-ডাক ডেকে হাক হতাশ হয়ে পড়ল। এতক্ষণে ইঞ্জন জো আর তার সঙ্গী ভিখারীটা গুপ্তধন নিয়ে কতদূর চলে গেল, তা কে জানে?

হ্যাঁ, ওরা পিঠে করে দুটো থলে নিয়ে যাচ্ছে, হাক স্বচক্ষে দেখেছে। থলে করে মোহর ছাড়া আর কী নেবে? তাদের এখনই অনুসরণ করতে না পারলে তো নয়। ওরা চোখের আড়ালে গেলে ও-গুপ্তধনের পাত্তা আর কখনও পাবে হাকেরা? অগত্যা টমকে মনে মনে অভিশাপ করতে করতে হাক একাই ফিরে চলল। একাই সে পিছু নেবে ইঞ্জনদের। ভয়ের কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু তা বলে কর্তব্যে অবহেলা তো করা যায় না।

তারা পাহাড় বেয়ে উঠছে। পাহাড়ের গায়ে মিসেস ডাগলাসের বাড়ি। বাড়ির গায়ে এক জায়গায় অন্ধকারে অপেক্ষা করছে ইঞ্জনেরা। ইঞ্জন বলছে—"এত রাতেও বুড়ীর বাড়িতে সারি সারি আলো জ্বলছে। ব্যাপার কী? আলো না নিভলে তো ভিতরে ঢোকা চলে না আমাদের।"

ভিখারীটা উত্তর দিচ্ছে—"ভেতরে ঢুকে কী করতে চাও, তা কিন্তু এখনও বল নি! শুধু চুরি তো?"

ইঞ্জন রেগে গেল—"চুরি শুধু? চুরিচামারি করতে আসি নি। যা জুটে যায়, তা নেব বইকি! কিন্তু আসল উদ্দেশ্য আমার ওই বুড়ীর নাক কান কেটে নেওয়া। বলি নি যে আমার এক দফা প্রতিহিংসা নিতে বাকী আছে এ-তল্লাটে? ওর স্বামী একবার আমাকে তাড়িয়েছিল এ-শহর থেকে।

ও তখন মেয়র ছিল এখানে। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করি যে একদিন এর শোধ নেবই। আজ নেব তা। নাক কান কেটে বুড়ীকে এমন করে দেব যে ও আর মানুষের সামনে বেরুতে পারবে না।"

সর্বনাশ! হাকের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। ইঞ্জনেরা তো গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবার জন্য বেরোয় নি, বেরিয়েছে এক নিরীহ ভদ্রমহিলার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করবার জন্য। হাক কি এর কোন প্রতিকার করতে পারে না? এঃ, টমটা সঙ্গে থাকলে সে একটা প্রতিকার করতে পারতই! তার মাথা খুব সাফ।

এদিকে চেপে বৃষ্টি এসেছে। হাক ভিজে গিয়েছে হাড়ডি পর্যন্ত। শীত করছে। এক একবার মনে হচ্ছে দূর ছাই—এক ছুটে নেমে গিয়ে পিপের ভেতর শুয়ে পড়ি। কিন্তু না, কর্তব্য তার সামনে। এখন ঝড়বৃষ্টিকে গ্রাহ্য করলে চলবে না। ওই মহিলাকে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে একটা।

হাক ছুটে নামতে লাগল। একটা বাড়ি আছে এক ফার্লং নীচে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকে পড়ল হাক। গৃহস্বামীকে বলল মিসেস ডাগলাসের আসন্ন বিপদের কথা। দুটো ডাকাতকে পরামর্শ করতে সে নিজের কানে শুনে এসেছে। তারা কোথায় অপেক্ষা করে আছে, তাও সে দেখিয়ে দিতে পারবে।



গৃহস্বামীকে বলল মিসেস ডাগলাসের আসন্ন বিপদের কথা।

গৃহস্বামী নিজের দুই পুত্র এবং দুটি ভৃত্যকে নিয়ে বন্দুক হাতে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেন হাকের পেছনে পেছনে।

ইঞ্জন জো আর তার সাথী জানালা ভেঙে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে, এমন সময় পেছনে গর্জে উঠল বন্দুক। চোর দুটো তক্ষুনি পালাল—থলে বোঁচকা ফেলে। অনেকদূর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে নিয়ে গিয়েও ধরা গেল না কাউকে।

পরদিন বড় নদীর জলে ভিখারীটার মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল। হতভাগা নদী পেরুতে গিয়ে ডুবে মরেছে। ইঞ্জন জোকে কোথাও পাওয়া গেল না।

ওদের থলের ভেতর গুপ্তধন পাবে, আশা ছিল হাকের। সে-আশায় নিরাশ হতে হল। ওতে শুধু রয়েছে সিঁধেল চোরের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার—সিঁধকাঠি, উকো, চাবির গোছা ইত্যাদি।

দারুণ বৃষ্টিতে সারা রাত ভিজে হাক পড়ল জ্বরে। মিসেস ডাগলাস পুত্রাধিক আদরে নিজের বাড়িতে রেখে তার চিকিৎসা করছেন। সেই যে মহা বিপদ্ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে, সময়মত প্রতিবেশীদের ডেকে এনে, একথা তিনি শুনেছেন।

হাক ফিন জ্বরে অজ্ঞান, তাই অন্য একটা রোমাঞ্চকর মহা দুঃসংবাদ সে শুনতে পায় নি। সে-দুঃসংবাদ এই যে টম সইয়ার আর বেকি থ্যাচার বনভোজনের পর আর ফিরে আসে নি। তারা নিশ্চয় ম্যাকডুগাল গুহায় পথ হারিয়ে তারই সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে ঘুরছে এখনো।

কাল ফিরতি বেলা রাত্রির আঁধারে কেউ লক্ষ্য করে নি যে ওরা দুজন স্টীমারে ওঠে নি। রাত্রে ওরা বাড়ি ফিরল না দেখে, এদিকে পলি মাসী, ওদিকে বেকির মা মনে করলেন—ওরা রাতটা কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে কাটিয়ে আসছে। কিন্তু সকালবেলাও যখন ওরা দেখা দিল না, তখন খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল।

দল বেঁধে গাঁয়ের সব লোক কার্ডিফ পাহাড় বেয়ে ম্যাকডুগাল গুহায় গিয়ে ঢুকল। জজ থ্যাচার থেকে শুরু করে সিড, বেন রোজার, জো হার্পার পর্যন্ত। একদিন গেল, দুদিন গেল-- হারানো বাচ্চা দুটোকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন সন্ধানকারীরা একে একে ফিরতে লাগল। গুহায় রয়ে গেলেন শুধু ভগ্নহৃদয় জজ থ্যাচার আর তাঁর অন্তরঙ্গেরা।

সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে—টম আর বেকি গুহার ভেতর মারা পড়েছে কোন অজ্ঞাত কারণে।

আসলে কিন্তু ওরা মরে নি। মৃতপ্রায় হয়েছে, তা সত্য, বিশেষতঃ বেকি। টম তাকে উৎসাহ দিয়ে, সাহস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে কোন রকমে। পকেটে দু একটা কেক বিস্কুট ছিল, নিজে না খেয়ে তাই খাইয়েছে বেকিকে, ও বেঁচে রয়েছে শুধু সেই কারণেই।

ঘুরতে ঘুরতে কত দূর যে গিয়ে পড়েছে তারা! সেখান থেকে কোনমতে আর ফিরতে পারে নি। যেদিকেই যায়, গুহার পর গুহা, সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ। প্রবেশমুখের কোন পাত্তাই পায় না।

চিৎকার করে করে গলা ভেঙেছে তাদের। সন্ধানকারীদের থেকে তারা এত দূরে রয়েছে যে কেউ সে চিৎকার শোনে নি। সঙ্গে কিছু মোমবাতি, তা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়েছে। এখন আর বেকিকে নিয়ে ঘোরাফেরা করছে না টম। একটা জলস্রোতের ধারে তাকে শুইয়ে রেখেছে। অন্ততঃ তৃষ্ণার জলটা যেন হাতের মাথায় থাকে।

বেকিকে সেইখানে রেখে, পকেট থেকে ঘুড়ি-ওড়াবার সুতো সে বার করেছে। ওইখানে

একটা পাথরে দঁাড়ির এক প্রান্ত বেঁধে—অন্য প্রান্ত ধরে সে নানা দিকের গুহায় হামা দিয়ে দিয়ে ঘুরছে সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে।

একবার এই রকম ঘুরতে ঘুরতে সে দেখতে পেল সামনে আবছা আলো, আর তার পায়ের তলায় একটা গভীর সংকীর্ণ উপত্যকা। আর সেই উপত্যকার ভেতর এক চাঙ্গড় পাথরের আড়াল থেকে উঁকি মারছে একটা মানুষের মুখ। এখন চমক সে আগে কখনও খায় নি। ওই মুখ তো ইঞ্জন জো'র!

তাড়াতাড়ি সে ফিরে এল বেকির পাশে দঁাড়ি ধরে ধরে। তাকে আর এ কথা বলল না কিছু। বললে সে বেচারী ভয়েতেই মরে যাবে।

পরের দিনই সে বেরুবার রাস্তা পেয়ে গেল দৈবাৎ। দূর থেকে দেখতে পেল সরু এক ফালি সূর্যের আলো। সাহসে ভর করে ছুটে গিয়ে দেখে সত্যিই পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল সেখানে। তার ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে সে সামনে দেখতে পেল বিশাল মিসিসিপি তরঙ্গভঙ্গে বয়ে চলেছে তার সামনে দিয়ে।

বেকিকে বার করে নিয়ে এসে সে সেইখানে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল কোন নৌকো যায় কিনা। সেণ্টপিটার্সবার্গ যে এখান থেকে কম দূর হবে না, তা সে আন্দাজ করেছে।

নৌকো যখন পেলো একখানা, তখন সত্যিই শুনল সে-গ্রাম থেকে এ-জায়গাটা পুরো পাঁচ মাইল।

সেই নৌকোয় করে ওরা ঘরে ফিরল অনেক রাত্রে।

হাককে নিজের কথা বলবার এবং হাকের মুখ থেকে তার খবর শোনবার জন্য অধীর হয়েছে টম। কিন্তু হাক জ্বরে অচৈতন্য। প্রায় পনেরো দিন বাদে সে সুস্থ হয়ে উঠলে তবে টমের সঙ্গে হাকের কথাবার্তা হওয়া সম্ভব হল।

এ-কয়দিন ম্যাকডুগাল গুহায় কী যে হচ্ছে, সে খবর টম রাখে নি। সে একবার বেকির খবর, আর একবার হাকের খবর নিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ওদিকে একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। গ্রামের লোক গুহার মুখ একেবারে পাথরের দেওয়াল গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছে—যাতে ভবিষ্যতে ওর ভেতর ঢুকে আর কেউ হারিয়ে না যায়।

হাক সুস্থ হয়ে উঠলে টম তাকে নিয়ে ম্যাকডুগাল গুহায় গেল গোটা-দুই বড় থলে নিয়ে। গিয়ে দেখে প্রবেশদ্বার পাথরের দেয়াল দিয়ে বন্ধ। সে চমকে গেল। তবে তো ইঞ্জন জো এর ভেতরে আবদ্ধ হয়ে না খেয়েই মরেছে! একটা নৌকো যোগাড় করে নিয়ে সে গিয়ে পাঁচমাইল দূরের সেই গুপ্তপথ খুঁজে বার করল আবার। সেখান দিয়ে গুহায় ঢুকে দ্বারপথের দিকেই

অগ্রসর হল প্রথমে। এবার সঙ্গে অনেক মোম, অনেক দড়ি ছিল। খুঁজে খুঁজে দরজায় গিয়ে দেখে তাদের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। দরজার গায়েই পড়ে আছে ইঞ্জন জো'র মৃতদেহ।

তখন সেই গভীর সংকীর্ণ উপত্যকায় নেমে দুজনে খোঁজাখুঁজি শুরু করল গুপ্তধনের। বাক্সটা পাওয়াও গেল। থলেয় ভরে সেই ডলারের কাঁড়ি তারা নৌকোয় নিয়ে তুলল। এনে ফেলল মিসেস ডগলাসের বাড়িতে। গুনে দেখা গেল মোট বারো হাজার ডলার রয়েছে। জজ থ্যাচার টমের নামে ছয় হাজার অর হাকের নামে ছয় হাজার ব্যাঙ্কে জমা করে দিলেন।



লেখক পরিচিতি

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার অন্তঃপাতী ফ্লোরিডা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স. মার্ক টোয়েন ছদ্মনামে যিনি বিশ্বসাহিত্যে অমর প্রসিদ্ধির অধিকারী হয়ে আছেন। তাঁর শৈশব কেটেছিল হানিবল শহরে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনবদ্য পরিবেশে। এই সৌন্দর্যের পটভূমিতেই তিনি পরবর্তী কালে রচনা করেছিলেন অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সইয়ার ও অ্যাডভেঞ্চার অব হাকলেবেরি ফিন।

মাত্র বারো বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং তারপর থেকেই তিনি অগ্রজের খবরের কাগজে খুঁটিনাটি কাজ শিখতে থাকেন। ভবিষ্যতের সাংবাদিক জীবনের ভিত্তি এইখানেই রচিত হয়। দশ বৎসর কাল হানিবল ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য ছোট শহরে ছাপাখানার নানা কাজ শিক্ষা করে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ অর্লিন্স যাত্রা করেন ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু, খেয়ালী লোক, হঠাৎ মাঝপথে মত পরিবর্তন করে তিনি মিসিসিপি নদীর স্টীমারে পাইলটের কর্ম গ্রহণ করেন। যতদিন পর্যন্ত আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দরুন মিসিসিপিতে স্টীমার চলাচল বন্ধ না হল, এই কাজই করতে থাকলেন তিনি।

● মার্ক টোয়েন

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মার্ক টোয়েন' ছদ্মনামে প্রথম লেখনী চালনা শুরু করেন। নদীপথে যেতে যেতে স্টীমার মাত্রকেই ক্রমাগত জল মাপতে হয়। একটা লোক দড়ির মাথায় সীসা বেঁধে জলে ঝুলিয়ে বসে থাকে। জল কমতে কমতে দুই ফ্যাদম বা বারো ফুট এসে দাঁড়ালেই সে হেঁকে ওঠে "মার্ক টোয়েন" অর্থাৎ দুই মার্কা। অমনি স্টীমার অন্যদিকে ঘুরে যায় গভীর জলের সন্ধানে। এই 'মার্ক টোয়েন' ডাকটি এত ভাল লেগেছিল তরুণ সাহিত্যযশঃপ্রার্থীর যে তিনি এটিকেই ছদ্মনাম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক টোয়েন কার্সন সিটিতে গিয়ে 'ভার্জিনিয়া সিটি এণ্টারপ্রাইজ' নামক কাগজে রিপোর্টার হন। তারপর কর্মস্থান পরিবর্তিত হয় সানফ্রান্সিস্কোতে। এইখানেই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গল্প "সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রগ অব ক্যালাভেরাজ" তাঁকে রাতারাতি প্রসিদ্ধ করে তোলে। তারপরই তিনি লেখেন "ইনোসেণ্টস অ্যাব্রড"।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অলিভিয়া ল্যাংডেনকে বিবাহ করে হার্টফোর্ডে গিয়ে বাস করেন। সাংবাদিকতা এবং বই লেখা একসাথে চলতে থাকে। "গিলডেড্ এজ্", "অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সইয়ার", "লাইফ অন দি মিসিসিপি", "অ্যাডভেঞ্চার্স অব হাকলেবেরি ফিন", "ট্র্যাম্প অ্যাব্রড", "প্রিন্স অ্যাণ্ড পপার" এবং "কানেক্টিকট্ ইয়াংকি" ও "পাডেনহেড উইলসন" প্রভৃতি পুস্তক পর পর প্রকাশিত হয়ে তাঁকে যশস্বী ও ঐশ্বর্যবান্ করে তোলে।

কিন্তু শেষ জীবনে তাঁর প্রকাশকেরা দেউলিয়া হয়ে যাওয়াতে তিনি অর্থকষ্টে পতিত হন এবং ঋণ-শোধের জন্য সারা পৃথিবীতে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে ভ্রমণ করেন। তাঁর শেষ রচনা "ফলোইং দ্য ইকোয়েটর"।

শ্লেষাত্মক রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই লেখকের মৃত্যু হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে।



গ্রোথ অব দ্য সয়েল

মাঠ আর জলা আর জঙ্গল। তার শেষ মাথায় দেখা যায় পাহাড়।

মাঠ পেরিয়ে জল ভেঙে জঙ্গল ভেদ করে চলেছে একা একটি মানুষ। সেই বুঝি বা প্রথম মানুষ এ-অঞ্চলে। পথ যেখানে নেই, পথ তৈরি করে সে এগিয়ে যাচ্ছে—বিরামও নেই, তাড়াও নেই কিছু—

মাঠ আর জলা আর জঙ্গল। মাঠের মাটি সে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখছে মাঝে মাঝে, জঙ্গলের গাছ দেখছে পরখ করে করে। ঠিক মনোমত হচ্ছে না। জমি মন্দ নয়, কাঠও খারাপ নয়। তবু—

না, মন উঠছে না মানুষটার। আর যখন কেউ ভাগিদার নেই তার, বেছে বেছে সবচেয়ে ভাল জায়গাটাই সে নেবে। এ জমির চেয়েও তো ভাল জমি থাকতে পারে! এখানে মাঠ আর জলা পাশাপাশি, বর্ষা বেশী হলে জল সরবে কোন্ দিক দিয়ে, ঠাহর পাওয়া যায় না। গাছগুলিও খুব দামী নয়, এই অরণ্য, সূর্যের আলো যেখানে দুপুর বেলাতেও ঢুকতে সাহস পায় না, সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে মানুষের পা যেখানে পড়ে নি—এখানে তো এর চেয়ে অনেক সরেস কাঠ মেলবাব কথা!

না, পছন্দ হয় না ওর।

সারাদিন পথ চলে—মাঝে মাঝে ওই বিরামগুলি বাদ দিয়ে। কাঁধের থলিতে খাবার আছে—যবের চাপাটি আর ছাগল দুধের পনির, ক্ষিধের সময় তাই খেয়ে নদী থেকে জল পান করে আকণ্ঠ।

নদী? হ্যাঁ, ছোট ছোট নদী মাঝে মাঝেই পাওয়া যাচ্ছে, বারো মাস জল থাকে কিনা এসব নদীতে, বোঝা যায় না ঠিক।

সারাদিন পথ চলে, যেখানে এসে রাত্রি হয়, সেইখানেই শুয়ে পড়ে হাতের ওপর মাথা রেখে। পরদিন সকালেই আবার পথ চলা শুরু, তিন দিনের দিন পাহাড়তলিতে এসে পড়ল মানুষটা।

ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে ওপরপানে উঠে গিয়েছে অবণ্য। এখানে আর মাঠও নেই, জলাও নেই, তবে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা করে খোলা জায়গা। নিকটেই একটা নদী, এ-যাবৎ যত নদীর পাশ দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে, তাদের থেকে এটি অনেক গভীর বলে মনে হয়। না, চওড়া বেশী নয়, একটা খরগোশ লাফিয়ে নদী পার হয়ে গেল। তা, না হোক চওড়া, দরকার হল গভীরতাই, দরকার হল বারো মাস জলের সংস্থান থাকা।

হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা পছন্দমত জায়গা পাওয়া গেল। মাটি ভাল এখানকার, গাছগুলি সরেস কাঠের—বার্চ, ফার, পাইন, সেডার। বাস করবার, চাষ করবার মত স্থান বটে। আইজাক আব কোথাও যাবে না।

মানুষটার নাম আইজাকই বটে। বয়স ত্রিশের মত, লম্বা চওড়া জোয়ান মানুষ, মুখে লাল দাড়ি, সাবা গায়ে বড় বড় লোম। ওর বাড়ি ছিল কোথায় কতদূরে, কে তা বলবে? যেখানেই থাকুক, ওর কোন টান হয়তো ছিল না সে-বাড়ির ওপরে, থাকলেও সে-বাড়ি ওকে টেনে রাখতে পারে নি। হয়তো পারে নি খাবার যোগাতে, নয়তো মেটাতে পারে নি ওব অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা। যেভাবেই হক, আইজাক আজ একাকী এই নরওয়ের সীমান্তে, দক্ষিণে নিকটতম গ্রাম হল পুরো তিন দিনের পথ, উত্তরে এই পাহাড় থাকে থাকে উঠে গিয়েছে—সেও পুরো তিন দিনের পথ। তার পরে ওদিকের উতরাই, থাকে থাকে নামতে নামতে সুইডেনের এক সমুদ্রশাখা।

এইখানেই জন-মানুষের ছোঁয়ার বাইরে আইজাক তার বসতি স্থাপন করবে। সম্বল? এই ছয় ফুট লম্বা মজবুত দেহখানি ছাড়া তার আর কোন সম্বল নেই। তবে প্রকৃতির সম্পদ অফুরন্ত ছড়িয়ে আছে চারদিকে, তাই যদি সে বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজে লাগাতে পারে, কোন কিছুর অভাব তাকে কষ্ট দিতে পাববে না কোনদিন।

পকেটে একখানা ছুরি আছে অবশ্য। তাই নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল আইজাক। বার্চ গাছ অগুন্তি। মোটা মোটা গাছ বেছে নিয়ে ওই ছুরির সাহায্যে বার্চের বাকল তুলে ফেলল এক রাশি। পাহাড়ের বুকে পাথরের তো অভাব নেই। ভারী ভারী পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিল রোদ্দুরে। বাকলের সব রস নিংড়ে গলে বেরিয়ে গেল। তখন শক্ত লতা দিয়ে সে একটা বিরাট বোঝা বেঁধে ফেলল সেই বাকলের।

পরদিন রাত ভোর হতেই সেই বাকলের বোঝা মাথায় নিয়ে সে গ্রামের দিকে পাড়ি জমাল আবার। সঙ্গে সেই খাবারের থলি, এবার তাতে চাপাটি পনিরের পরিমাণ কম। হিসেব করে

না চললে তিন দিন তাতে কুলোনো কঠিন। তা হিসেব করেই সে চলবে। অভাবের দিন তার শেষ হয়ে এসেছে বলেই আশা করছে আইজাক। এই অঢেল সমৃদ্ধি প্রকৃতির, তার চারপাশে, ভরা ভাণ্ডারের মাঝখানে বসে সে কি উপোসী থাকবে?

গ্রামে পৌঁছুতেই তার বার্চের বাকল গরম পিঠের মত বিক্রি হয়ে গেল চটপট। নগদ পয়সা হাতে এল আইজাকের। তিনদিনের আধপেটা খাওয়ার পরে আজ সে হোটেলে ঢুকে তৃপ্তি করে রুটি আর সুরুয়া খেয়ে নিল। তারপর লেগে গেল বাজার করতে।

প্রথমে খাবারের ব্যবস্থা। ময়দা কিনল আর কড়া কিনল, চাপাটি তৈরি করবার জন্যে। তারপর চিন্তা জীবিকার। কুড়ুল কিনে ফেলল একখানা বেশ মজবুত দেখে। যেখানে সে বাস করতে যাচ্ছে, গাছ সেখানে অগুন্তি। কিন্তু কেটে নামাতে না পারলে সে-গাছের দাম কী?

দুধের পনির কিনে পয়সা সে খরচ করবে না, স্থায়ীভাবে দুধের বন্দোবস্ত যাতে হয়, তাই করবে। দুটো ছাগী আর একটা ছাগ সে কিনে ফেলল। বাস্, আর কিছু এ-যাত্রা নয়। বোঝা মাথায় নিয়ে, ছাগলের দড়ি হাতে ক'রে সে আবার জঙ্গলের পানে পা বাড়িয়ে দিল।

*　　*　　*

যে নিবিড় অরণ্য নিস্তব্ধ ছিল এতদিন, তাতে এখন সারাদিন শোনা যায় কাঠ-কাটার শব্দ। গাছের পর গাছ হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে, চ্যালা করে করে জ্বালানি কাঠ তৈরি করে আইজাক। চ্যালা-কাঠের পাহাড় হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। গ্রামে বয়ে নিয়ে যেতে কতদিন যে লাগবে! আর এক একবার যাওয়া-আসায় একটা হপ্তা কেটে যাবে!

কিন্তু উপায় নেই আপাততঃ। শীত পড়লে অবশ্য সুবিধা হতে পারে। বরফ পড়বে। রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে মসৃণ বরফের। স্লেজগাড়ি চালানো যাবে। তৈরি করা সোজা। দুখানা লম্বা বাটামের উপর ঘন ঘন আড়-কাঠ বসাতে হবে পেরেক ঠুকে। দড়ি বেঁধে টানো, সড়সড় করে এগিয়ে যাবে স্লেজগাড়ি দশ বিশ মণ বোঝা নিয়ে।

এখন? এখন বাঁকে করে বোঝা বয় আইজাক। বাঁকের দু দিকে দু বোঝা কাঠ। ভাল দাম বিক্রি হয় গ্রামে। খাবার জিনিস ছাড়া আর শুধু কেনে আইজাক ঘর বাঁধার লোহালক্কড়। পেরেক, গজাল, ছেনি, তুরপুন, হত-করাত, কোদাল, শাবল।

একদিন সে অবশেষে ঘর বাঁধতে লেগে গেল পাহাড়তলিতে। পাহাড়ে পাথরের অভাব নেই। কাঠের খুঁটি, পাথরের দেওয়াল, কাঠের বাটাম দিয়ে চাল তৈরি হল। সেই চালের ছাউনি হল বার্চের বাকল দিয়ে, সেই বাকলের ওপরে ঘাসসুদ্ধ মাটির চাপড়া বসানো হল। বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়বে, যেমন গড়িয়ে যায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

ঘরে দরজা বসল, জানালা বসল। এগুলি অবশ্য কিনতে হয়েছে আইজাককে। কারণ হাতিয়ার নেই তক্তা তৈরি করবার, তা ছাড়া কাচ তো আর কিনলে পাওয়া যাবে না!

তারপর একদিন ছাগল তিনটিকে নিয়ে ঘরে গিয়ে উঠল আইজাক। বেচারী ছাগলেরা এতদিন পাহাড়ের গায়ে একটা গর্তের ভেতর দিন কাটিয়েছে। ভাগ্যিস কোন হিংস্র জানোয়ার নেই এ-জঙ্গলে।

ঘরের মেঝে অবশ্য মাটির। তক্তা যখন তৈরি করতে পারবে আইজাক, মেঝেও তক্তার হবে। এখন মাটির মেঝেতে পুরু করে গাছের পাতা বিছানো। সেইখানেই আইজাকের শয়ন।

আইজাকের দুটি কাজ—কাঠ কাটা, আর জঙ্গল সাফ করে ক্ষেত বানানো। একখানা ক্ষেত তৈরি করতে কত যে পরিশ্রম! বড় ছোট অসংখ্য পাথর তুলতে হবে মাটি থেকে, কেটে-নামানো গাছের মূল তুলে ফেলতে হবে কোদাল দিয়ে। তারপর উঁচু মাটি কেটে খালখন্দ ভরাট করে দিলে তবে একখানা চাষ করবার মত ক্ষেত তৈরী হবে।

সারা শীতকাল কেটে গেল ক্ষেতখানি কায়দায় আনতে। শীতকালে অবশ্য তার বড় কাজ হল স্লেজ নিয়ে গ্রামে যাওয়া। এখন সে শুধু জ্বালানি কাঠ নিয়ে যায় না, বড় বড় গুঁড়ির টুকরো তুলে নিয়ে যায় গ্রাম পর্যন্ত। লুফে নেয় গ্রামের লোক। পয়সা দেয় দরাজ হাতে। নদীপথে যে সব চালানি কাঠ আসে গ্রামে, তার দাম বেশী তো বটেই, সে-সব গুঁড়িও ভাল নয়।

শীতের শেষে এক পশলা বৃষ্টি পড়তেই ক্ষেতে গম বুনে দিল আইজাক। বীজ সে কিনে এনেছে গ্রাম থেকে।

গ্রামে যখনই সে যায়, তখনই একটা কথা আইজাক সবাইকে বলে—"দেখো তো ভাই, আমার ওখানে গিয়ে কোন মেয়ে যদি থাকতে রাজী হয়! আমার ক্ষেত আছে ছাগল আছে, বাস করবার ঘরও আছে আর আছে কাঠের কারবার। যদি আমার গেরস্তালিটা দেখবার জন্যে কেউ যেতে চায় আমি একা পেরে উঠছি না। এই তো গ্রামে যখন আসি, ছাগলগুলো বেওয়ারিস হয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

তার এ খোঁজ-খবরে অনেকদিন পর্যন্তই সাড়া এল না কোন দিক থেকে। কিন্তু অবশেষে একদিন, এক সন্ধ্যাবেলায় একটি মেয়ে এসে দেখা দিল আইজাকের ঘরের দোরে। বয়স খুব অল্প নয়, দেখতেও সুশ্রী নয়, উপরন্তু ওপরের ঠোঁটটা কাটা।

তা হক, নিঃসঙ্গ আইজাক এই গন্নাকাটা মেয়েটাকে পেয়েই বেঁচে গেল যেন। নাম ওর ইঙ্গার।

ইঙ্গার এসেই আইজাকের কাজের ভার আদ্ধেক তুলে নিল নিজের কাঁধে। ক্ষেতে, জঙ্গলে সে সমান খাটে আইজাকের সঙ্গে সঙ্গে। তা ছাড়া,—ছাগলেরা বাচ্চা দিয়েছে, তাদের দুইবার কাজটাও সে হাতে নিয়েছে। ছাগলের দুধ থেকে পনির তৈরি করা—তাও সে ভালোই জানে। আরও কত কী যে জানে সে, তা আর এখন বলে লাভ নেই তার। সুতো কাটা, তাঁত বোনা, পশম দিয়ে মোজা বা জামা তৈরি করা, সে-সব সরঞ্জাম তো এ-জঙ্গলে নেই! হয় যদি কখনো—

তা হবে না-ই বা কেন? ক্রমেই তো এগিয়ে যাচ্ছে আইজাক। জমির কোন সীমা-সহরদ্দ

নেই, হাঁসিল করে নিতে পারলেই হল। বনভূমি সুইডেনের সীমানা পর্যন্ত চলে গিয়েছে, কেটে আনতে পারলেই অঢেল কাঠ। চাই কেবল মেহনত। তা মেহনত করবার শক্তি আইজাকের তো আছেই, ইঙ্গারেরও আছে। দুজনে উদয়াস্ত খেটে যাচ্ছে। লক্ষ্মীশ্রী ফুটছে এই পাহাড়ের কোলে, এই অরণ্যের আড়ালে।

ইঙ্গর কোথা থেকে এল? অনেকদূর থেকে। শহর থেকে। আইজাকের দৌড় গ্রাম পর্যন্ত, সেই গ্রাম থেকেও আরও অনেক দূরে শহর। সেখানে তার কাকা আছে, নাম তার সিভার্ট। আইজাক যেন শুনেছে নামটা। গ্রামের লোকের মুখেই আলোচনা শুনেছে সিভার্ট সম্বন্ধে। লোকটা সরকারী কাজ করে। জেলার খাজাঞ্চি বুঝি ও। নিজেও নাকি ধনী খুব।

তা এমন লোকের ভাইঝি হয়ে ইঙ্গার এই দুনিয়ার শেষ প্রান্তে ক্ষেত-মজুর আইজাকের ঘর করতে এল কেন? ইঙ্গার নিজের সম্বন্ধে বড় বেশী কথা বলে না। মাঝে মাঝে যা দু এক কথা বলে তা থেকেই আইজাক মনগড়া একটা ইতিহাস কল্পনা করে নিয়েছে। ও চিরদিন দুঃখী। গন্নাকাটা বলে ও সমবয়সীদের উপহাসের পাত্রী ছিল ছেলেবেলায়, যৌবনে ওর বর জোটে নি সেই একই কারণে। মেয়েটার মনের জোর অসাধারণ বলেই, যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ও দুঃসাহসিক কাজ করে বসেছে একটা, সমাজ ছেড়ে, পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে শুধু এইটি দেখবার জন্যে যে সেই অজানার অন্ধকারে সে দাঁড়াবার জায়গা একটা খুঁজে পায় কিনা।

আইজাক একটি সঙ্গিনীর প্রত্যাশায় আছে—সুইডেন সীমান্তের পাহাড়তলিতে, এ-খবর তার কানে পৌঁছেচে লোকের মুখে মুখে। আশায় আশায় সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। যেখানে অনেক মেয়ে আছে, সেখানে গন্নাকাটাকে কেউ পুঁছবে না, এটা স্বাভাবিক! কিন্তু যেখানে আর মেয়ে নেই?

ইঙ্গারের আন্দাজ ঠিক। সে দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছে। আইজাক বেঁচে গিয়েছে তাকে পেয়ে, আপন করে নিয়েছে তাকে। এই সংসারকেই যাতে নিজের বলে মনে করে ইঙ্গার, তার জন্যে আইজাকের চেষ্টার শেষ নেই।

ইঙ্গার দুবার অরণ্যবাস ছেড়ে শহরে গিয়েছিল। প্রতিবারই বেশ কয়েক দিনের জন্যে। দুবারই আইজাক হতাশ হয়ে পড়েছিল—ভেবেছিল ইঙ্গার আর বুঝি আসবে না। কিন্তু ভয় তার অমূলক বলে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। ইঙ্গার দুবারই ফিরেছে, এবং শুধু হাতে ফেরে নি। প্রথমবারে এনেছিল দুটি ভেড়া, দ্বিতীয় বারে একটা গাই।

আইজাক তো ভয়ে অস্থির! চুরি করে আনে নি তো ইঙ্গার? তাহলে তো একদিন ধরা পড়তেই হবে! ইঙ্গার একা নয়, আইজাকও ধরা পড়বে। কাজকর্ম ছেড়ে কয়েদখানায় গিয়ে বসে থাকতে হবে। নানা রকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আইজাক ইঙ্গারকে জিজ্ঞাসা করে—"কোথায় পেলে ভেড়া? কোথায় পেলে গরু?"

ইঙ্গার বলে—"কোথায় পেলাম মানে কী? ও তো আমার! আমি ভুঁইফোঁড় নাকি? কাকার বাড়িতে আমার আরও কত কী রয়েছে—বাক্স, কাপড়চোপড়, আয়না, চিরুনি, পমেটম—"

আইজাকের একটু একটু করে বিশ্বাস হয় যেন। সন্দেহটা তবু একেবারে কাটে নি, যতদিন ওলিন এসে ইঙ্গারের কথা সমর্থন না করল। ওলিন হল ইঙ্গারের দূরসম্পর্কের পিসী। সে একদিন তিন দিনের পথ জলাজঙ্গল ভেঙে পাহাড়তলিতে এসে হাজির হল—"তুই কেমন আছিস, দেখতে এলাম রে, ইঙ্গার!"

তখন সবে ইঙ্গারের কোলে একটি শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। একটি সুন্দর ছেলে। ওলিন পরামর্শ দিল—"এতদিন যা করেছিস, তা করেছিস। এইবার ছেলে নিয়ে দুজনে গ্রামে চলে যা, আগে নিজেদের বিয়েটা সমাধা করে নিবি, তার পরে ছেলের দীক্ষাভিষেক।"*

বিয়ের কথাটা ইঙ্গারের অনেক সময়েই মনে হয়েছে, কিন্তু ওরা দুজনে এক সঙ্গে কেমন করে বাড়ি ছেড়ে যায়? এখন সংসারে ছাগল ভেড়ার সংখ্যা অনেক, গাভীও আছে একটা। তাদের তদ্বির করে কে? এইজন্যেই জিনিসটা ক্রমশঃ পিছিয়ে গিয়েছে। এখন ওলিনকে বাড়িতে রেখে ওরা দুজনে একবার ঘুরে আসতে পারে বইকি! হপ্তাখানেক বই তো নয়!

তাই হল। হপ্তাখানেক ওলিনই খবরদারি করল ওদের গেরস্তালির। কাজ করতে ও জানে। আজ ওর নিজের কিছু না থাকলেও, একদিন ছিল সংসার। ছাগল গরু ছেলে মেয়ে সব। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে নিজের নিজের গেরস্তালি ফেঁদেছে, ওলিনের আর নিজের বলতে জায়গা নেই কোথাও। আজ এখানে, কাল ওখানে, এমনি করে দিন কাটে ওর। সাতটা দিন ইঙ্গারের ঘরে গিন্নিপনা করতে পেয়ে ও খুব খুশী। খাটা খাটুনি করল মনের আনন্দে।

ইলিশিয়াম মানে স্বর্গ। আইজাকের মনে হয় এই ক্ষেতখামার ঘরদোরই বুঝি স্বর্গ তার মত মানুষের পক্ষে। ভগবানের কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। সেই কৃতজ্ঞতার বশেই সে প্রথম সন্তানের নাম রেখেছে ইলিশিউস।

দ্বিগুণ উৎসাহে মেহনত করে চলে সে। বন কেটে আবাদ করে ফেলেছে অনেকখানি। ক্ষেতের পরে ক্ষেত। গম যব আলু সীম। কোন ক্ষেতে বা শুধু খড়, পশুর খাদ্য। তার পশুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ছাগল ভেড়াগুলির কত যে বাচ্চা! এমন কি ইঙ্গারের গাইটারও একটা বাছুর হল। গাইয়ের নাম ছিল সোনাসিঙ্গা, বাছুরের নাম রাখা হল রুপোসিঙ্গা।

ওলিন চলে গিয়েছিল, একদিন সে বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়ল আবার। এসে বলল—"গাঁয়ে কথা উঠেছে তোমাদের এই ক্ষেতখামার নিয়ে। সরকারের কাছ থেকে জমিগুলো তো কিনে নাও নি তোমরা!"

আইজাক আকাশ থেকে পড়ল যেন। বন ছিল, ভগবানের বন। সে ভগবানের জীব, বন

* ব্যাপটিজম। গির্জায় নিয়ে শিশুকে পবিত্র জলে স্নান করানো ও নামকরণ।

কেটে আবাদ করেছে। এ জমি আবার সে কিনবে কার কাছে? ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হয় বড়।

কিন্তু গাঁ থেকে লেণ্ডস্‌মান এসে পড়ল একদিন। একাধারে সে তহশিলদার দারোগা হাকিম। জিসলার লোকটার নাম। তার সঙ্গে এসেছে ব্রেইড, তার সহকারী।

আইজাক জিসলারকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল তার ঘর বাড়ি ক্ষেত খামার। জিলার মুখে বেশী কিছু বলে না, কিন্তু ভাবে মনে হয় সে খুব খুশী আইজাকের কৃতিত্ব দেখে। "সরকারকে কিছু সেলামী দিয়ে জমিগুলো তোমায় কিনে নিতে হবে। যা আবাদ করেছ, এবং পরে যা আবাদ করবে। কতটা নিতে চাও তুমি?"

আইজাক এসব নিয়ে কোনদিনই চিন্তা করে নি। কতটা চায়? যতটা দরকার হবে. ততটাই। কিন্তু দরকার যে কতটা হবে, তাই বা সে এখন কেমন কবে বলবে?

জিসলার বোঝে তার মনের ভাব। এই সাদাসিধে মেহনতী মানুষটার ওপর সহানুভূতি জাগে তার। নিজেই আন্দাজমত একটা চৌহদ্দী ঠিক করে দেয় আইজাকের উপনিবেশের। এদিকে দু ফার্লং, ওদিকে দু ফার্লং, সেদিকে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত, আর উলটো দিকে আবার দু ফার্লং—সব মিলে সে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, একটা রাজ্য বললেই হয়।

জিসলার জিজ্ঞাসা করে--"তোমার এস্টেটের নাম কি দিয়েছ?"

জিসলার জিজ্ঞাসা করে—"তোমার এস্টেটের নাম কি দিয়েছ?"

নাম? আইজাক মাথা চুলকায়। নাম তো সে কিছু দেয় নি!

জিসলারই মনের খেয়ালে একটা নাম বাৎলে দিল—"তোমার এ-জায়গাটার নাম দিলাম সেলাঁরা। সেই নামেই লেখাপড়া হক।"

সেলাঁরা? তা, বেশ নাম তো সেলাঁরা! অবশ্য যে কোন নামই দিত জিসলার. অপছন্দ হত না আইজাকের। দামটা একটু সস্তা হলেই সে খুশী।

দাম?—ব্রেইড লোকটা নিজেও এই অঞ্চলে কিছু জমি কিনতে চাইছে। এত দূরে নয়. গাঁয়ের কাছাকাছি। কাজেই জমির দাম যথাসম্ভব সস্তা যাতে ধরা হয়, সেইটিই সে চাইছে। কিন্তু আইজাক এত জমি করবে কী? সে বারবারই বাধা দেয় জিসলারকে—"ফার্লং টার্লং কী বলছেন? অত জমি ও করবে কী?"

"কী যে করবে, তা কয়েক বছর বাদে দেখে নিও"--জিসলার আইজাককেও কিছু জিজ্ঞাসা করে না, ব্রেইডের কথাতেও কান দেয় না। সেইখানে, ইঙ্গারের রান্নাঘরে বসেই চটপট দলিল লিখে ফেলে। পড়ে শোনায় আইজাককে, সে কিছুই বোঝে না।

"আমি এই সব জমির দাম ধরে দিচ্ছি পঞ্চাশ ড্যালার। দিতে হবে পাঁচ বছরে। বার্ষিক কিস্তি দশ ড্যালার করে। তবে এটা আমার সুপারিশ মাত্র, দাম ধার্য করার মালিক হল ওপরওয়ালারা। অবশ্য আমার কথার খুব বেশী নড়চড় করবে না তারা, এইটেই সম্ভব।"

ইলিশিউস কয়েকটা পাথর নিয়ে খেলা করছিল। তার রং তামাটে লাল। জিসলারের নজর পড়ল সেদিকে। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল হাতে নিয়ে। তারপর আইজাককে জিজ্ঞেস করল—

"কোথায় পেলে এসব পাথর?"

"ওই পাহাড়ের মাথায়। ছেলেকে খেলবার জন্যে এনে দিয়েছি।"

"আরও আছে এরকম?"

"হাজার হাজার।"

"দেখতে হবে তো! এবার আর সময় নেই। আসব আবার শীগগির। দেখতে হবে। যেখানে এসব পাথর আছে, সে-জায়গা তোমার এলেকাতেই পড়ল বুঝি?"

"তা পড়ল বোধ হয়—"

"বেশ, বেশ—"

জিসলার চলে গেল। ফিরে এল কয়েক মাস পরে। ওপরওয়ালারা আইজাকের দলিল মঞ্জুর করে দিয়েছে, তবে সেলামীটা ধার্য করেছে পঞ্চাশ ড্যালার নয়, একশো ড্যালারে। তবে কিস্তি অবশ্য ওই দশ ড্যালার করেই বছর বছর।

আইজাক প্রথম কিস্তির দশ ড্যালার জমা দিয়ে দিল। শীগগিরই গ্রামে গিয়ে দলিল রেজিস্ট্রি করে আসবে।

২

প্রায় তিন বছর কেটে গিয়েছে তার পর।

ইঙ্গারের আর এক ছেলে হয়েছে। ওর খাজাঞ্চি কাকার নামের সঙ্গে মিলিয়ে ইঙ্গার এ-ছেলের নাম রেখেছে সিভার্ট। কাকাটি নাকি বেজায় ধনী, এদিকে নিঃসন্তান। কাজেই আশা করা যায়, কাকার নামে ছেলেটার নাম রাখলে কাকা একেই উত্তরাধিকারী করে যাবেন মরবার সময়।

ছেলে দুটি হৃষ্টপুষ্ট, হেসে খেলে মানুষ হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। অনেক শহরবাসী শিশুর চাইতে এরা খায় ভাল। দুধ তো অঢেল, মাংসেরও অভাব নেই, সময় করে নদীতে জাল ফেলতে পারলেই এক চুপড়ি মাছ ধরে আনা যায়। পুষ্টিকর খাদ্য সব রকমই মেলে শিশুদের।

আবারও সন্তান হবে ইঙ্গারের। আইজাক তো সারাদিন বাইরে বাইরেই থাকে। সেদিন সে গ্রামে গিয়েছে বেসাত নিয়ে। ফিরে এসে শোনে—একটা মরা মেয়ে হয়েছিল, ইঙ্গার তাকে ইতিমধ্যেই কবর দিয়ে এসেছে বনের ভেতর।

মরা মেয়ে হয়েছিল? আইজাক দুঃখিত হল বইকি! কিন্তু ও নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাল না। সব ছেলেমেয়েই কি আর বেঁচে থাকে? সবাইয়েরই তো দু একটা মরেছে মাঝে মাঝে! সে কাজের ভেতর ডুবে গেল। মরা মেয়ের কথা আর মনেই রইল না তার।

কিন্তু এর পরই ওলিন এল বেড়াতে। মরা মেয়ে হয়েছিল শুনে মুখে কিছু বলল না বটে,

কিন্তু তার মনে মনে ক্রমাগতই তোলপাড় করতে লাগল কথাটা। মেয়েটা মরাই হয়েছিল, না হওয়ার পরে মরেছে? নিজেই মরেছে, না ইঙ্গার মেরে ফেলেছে তাকে?

মারবার কারণ? হ্যাঁ, কারণ একটা অনুমান করা যায় বইকি! ইঙ্গার নিজে গন্নাকাটা। গন্নাকাটা মায়ের মেয়ে গন্নাকাটা হওয়াই সম্ভব। নিজের বিশ্রী মুখখানার জন্যে ইঙ্গার শৈশবে কৈশোরে প্রথম যৌবনে কত যে মনস্তাপ ভোগ করেছে, তা তো ওলিন জানে। সেই রকম মনস্তাপের হাত থেকে মেয়েটাকে রেহাই দেওয়ার মতলবেই যদি ইঙ্গার তাকে মেরে ফেলে থাকে?

কথা উঠতে পারে, এ-রকম সন্দেহ মনে উদয় হলেও আত্মীয়া হিসাবে ওলিনের সে-সন্দেহ মনেই চেপে রাখা উচিত ছিল। ও-কথা তুলে ঘাঁটাঘাঁটি করাতে এই বন-জঙ্গলের দেশেও যে ইঙ্গারের বিপদ ঘটতে পারে, তা কি আর সে জানে না? দেশে তো আইন বলে একটা জিনিস আছেই, তা আইনকে প্রয়োগ করবার মালিকেরা যত দূরেই থাকুক।

হ্যাঁ, মনের সন্দেহ মনে চেপে রাখাই উচিত ছিল ওলিনের। তা সে রাখতে রাজী নয়। কারণ সে গভীর জলের মাছ। স্বার্থের জন্যে ইঙ্গারকেও সে পথে বসাতে পারে। নিজে সে চাল-চুলো-বিহীন নিরাশ্রয়। ইঙ্গার যদি পুলিসের কবলে পড়ে, তার যদি জেল হয়, আইজাকের গেরস্তালি আগলাবার জন্যে লোক দরকার হবে তো একটা! ওলিন ছাড়া আর আসবে কে? চাই কি দু চার বছরের জন্যে একটা আস্তানা জুটে যেতে পারে এই বুড়ো বয়সে!

ওলিন বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল! কিন্তু বন ছেড়ে গেল না। খুঁজতে লাগল তন্ন তন্ন করে। খুঁজে সে ঠিকই বার করল কবরটা। তার পর গিয়ে খবর দিল গ্রামে। জিসলার তখন আর লেন্ডসমান নেই। তার চাকরি গিয়েছে, সরকারী টাকার ঠিক-ঠিক হিসেব দিতে পারে নি বলে।

জিসলার নেই, নতুন লেন্ডসমান এসেছে হেয়ারডাল। এও লোক মন্দ নয়। তবে জিসলারের সঙ্গে আইজাকের একটু খাতির হয়ে গিয়েছিল, সে থাকলে ওরা একটু অনুগ্রহ পেতে পারত।

তা হেয়ারডালও অহেতুক নিগ্রহ কিছু করলো না। অভিযোগ যখন এসেছে, তদন্ত করতে সে বাধ্য। একদিন এসে কবর খুঁড়ে শিশুদেহটা সে নিয়ে গেল। ওলিনের সন্দেহই ঠিক। সবাই দেখল—মরা মেয়েটাও গন্নাকাটা হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

আইজাক যেন পাথর বনে গিয়েছে। ইঙ্গারকে এ-বিষয়ে কোন প্রশ্নই সে করতে পারে নি। করবার মত ভাষাই সে খুঁজে পায় নি। কাজকর্ম ঠিকই করে যাচ্ছে, কিন্তু সে যেন যন্ত্রচালিতের মত।

যথাসময়ে ময়না তদন্তের ফল প্রকাশ হল। ডাক্তার বলেছে—ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সুস্থ মেয়েটার গলা টিপে হত্যাই করা হয়েছিল।

তারপর ইঙ্গারকে নিয়ে হেয়ারডাল শহরে চলে গেল একদিন। সেখানে বিচার হল তার। বিচারকেরা সহৃদয় লোক। সদ্যোজাত শিশুকে জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা আর মনস্তাপের হাত থেকে



আইজ্যাককে জিজ্ঞেস করল জিসলার, "কোথায় পেলে এসব পাথর?"



টনি উৎফুল্ল হয়ে বলল, "দু মাস পরে তোমার অর্থ ডবল হয়ে ফিরে আসবে।"

বাঁচাবার জন্যেই যে মূর্খ মা তাকে জন্মমুহূর্তে ভবপারে পাঠিয়ে দিয়েছে, এটা বুঝতে তারা অক্ষম হল না। অনেকখানি সহানুভূতি এসে পড়ল ইঙ্গারের ওপরে।

মাত্র আট বছরের জেল হল ইঙ্গারের। তাকে নিয়ে গেল দূরবর্তী এক শহরে। ট্রণ্ডেম শহর, সেখানে বৃহৎ কারাগার আছে।

ইঙ্গারের গেরস্তালির ভার নিয়ে সেলাঁরাতে পাকা হয়ে বসল ওলিন।

বেচারী ওলিন! তার দিকে তো কেউ চায় না! সৎপথে থেকে সে দেখেছে। না পাওয়া যায় খেতে, না পাওয়া যায় শুতে! তার নিজের ছেলেমেয়েরাই তাকে দু দিনের বেশী চার দিনের আশ্রয় দেয় না, অন্যের কথা তো দূরে থাক। একটু নির্মম হলে যদি আট বছরের মত একটা আশ্রয় জুটে যায়, তা সে হবে না কেন? তার পর, অসৎ পথই বা একে বলা চলে কেমন করে? পাপ যে করেছে, তাকে সাজা দিতে হবে না? দেশের আইন ভগবানের অনুশাসন সবই কি উড়িয়ে দেবার বস্তু?

ওলিন গিন্নীপনায় কাঁচা নয়। বয়সের আন্দাজে ও এখনও শক্তসমর্থ রয়েছে। খাটতে পারে। গরু ছাগল দুইছে, পনির বানাচ্ছে, ভেড়ার লোম ছাঁটাই করে পশমের বাণ্ডিল বাঁধছে, আইজাক আর তার দু ছেলের খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধাই হতে দিচ্ছে না। ছেলে দুটিকে ও ভালই বাসে, তারাও ওর খুবই বাধ্য।

না, সেদিক দিয়ে আইজাকের অসুবিধা বিশেষ হয় নি। কিন্তু তবু ঘর সংসারের ওপর আকর্ষণটি আর আগের মত নেই তার। উদয়াস্ত পরিশ্রমের কসুর নেই। বরং আগের চাইতে আরও বেশী পরিশ্রমই সে করে এখন। আগে ইঙ্গারের সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কইবার জন্যেও কাজ কামাই করত মাঝে মাঝে পাঁচ মিনিট দশ মিনিটের জন্যে। এখন কথা কইবে কার সঙ্গে? ওলিন? ইঙ্গারের সাজা হয়েছে যার জন্যে, তার সঙ্গে আবার কথা? ওলিনকে সে সেলাঁরাতে ঠাঁই দিয়েছে একান্ত নিরুপায় হয়ে। গেরস্তালি দেখবার অন্য লোক যে নেই! থাকত যদি, ওলিনকে আর সেলাঁরার মাটিতে পা দিতে দেয় সে?

দিনে দিনে সেলাঁরার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। মাটির চাপড়া দিয়ে ঘর ছেয়েছিল আইজাক সে প্রথম যুগে। এখনও সে ঘর আছে, কিন্তু এখন মানুষ বাস করে না তাতে, বাস করে ছাগল ভেড়া। মানুষের জন্যে তৈরী হয়েছে আগাগোড়া কাঠের তৈরী বড় একখানা ঘর, তাতে একটা কামরা খুব বড়, একটা ছোট। ছোট কামরাতে ওলিন থাকে। বড় কামরায় দুদিকে দুটো বিছানা, একটাতে আইজাক শোয়, অন্যটাতে দুই ছেলে। ঘরের দেওয়ালে টিকটিক করে একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি। সেটাতে আবার ঘণ্টা বাজে টংটং করে, ষাট মিনিট পরে পরে।

কত কী জিনিস সেলাঁরাতে গড়ে উঠেছে আইজাকের মেহনতের ফলে। নদীর ধারে গম ভাঙার কল। বনের ধারে করাতকল! নদীর জলে একখানা নৌকো। প্রত্যেকটা জিনিসই আইজাকের হাতে গড়া। কলগুলো কিনে আনে, ঠিকমত বসিয়ে কাজ চালু করার মালিক একা

আইজাক। তার লাঙ্গল, তার মই, তার আঁচড়া, কোদাল কুড়ুল শাবল কাস্তে সদাই ঝকঝক তকতক করছে। একটা ঘাস-কাটা কল কেনবার মতলব আইজাকের মনে মনে আছে। এত জমি সে হাঁসিল করে ফেলেছে, কলে না কাটলে, হাতে ঘাস কেটে তা পরিষ্কার রাখা যায় না।

আগে স্লেজগাড়ি ছিল তার একমাত্র গাড়ি। এখন সে দস্তুরমত গাড়ি তৈরি করেছে চার চাকার। ঘোড়ায় টানে। বেশির ভাগ সময় মালই টানে—সেলাঁরার চাষের বা করাতকলের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে যায় গ্রামের বাজারে। আবার সময় সময় আইজাক ছেলেদের নিয়ে চেপেও বসে সেই গাড়িতে। রঙ্গিন কাপড়ে মোড়া গদি তৈরী হয়েছে। নিজেরা চড়বার সময়ে সেই গদি এঁটে নেওয়া হয় গাড়ির ভেতরে।

ঘোড়া একটা হয়েছে, আরও একটা কেনবার ফিকিরে রয়েছে আইজাক। গাড়ির রাস্তা? রাস্তা এখনও গড়ে ওঠে নি, তা ঠিক। যে-বনে সৃষ্টির আদি যুগ থেকে মানুষ ঢোকে নি কোনদিন, সেইখানে প্রথম মানুষের পা পড়ল, আইজাকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তারই পায়ের দাগে দাগে একটা পায়েচলা সুঁড়িপথ সৃষ্টি হয়েছিল ক্রমশঃ। এখন গাড়ি চলে সেই সুঁড়িপথ অবলম্বন করেই। দু পাশের ছোট ছোট আগাছা গাড়ির চাকার নীচে পড়ে ভেঙে থেঁতলে যায়।

শক্ত গাছ যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আইজাক গাড়ি থেকে নামে কুড়ুল হাতে করে, বাধা বিঘ্ন কেটে উড়িয়ে দেয় তক্ষুনি। চাকা যদি গর্তে পড়বার উপক্রম হয়, আইজাক গাড়ি থামিয়ে কোদাল হাতে নেমে পড়ে, পাশ থেকে মাটি কেটে গর্ত ভরাট করে দেয় চক্ষুর পলকে! এই ভাবে দু-চার বার চলাফেরার পরে, এখন গাড়ি নির্বিঘ্নে গড়গড়িয়ে চলে যায় গ্রাম পর্যন্ত, ভাল রাস্তা না হোক, চওড়া রাস্তা একটা হয়েছে বইকি!

সেই রাস্তা বেয়ে একদিন হেঁটে এল জিসলার! ভূতপূর্ব লেন্ডসমান। হিসাবের গরমিল হওয়াতে সরকারী চাকরি চলে গিয়েছিল তার। সে নিজেও চলে গিয়েছিল সুইডেনে, তার শ্বশুর-বাড়িতে। সেইখান থেকে সে নরওয়ে সরকারের সব দেনা মিটিয়ে দিয়েছে। ফিরে এসেছে এ দেশে।

জিসলারের প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা আছে আইজাকের। সস্তায় সেলাঁরার জমি সেই পাইয়ে দিয়েছিল আইজাককে। সস্তায় এবং দীর্ঘ কিস্তিবন্দীতে। বিস্তীর্ণ জমিদারির মালিক হয়ে বসবার জন্যে ওকে খরচ করতে হয়েছে মাত্র একশো ড্যালার। তাও দশ বছরের কিস্তির কয়েক কিস্তি বাকী আছে এখনও।

আইজাক খুব খাতির করে গ্রহণ করল জিসলারকে। জিসলার খুব খুশী সেলাঁরার উন্নতি দেখে। সব ঘুরে ঘুরে দেখল! তারিফ করল, পরামর্শ দিল।

ইতিমধ্যে সেই ব্রেইডও কিছু জমি কিনেছে। যে ব্রেইড ছিল জিসলারের সহকারী। গ্রাম থেকে সেলাঁরায় আসতে মাঝামাঝি রাস্তায় জমি নিয়েছে ও। বাড়ি বানিয়েছে, নাম দিয়েছে

ব্রেইডাব্লিক। বসবাস করছে সেই বাড়িতে। কিন্তু জমিটমির কাজ সে করছে না বিশেষ। কারণ লোকটা জমির কাজ জানেও না, তা ছাড়া সে পরিশ্রমীও নয়।

ব্রেইডাব্লিক আর সেলাঁগাতে আকাশপাতাল তফাত। দেখে দেখে জিসলার আইজাকের পিঠ চাপড়ায় আর ব্রেইডের নাম উঠলেই টিটকিরি দেয়। একদিন জিসলার বলল—"ওহে, সেই পাথরগুলো আছে?"

"কোন্ পাথর?" অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করে আইজাক।

তোমার ছেলে খেলবে বলে পাহাড়ের ওপর থেকে যে লালচে নুড়িগুলো এনেছিলে তুমি? সেবারে দেখে গিয়েছি—'

"আছে বইকি! দরকার হলে পাহাড় থেকেও আনতে পারি বস্তা বস্তা।"

জিসলার নিজেই চলে গেল পাহাড়ের মাথায়। অবশ্য আইজাককে সঙ্গে নিয়ে। বেছে বেছে তামাটে লালপাথর নিয়ে এল অনেকগুলো। তারপর বস্তাভরা নুড়ি নিয়ে চলে গেল গ্রামে। সেখান থেকে সে বড় বড় জায়গায় যাবে, স্টিমার ধরে।

ফিরে এল অবশেষে একদিন। এসে এক ঝুড়ি কাগজপত্র বার করল। আইজাককে ডেকে বলল—"ওই পাহাড়ের মাথায় তামার খনি আছে। বলেছে তারাই, যারা এসব ব্যাপার বোঝে। খনির অল্প অংশই তোমার ভাগে পড়েছে। অর্থাৎ নরওয়ে সরকারের ভাগে। বেশির ভাগই চলে গিয়েছে সুইডেন সরকারের অংশে। এখন কথা হল এই যে আমি তোমার অংশের খনিটুকু কিনে নিতে চাই। চাষবাসের প্রয়োজনে কোনদিনই আসবে না ওই পাথুরে রাজ্য। আর খনি খুঁড়ে তামা বার করবার কাজ—সে তুমি জানোও না, সে কাজ চালাবার মত পয়সাও তোমার নেই, কোন কালে হবেও না। অতএব তুমি ওটা বেচে দাও, কি বল?"

আইজাক বলল—"আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন। সত্যিই তো, আমি ও দিয়ে কী করব?"

"তা হলে এই দলিলে সই কর। আমি দু শো ড্যালার দামে কিনে নিচ্ছি তোমার খনিটা।"

দাম? দু শো ড্যালার? সত্যি সত্যি জিসলার দু শো ড্যালার দিয়ে যাবে আইজাককে—এ আশা সে বেচারী এক মুহূর্তের জন্যেও করে না। কিন্তু তাকে অবাক্ করে দিয়ে পকেট থেকে সত্যিই দু শো ড্যালারের করকরে নোট বার করে ফেলল জিসলার। তারপর বলল—"এই দু শো-ই কিন্তু সব নয়। খনি চালু হবার পর ও থেকে যা লাভ হবে, তার শতকরা দশ ড্যালার তুমি চিরকাল ধরে আমার কাছ থেকে পেতে থাকবে। তুমি বা তোমার ছেলেরা!"

ব্যাপারটা আকাশকুসুমের মতই মনে হত মূর্খ চাষী আইজাকের, যদি না তার সামনে জাজ্বল্যমান বর্তমান থাকত ওই করকরে দু শো ড্যালার। তার মনে হল—জিসলার জাদুকর, সে

যা ছোঁবে, তাই থেকেই ড্যালার বেরোতে থাকবে এই রকম গাদা গাদা। ভক্তি শ্রদ্ধায় সে একেবারে হতবাক্ হয়ে রইল।

তখন কথাবার্তার মোড় অন্যাদিকে ঘুরিয়ে দিল জিসলার। জিজ্ঞেস করল ইঙ্গারের কথা! সে যা শুনেছে, তা জনশ্রুতি। প্রকৃত ব্যাপারখানা সে আইজাকের কাছে শুনতে চায়।

আইজাক সব সত্যি কথাই বলল। মেয়েটা গন্নাকাটা অবস্থায় জন্মেছে বলেই ইঙ্গার তার গলা টিপে মেরে ফেলেছিল। নিজে তো আদ্ধেক জীবনকাল ধরে সে লোক-সমাজের টিটকিরি আর নাক-সিঁটকানো সহ্য করে এসেছে—ওই কাটা-ঠোঁটের জন্যে। সেই তুষানলের জ্বালা মেয়েটাকেও সইতে হবে, একথা ভাবতে গিয়েই সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। পাগল না হলে কোন মা নিজের হাতে সদ্যোজাত মেয়েকে খুন করতে পারে কখনও?

জিসলার মেনে নিল একথা। সে এক আশ্চর্য কথা বলল তার পরে। "আমি হয়তো ট্রন্ডেমে গিয়ে ইঙ্গারের সঙ্গে দেখা করব। কারাধ্যক্ষের সাথেও কথা কইব। ইঙ্গার যাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই খালাস হয়ে আসতে পারে, তার জন্যে একটা চেষ্টা আমি করব ভাবছি। আমার মনে হয়—অবস্থা বিবেচনায় ও খালাস পেতেও পাবে! বিচারের সময় ওর পক্ষ থেকে সব কথা ভাল করে কেউ বুঝিয়ে দেয় নি আদালতকে। আমি তো তখন এদেশে ছিলাম না! সুইডেনে ছিলাম।"

আইজাক কী বলবে? সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে নীরবে তাকিয়ে থাকে জিসলারের দিকে। মনে মনে ভাবে—সামনে বুঝি সে কোন ছদ্মবেশী দেবদূতকে দেখতে পাচ্ছে। মানুষের কি অত দয়া হয়?

দীর্ঘ দিন পার হয়ে গেল তার পরে। হঠাৎ একদিন গ্রাম থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিল ডাক-অফিস। টেলিগ্রাম করছে জিসলার—ইঙ্গার খালাস পেয়েছে। রওনা হয়ে যাচ্ছে তার মেয়েকে নিয়ে সেলাঁরায়।

মেয়ে? হ্যাঁ, যখন ইঙ্গারকে জেলখানায় নিয়ে যায়, তখন ও ছিল আবারও অন্তঃসত্ত্বা। কারাগারেই তার ওই মেয়েটি হয়। ওর নাম সে রেখেছে—হ্যাঁ, দেশের রাজার নাম লিওপোল্ড—রাজার নামের সাথে মিল রেখে ও মেয়ের নাম লিওপোল্ডাইন রেখেছে। মেয়ের বয়স এই পাঁচ বছর হল।

ইঙ্গার খালাস হয়েছে। দীর্ঘ ছয় বছর পরে সেলাঁরাতে ফিরে আসছে স্বামীপুত্রের কাছে। আট বছর কারাদণ্ড ছিল তার, জিসলারের চেষ্টায় দু বছর আগেই সে ফিরতে পেরেছে।

নির্দিষ্ট দিনে গাড়ি সাজিয়ে আইজাক গ্রামে চলে গেল। গাড়িতে তুলে দিল রঙিন কাপড়ে মোড়া গদি, খোলের ভেতর তুলে নিল একখানা ভালুকচামড়ার কম্বল। রাতে যাতে ছোট মেয়েটার ঠাণ্ডা না লাগে।

নিজে গায়ে দিল নতুন লাল শার্ট। পকেটে নিল কাঁচি এক জোড়া। রাস্তায় মাঝে মাঝে

ডোবা আছে। একটা ডোবার পাশে বসে জলের ভেতর নিজের ছায়া দেখে দেখে বুক-পর্যন্ত-লম্বা লাল দাড়ি কুচকুচ করে কেটে নামিয়ে দিল। রইল সামান্য চাপদাড়ি একটু। একাজ সে বাড়িতেও করতে পারত বইকি! বাড়িতে আয়নাও ছিল। কিন্তু তবু সে বাড়িতে তা করে নি। ওলিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কাটতে তার লজ্জা করেছিল।

৩

ইঙ্গারকে আর চেনা যায় না। সে আর গন্নাকাটা নেই। তার ওপরের ঠোঁটে অস্ত্রোপচার করেছিলেন ট্রণ্ডেম জেলখানার ডাক্তার, ফলে কাটা ঠোঁট জোড়া লেগে গিয়েছে। জোড়ের মুখে মিহি একটু দাগ ছাড়া এমন আর কিছুই নেই এখন, যা দেখে আগের সেই কুৎসিত চেহারার এতটুকুও আভাস পাওয়া যায়।

শুধু চেহারাতেই পরিবর্তন নয়, মনটাও তার পালটেছে। সে লিখতে পড়তে শিখেছে, ভাল ভাল সেলাইয়ের কাজ শিখেছে, তাঁত বোনাতে ওস্তাদ হয়ে এসেছে। জেলখানার কাজের দরুন কয়েদীরা কিছু কিছু মজুরি পায়, তা দিয়ে নিজের একটা সেলাই কল কিনেও এনেছে ইঙ্গার। আইজাকও সেই কলের চাকচিক্য দেখে অবাক্।



লাল দাড়ি কুচকুচ করে কেটে নামিয়ে দিল।

সবচেয়ে সে অবাক অবশ্য লিওপোল্ডাইনকে দেখে। পাঁচ বছরের বাড়ন্ত গড়নের সুশ্রী মেয়ে, মায়ের কথামত কেমন গুটিসুটি এসে আইজাকের হাত ধরে নাড়া দিল। এই মা ও মেয়ের সামনে হঠাৎই আইজাকের নিজেকে বড়ই গ্রাম্য, বড়ই তুচ্ছ বলে মনে হল।

কিন্তু অবাক হওয়াটা এক তরফাই নয়। ইঙ্গারেরও বিস্ময় অসীম। সেটা অবশ্য আইজাকের লাল শার্ট বা ছাঁটা দাড়ির দরুন নয়, তার হাবভাবের দরুন। একটু যেন বড়মানুষির আভাস ফুটে বেরুচ্ছে ওর ভঙ্গীতে, ওর চলাফেরায়। তার গাড়িখানায় ভেতরে আবার গদি। ভালুক চামড়ার কম্বল! আর গাড়ির ঘোড়াটা নিতান্ত হাড় জিরজিরে প্যাকাটিপানা নয়। রীতিমত তেজী ঘোড়া, এর দাম অনেক।

সেলাঁরাতে এসে ইঙ্গারের বিস্ময় আরও বেড়ে চলে। নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে, নতুন নতুন কল বসেছে তাতে। নতুন ক্ষেত হাঁসিল হয়েছে কত কত দূর সীমানা জুড়ে। তাতে নতুন রকমের সব ফসল। এত জমি তাদের? হ্যাঁ, এতই জমি তাদের। জিসলার যে দলিল করে দিয়েছে, তাতে এসব জমি তো পেয়েছেই তারা, ওদিকে পাহাড়ের মাথা, সেদিকে নদী পর্যন্ত—এখনও এমন কত শস্যক্ষেত্র যে বেরুবে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

ওই জিসলার—তার প্রশংসা আর ইঙ্গারের মুখে ধরে না। সে ট্রণ্ডেমে গিয়ে জেলখানায় কতবার যে দেখা করেছে ইঙ্গারের সাথে! কত ঝগড়াই না করেছে ওর জন্যে কারাধ্যক্ষ মশাইয়ের সঙ্গে! জিসলার পেছনে রয়েছে দেখে কারাধ্যক্ষ ইদানীং বেশ সমীহ হয়ে চলত ইঙ্গারের ব্যাপারে। ওকে যাতে সকাল সকাল খালাস দেওয়া হয়, তার জন্যে সুপারিশও করেছিল সে।

জিসলারের কথাতেই খনির কথা এসে পড়ল। পাহাড়ের মাথা—যেটা বড় ছোট পাথরের চোঙগড়ে ভরতি শুধু কস্মিন্‌কালে যা থেকে একদানা ফসল পাওয়ার আশা ছিল না, তাই নগদ দু শো ড্যালার দিয়ে কিনে নিয়েছে ওই জিসলার। ভবিষ্যতে ও থেকে যদি লাভ হয় তারও দশ ভাগের এক ভাগ বখরা পাবে আইজাক। জিসলারের মত উপকারী লোক বহু ভাগ্যে পাওয়া যায়।

এইবার ওলিন চলে গেল নিজের দেশে। ইঙ্গার আবার নিজের গেরস্তালিতে জাঁকিয়ে বসে গেল। এখন আর আগের মত নির্জন নেই এঅঞ্চল। এক একটা করে খামার তৈরী হয়ে উঠেছে আশেপাশে। ব্রেইডাব্লিক আগেই পত্তন হয়েছিল, কিন্তু অলস ব্রেইড ওটাকে নিয়ে সুবিধা করে উঠতে পারল না। বেচে দিল ফ্রেডরিক বলে অন্য একটা লোকের কাছে। ফ্রেডরিকের ভাই অ্যাক্সেল স্ট্রম আগে থেকেই খামারের পত্তন করেছে একটা—মেনল্যাণ্ড।

একদিন দলবল নিয়ে জিসলার এসে পড়ল। দলে এঞ্জিনিয়ার আছে একজন। সে পরখ করে দেখল জিসলারের খনি। নমুনা আর এক বস্তা পাথর সঙ্গে নিয়ে তারা চলে গেল। ফিরে এল উলটো পথ দিয়ে কিছুদিন পরে। সুইডেন থেকে ধনী নিয়ে এসেছে এঞ্জিনিয়ার। তারা চল্লিশ হাজার ড্যালারে জিসলারের কাছ থেকে খনি কিনে নিল। তারই দশ ভাগের এক ভাগ চার হাজার ড্যালার আইজাককেও তারা দিতে বাধ্য হল। জিসলারই আদায় করে দিল। আইজাক এখন রীতিমত ধনী।

এবারে টেলিগ্রাফের তার খাটানো হতে লাগল এই পথ দিয়ে। ব্রেইডাব্রিক, সেলাঁরার ঠিক সামনে দিয়ে তার চলে গেল, পাহাড়ের মাথা পার হয়ে সুইডেন পর্যন্ত। তাদের নীচে নীচে রাস্তাও প্রশস্ত হল। যে-রাস্তা একদিন নিবিড় অরণ্যের বুকে জেগেছিল, একটি মাত্র মানুষের—ওই আইজাকের—পায়ের দাগে দাগে।

দুটি ছেলে বড় হচ্ছে। তাদের কিছু কিছু লেখাপড়া ইঙ্গার শিখিয়েছে। তারপর তারা গ্রামে চলে গেল স্কুলে পড়বে বলে। থাকবে আইজাকের বহু-আলাপী কামারমশাইয়ের বাড়িতে। কামার অবশ্য পয়সা পাবে সেজন্যে, অথবা পয়সার বদলে খাদ্যসামগ্রী। আর সেলাঁরার ভাঁড়ার তো ও-মুল্লুকে প্রসিদ্ধ। অত দুধ আর পনির, মাছ আর মাংস, গম আর সবজি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নেই।

ছেলেরা মাঝে মাঝে সেলাঁরাতে আসে ছুটি উপভোগ করবার জন্যে। টেলিগ্রাফের এঞ্জিনিয়ারও সেলাঁরাতে এসে আস্তানা গেড়ে বসে দু চার দিনের জন্যে। আইজাকের বড় ছেলে ইলিশিউসকে দেখে ইঞ্জিনিয়ারের ভারী পছন্দ হয়ে গেল। সে আইজাককে বলল—"ছেলেটাকে আমার সঙ্গে দাও। আমি ওকে শহরে নিয়ে যাই। ও যে-রকম তুখোড় ছেলে, ব্যবসাতে উন্নতি করবে।"

প্রস্তাব শুনে ইলিশিউস উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শহরে যাবে, সভ্য হবে—এর চেয়ে ভাল কথা আর কী হতে পারে? ইঙ্গারেরও খুব উৎসাহ দেখা গেল এই প্রস্তাবে। সেও শহর ঘুরে এসেছে। জেলখানার ভেতরে থেকেই শহরের জৌলুশের যে আভাস সে পেয়ে এসেছে, তাতেই চোখে এখনও ধাঁধা লেগে আছে তার। ছেলেটা সেই শহুরে আবহাওয়ায় মানুষ হবে—এই আশায় সে ভালমন্দ বিচারের শক্তিই হারিয়ে ফেলল। "পাঠাও ইলিশিউসকে এঞ্জিনিয়ারের সাথে"—ক্রমাগত স্বামীকে খোঁচাতে লাগল ইঙ্গার।

বেচারী আইজাক! শহর সম্বন্ধে তার মোহ নেই, বরং বেশ একটু আতঙ্কই আছে। শহরের মানুষ সামনেই দেখেছে সে। ওই জিসলার, ওই এঞ্জিনিয়ার, ওই ইঙ্গারও। ঠিক যেন ওরা মিশ খায় না গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে। না, ফিরে আসার পর ইঙ্গারকেও যেন কখনো কখনো বেমানান লাগে এই পরিবেশে। একটু বিলাসিতা, খানিকটা চটক—এ নইলে যেন শহরের মানুষ সহজভাবে নিশ্বাস নিতেই পারে না। ওই তো ইঙ্গার আজকাল মাঝে মাঝেই বলছে—একটা দাসী না রাখলে আর চালাতে পারছে না। দাসী? আইজাকের তো চক্ষুস্থির দাসী রাখবার কথা শুনে।

ছেলেটা শহরে গেলে আর কি এমনি সহজ মানুষ থাকবে? ফিরে যখন আসবে, কিম্ভূতকিমাকার হয়ে আসবে। আকৃতি হয়তো ভালই হবে, প্রকৃতি নির্ঘাত বদলে যাবে। মন্দের দিকেই যাবে। না, আইজাকের একেবারেই ইচ্ছা নয় যে তার কোন ছেলে শহরে যায়।

কিন্তু তবু যেতে দিতে হল। ইলিশিউসকে না পাঠিয়ে পারা গেল না। তার নিজের আগ্রহ, তার মায়ের জেদ—পাড়াপড়শীর পরামর্শ—সবে মিলে তাকে বাধ্য করল ইলিশিউসকে পাঠাতে।

বড় ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে ছোটকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরল আইজাক। সিভার্ট ঠিক তার বাপের মত হয়ে উঠেছে। তেমনি অসুরের মত শক্তি দেহে, লম্বা চওড়া পুরুষ। তেমনি প্রাণ দিয়ে খাটে খামারের জন্যে, তেমনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসে খামারের প্রতি ধূলিকণাকে। চাষের কাজে, মিস্ত্রীর কাজে, করাতকলে—সব জায়গায় সমান হাত চলে তার। সে ডান হাত হয়ে উঠেছে বাপের।

এদিকে পাহাড়ের মাথায় খনির কাজ খুব সমারোহের সঙ্গে চলেছে। অনেক লোক এসেছে বাইরে থেকে, পাহাড়ের ওপার থেকেই বেশী। সুইডেনের লোক তারা। পাহাড়ের মাথায় কুঁড়েঘরের বস্তি গড়ে উঠেছে তাদের জন্যে। সেখানেই থাকে তারা শনিবার বিকেলে নীচে নামে পকেটভরতি পয়সা নিয়ে। যা পাবে তাই কিনবে, যে ভাবে খুশী ওড়াবে। কোন দরদ নেই অর্থের ওপরে।

কিন্তু কথা এই—এখানে বনের ভেতরে তারা পয়সা ওড়াবে কেমন করে? কেনবার মত কী আছে এখানে?

আছে, আছে। ঝোপ বুঝে কোপ মারবার লোক আছে দুনিয়ায়। ঠিক এই রকম ভাবে অগাধ পয়সা এসে পড়বে এই নিভৃত অঞ্চলে, এটা আগে থাকতেই অনুমান করেছিল একজন লোক। অ্যারন বলে একটা লোক জায়গা নিয়েছে মেনল্যাণ্ডের ওপাশে। জায়গা নিয়েছে অনেক, কিন্তু চাষ করে নি। তার বদলে ভাল ঘরদোর বেঁধে দোকান ফেঁদেছে একখানা। দরকারী অদরকারী হেন জিনিস নেই দুনিয়ায়, যা পাওয়া যায় না এ-দোকানে। পাওয়া যায় সব কিছুই। বিক্রীও হয় সব কিছুই। পয়সা কুড়িয়ে তোলবার সময় পায় না অ্যারন। একজন কেরানী রেখেছে আবার খাতা লেখবার জন্যে, অ্যানড্রিসন নাম তার।

জায়গাটার নাম স্টরবর্গ। শনিবার দিন এখানে মেলা বসে যায় খনি মজুরদের। বস্তা ভরে জিনিস কিনছে প্রত্যেকে, কী করবে সে সব জিনিস দিয়ে তা জানে না।

কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল অ্যারনের মাথায়। খনি বন্ধ হল হঠাৎ। তামা আর উঠছে না। এঞ্জিনিয়ার বলছে—তামা এখনও আছে, কিন্তু ওদিক পানে সরে অর্থাৎ সুইডেনের এলাকায়। আইজাকের কাছ থেকে জিসলার এবং জিসলারের কাছ থেকে বর্তমান কোম্পানি যে-অংশটি কিনেছে পাহাড়ের, তার ভেতরে আর তামা নেই।

এখন পাহাড়ের দক্ষিণ অংশের খনি আবার যদি কিনে নিতে পারা যায়, তবেই খনি চলবে

আবার। নতুবা এইখানেই শেষ। খনির লোকজন চলে গেল, স্টরবর্গের দোকানে কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে গেল।

আৰ্বিন যেন পাগল হয়ে গেল একেবারে। সে এখন করে কী? দোকান-ভর্তি জিনিসপত্র, খরিদ্দার নেই। সে চেষ্টা করতে লাগল—দোকান এবং জমি সব বেচে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার।

ইলিশিউস ফিরে এল একদিন। সে এখন দস্তুরমত শহুরে বাবু। তার জামাকাপড় অন্য কায়দার, তার কথাবার্তা অন্য ধরনের। পরিশ্রমের কাজে সে একান্ত কাতর। আইজাক বলল—ওর দ্বারা চাষবাস হবে না আর। ওই দোকানখানা যদি ও বুঝে চালাতে পারে, আর এলনড্রিসনকে দিয়ে খামারটা হাসিল করতে পারে, তাহলে স্টরবর্গ আমি ওকে কিনে দিই। দোকানে যদি চাষী লোকের দরকারী জিনিসপত্র রাখা হয়, চলতে পারে। এখানে তো এখন দশটা খামার সেলাঁর আশেপাশে। এখানে জিনিস পেলে লোক গ্রামে যাবে কেন?

ইলিশিউস আপত্তি করল না।

আপত্তি করল না, কারণ দীর্ঘ দিন শহরে বাস করেও সে কোন স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা সেখানে করতে পারে নি। টেলিগ্রাফের যে-এঞ্জিনিয়ার ওকে গোড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন শহরে, তিনি ওকে বেশীদিন পুষতে পারেন নি। তাঁর নিজের ব্যবসায় মন্দা পড়ে আসতেই তিনি ওকে অন্য জায়গায় কাজ ঠিক করে দিয়েছিলেন। সে অতি সামান্য কাজ। বেতন খুব কম। অথচ ইলিশিউস অসম্ভব বিলাসী হয়ে উঠেছে শহরে এসে, এবং শহুরে যুবকদের সাথে মিশে। দিন দিন দেনা বেড়ে যায় তার, সে তখন গ্রামে পালিয়ে বাঁচে।

কাজেই স্টরবর্গ কিনে নিয়ে সেখানে খাঁটি হয়ে বসতে সে আপত্তি করল না। এখানেও তো দোকান আছে! দোকান সে চালাবে। ক্ষেতখামারের কাজ আন্ড্রেসন দেখবে সিভার্টের সাহায্যে।

তাই হল, স্টরবর্গ কিনে নিল আইজাক নগদ দেড় হাজার ক্রোনার দিয়ে। চার ক্রোনারে এক ড্যালার হয়। দেশে নতুন মুদ্রা চালু হয়েছে, এই ক্রোনার, এটাই এখন চলতি।

ইলিশিউস দোকান খুলে বসল। সত্যিই চারধারের দশটা খামার থেকে খরিদ্দার জুটতে লাগল তার। এমন কি, দূরবর্তী গ্রাম থেকেও লোক এসে কেনাকাটা করে ইলিশিউসের দোকানে। যদিও গ্রামে কোন জিনিসের অভাব নেই, এতকাল আইজাকই তো গ্রাম থেকে কিনে এনেছে প্রত্যেকটা দরকারী জিনিস।

কেন আসে তবে গ্রামের লোক? ধার পায় বলে। ইলিশিউসের স্বভাবটি উদার। কেউ ধার চাইলে তাকে ফেরাতে পারে না। জিনিসপত্র সাবাড় হয়ে যায় দোকানের, তহবিলে পয়সা জমে না একটিও। আবার জিনিস কেনা হয় আইজাকের কাছ থেকে টাকা এনে।

চলল এমনি অনেকদিন ধরে। ইলিশিউস ঘন ঘন শহরে যায় মালপত্র কেনবার জন্যে। সেখানকার বিলাসব্যসন ওকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানে। এখন আর শহরে দেনা নেই ওর! খুব খাতির বন্ধুমহলে। হবে না কেন? যখনই আসে ইলিশিউস, বন্ধুরা দুদিন স্ফূর্তির মুখ দেখে ওব দৌলতে।

প্রতিবার শহরে যাওয়ার সময়ই ইলিশিউস মায়ের কাছে অর্থ চেয়ে পাঠায়। মা দুশো একশো ক্রোনার—যতটা আদায় করতে পারে আইজাকের কাছ থেকে, পাঠিয়ে দেয় ইলিশিউসকে।

কিন্তু এবার অর্থের বদলে চিঠি এল শুধু। মা লিখেছে—আইজাকের কাছে নগদ অর্থ খুব সামান্যই আছে। খনি বিক্রি থেকে যে চার হাজার ড্যালার পাওয়া গিয়েছিল, তা প্রায় সবই খরচ হয়ে গিয়েছে এই কয়-বছরে—ওই ইলিশিউসেরই কল্যাণে। খামারের আয়? আয় হয় যথেষ্টই, কিন্তু তা আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যয় হয়ে যায় খামারেরই উন্নতির জন্য। নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে—গরুছাগলের ঘর পর্যন্ত এখন আগাগোড়া দামী কাঠের তৈরী। ঘাসের চাপড়ার ছাউনি আর সেলাঁরাতে নেই।



আইজাক এসে ইলিশিউসের সামনে দাঁড়াল। পৃঃ—২১৯

হ্যাঁ, খামারে নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে। নতুন নতুন কল বসছে, নতুন নতুন ক্ষেত হাঁসিল করে তাতে নতুন ফসল বোনা হচ্ছে। নগদ পয়সার আমদানি হবে আবার সেই আগামী বছরের ফসল উঠলে।

সুতরাং ইলিশিউসের জন্যে এবারে আর কোন অর্থই পাঠাতে পারছে না ইঙ্গার।

ইলিশিউস যেন পাগল হয়ে গেল। শূন্য পকেট নিয়ে শহরে সে যাবে কী করতে? সেখানে তো আর ধারে জিনিস পাবে না ও!

অথচ এখানে দোকানে একটিও মাল নেই। খরিদ্দারেরা এলে খালি হাতে ফিরবে। তাদের কাছে অনেক পাওনা আছে অবশ্য। কিন্তু তা কি আর এখন দেবে তারা?

জীবনের ওপর ঘৃণা এসে গেল ইলিশিউসের। সে রাত্রির অন্ধকারে সেলাঁরাতে চলে এল স্টরবর্গ থেকে। এল গোপনে সিভার্টের সঙ্গে দেখা করতে। সব খুলে বলল তাকে। তারপর বলল, "আমি আর এদেশে থাকব না। আমেরিকায় চলে যাব। পথ খরচার জন্যে কিছু অর্থ বাবার কাছ থেকে এনে দাও তুমি।"

সিভার্ট তাকে নিবৃত্ত করবার জন্যে অনেক ভাবে বোঝালো। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। "হয় আমেরিকায় যাওয়ার পাথেয় দাও, নয়ত আমি আত্মহত্যা করব।"

নিরুপায় হয়ে সিভার্ট বাবার কাছে গেল, এবং অনেকক্ষণ পরে তার কাছ থেকে ফিরে এল এক গাদা নোট হাতে করে। যা ছিল, সব দিয়ে দিয়েছে আইজাক, গুনেও দেখে নি।

বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে যায় ইলিশিউস আর সিভার্ট, তখন আইজাক এসে সামনে দাঁড়াল—ভাঙ্গা গলায় বলল—"অতদূরেই যেতে হচ্ছে তোমাকে? ভগবান ভাল করুন—"

ইলিশিউস কোনমতে বলল শুধু—"শীগগির ফিরব আমি—"

সে-কথা বোধ হয় কানে গেল না আইজাকের। সে চোখের জল গোপন করবার জন্যে পেছন ফিরে চলে গেল।

ইলিশিউস আর ফিরে আসে নি।

আইজাকের অন্ধের নড়ি—একা সিভার্ট।

কিন্তু সেলাঁরার খামার বেড়েই চলেছে। আইজাক এখন মারগ্রেভ, তালুকদার। তার খাতির সারা দেশটা জুড়ে। নিবিড় অরণ্য কেটে সেখানে সভ্য জনপদের সৃষ্টি করে যে সব সাহসী মেহনতী পুরুষ, তাদেরই একজন ওই আইজাক। জিসলার একদিন বলেছিল সিভার্টকে —"নরওয়ের এখন কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে দরকার, জানো? তোমার বাবার মত অন্ততঃ ত্রিশটা হাজার মানুষ।"


ন্যাট হ্যামসুন

লেখক পরিচিতি

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ন্যাট হ্যামসুনের জন্ম হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, নরওয়ে দেশের এক দুঃস্থ কৃষকের গৃহে। স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষালাভের সৌভাগ্য তাঁর কোনদিনই হয় নি, তবে সে-ক্ষতির যথাসম্ভব পূরণ তিনি করেছিলেন, প্রখর অনুসন্ধিৎসা ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দ্বারা। সমাজের প্রতি স্তরে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকৃতির মানবচরিত্র অধ্যয়ন করেছিলেন সহজাত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে।

প্রথম যৌবনেই তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন, অজানাকে জানবার দুরন্ত অভিযানে। প্রথম যাত্রা আমেরিকায় গিয়ে দীর্ঘদিন সেখানে থাকতে পারেন নি। কিন্তু নব মহাদেশের বিস্ময়কর বৈষয়িক সমৃদ্ধির গোপন রহস্য আবিষ্কারের একটা দুর্বার নেশা তাঁকে সেই স্বল্পদিনের প্রবাস জীবনেই পেয়ে বসেছিল। ফলে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার আমেরিকায় গিয়ে দীর্ঘ তিন বৎসর তিনি সেখানে বাস করেন। এই সময়ে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে তিনি না করেছিলেন, এমন কাজ নেই। শিকাগোতে গাড়ির কনডাক্টর, মিনিয়াপোলিসে ভাড়াটে বক্তা, উত্তর ডাকোটার গমের ক্ষেতে ফসল-কাটুয়া—নানা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি যখন স্বদেশে ফিরলেন, তখন যান্ত্রিক সভ্যতার ওপর বিদ্বেষ তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল। 'গ্রোথ অব দ্য সয়েল' উপন্যাসে সেই বিদ্বেষ ফুটে বেরিয়েছিল পরবর্তী কালে!

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল মার্কিন সমাজের সাংস্কৃতিক চরিত্রের অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা। পরের বৎসর তিনি লিখলেন 'হাঙ্গার', যার অভূতপূর্ব বাস্তববাদ সারা ইউরোপে নিয়ে এল জোরালো আন্দোলন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'প্যান' পেল সার্বজনীন অভিনন্দন, প্রথমে প্যারিতে, পরে সারা মহাদেশে। তারপর কয়েকখানা নাটক এবং কতকগুলি গীতিকবিতা দ্রুত বেরুতে লাগল তাঁর লেখনী থেকে, মনে মনে তখন তাঁর প্রস্তুতি চলছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম "গ্রোথ অব দা সয়েল"কে রূপদানের জন্যে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

এরপর থেকে একে একে প্রকাশিত হল—'ভ্যাগাবণ্ডস্', 'রোড লীডস্ অন', 'রিং ইজ ক্লোজড্' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে পড়ল, তাঁর স্বদেশ আক্রান্ত হল জার্মান নাৎসীদের দ্বারা! আশ্চর্য কথা, আততায়ীদের নিন্দা না করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তাদের এই নগ্ন আক্রমণের প্রতি সমর্থন জানালেন। এর দরুন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিচার হল এবং পঁচাশি হাজার ডলার জরিমানা দিতে হল তাঁকে। এই শোচনীয় ভুলের দরুন জনপ্রিয়তা হারিয়ে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে অনাদর এবং অশ্রদ্ধার ভেতর ইহলোক পরিত্যাগ করলেন এই প্রতিভাধর সাহিত্যিক।



বাডেন-ব্রুকস্

শহর মেঙ্গস্ট্রাস। জার্মান দেশের উঠতি ব্যবসা কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি। প্রায় গোটা শহরটাই বিশাল বিশাল মালগুদামে ভর্তি। অদূরেই সমুদ্র, বড় বড় জাহাজ ট্রেভামুণ্ড বন্দরে এসে ভিড় করে, মেঙ্গস্ট্রাসের গুদাম খালি করে হাজার হাজার টন রাই বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বণিকদের ভেতর জোহান বাডেন-ব্রুক স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁর বাবাই প্রথম রোস্টক থেকে এখানে এসে শস্যের ব্যবসা শুরু করেন ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেই ব্যবসাই ক্রমশঃ ধাপে ধাপে বেড়ে উঠেছে গত সত্তর বছর ধরে। আজ এই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, জার্মানির চিরশত্রু নেপোলিয়াঁর পতনের বিশ বছর পরে, আজ জোহান বাডেন-ব্রুক কম করেও সাত আট লক্ষ মার্কের মালিক।

নেপোলিয়াঁর কথাটা বাডেন-ব্রুক পরিবারের প্রাচীনেরা ভুলতে পারেন না। তাঁর সৈন্যেরা কম ক্ষতি করে নি বাডেন-ব্রুকদের। মেঙ্গস্ট্রীটের এই বাড়ি। এই বাড়িতেই তারা এসে হানা দিয়েছিল। জোহান তখন রাতে শয্যাগত, গৃহস্বামিনী এলিজাবেথ আঁতোয়ানেৎ বাডেন-ব্রুক—হ্যামবুর্গের শ্রেষ্ঠ অভিজাত ডুশাম্পদের মেয়ে সুন্দরী আঁতোয়ানেৎ মান ইজ্জত বাঁচাবার জন্য রাস্তায় ছুটে বেরিয়েছিলেন, নদীতে ঝাঁপ দেবার মতলবে। রাস্তায় তাঁকে ধরে ফেলেন কবি

হফস্টেড। তিনিই তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন অনেক আশ্বাস দিয়ে। তাঁরই প্রতিবাদ আর ভর্ৎসনায় লজ্জা পেয়ে ফরাসী সৈন্যেরা শেষ পর্যন্ত বাডেন-ব্রুক প্রাসাদ ত্যাগ করেছিল বটে, কিন্তু বাড়িতে রুপোর বাসন তারা একখানিও রেখে যায় নি।

সেই ঘটনা থেকে নেপোলিয়াঁকেও এঁরা ভুলতে পারেন নি, ভুলতে পারেন নি কবি হফস্টেড-কেও। কবি মানুষটি সেই থেকে বিষয়ী বাডেন-ব্রুকদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে রয়েছেন। যে কোন উৎসবেই হফস্টেডের নিমন্ত্রণ এ-বাড়িতে অবধারিত।

আজও একটা উৎসব উপলক্ষেই হফস্টেড উপস্থিত আছেন এখানে। উপস্থিত তিনি একা নন। শহরের গণ্যমান্যদের ভেতর অনেকেই এসেছেন আজ। জোহানেস বৈবাহিক ক্রেগেল এসেছেন তাঁর পুত্রদের নিয়ে, সিনেটর ল্যাঙ্গলেস, সিনেটর ওভারডিয়েক দুজনেই এসেছেন বার্ধক্য এবং ব্যাধিকে এতটুকু আমল না দিয়ে, পাদরী উন্ডারলিক, দালাল গ্রাজেন্স, সুরা-ব্যবসায়ী কোপেন—আসতে বাকী নেই কেউ।

এছাড়া বাডেন-ব্রুক পরিবারের ছেলে মেয়েরা তো আছেই। জোহানের পুত্র কন্সল বাডেন-ব্রুক, তাঁর পত্নী এলিজাবেথ, কন্যা টনি, দুই পুত্র টমাস ও ক্রিশ্চিয়ান—চাঁদের হাট চারদিকে। এমন কি, দূরসম্পর্কের একটি জ্ঞাতিকন্যা, ক্লোথাইল্ডি তার নাম—সেও আছে। টনির সমবয়সী সে, টনির সঙ্গে একত্রে মানুষ হচ্ছে এই বাড়িতে। এদের দুজনকে পড়ানোর ভার দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ অঞ্চলের এক তরুণীর ওপরে। তার নাম আইডা জুংমান। সে এদের পড়ায় তো বটেই, তা ছাড়াও ঘর-সংসারের কাজও দেখে।

গল্পে গুজবে হাসি ঠাট্টায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে অবশেষে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়রা জোড়ায় জোড়ায় খাওয়ার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। কন্সল বাডেন-ব্রুক তাঁর মাকে ইশারা করলেন—একটু অপেক্ষা করে যাওয়ার জন্য। মাদাম আঁতোয়ানেৎ ফিরে দাঁড়ালেন দু-চোখে জিজ্ঞাসুদৃষ্টি নিয়ে।

"গটহোল্ড আবার একটা চিঠি লিখেছে"—ফিসফিস করে বলেন কন্সল। এঁরও নাম জোহান। নাম ধরে কথা বললে পিতাপুত্রে তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে বলে সবাই পুত্রকে কন্সল বলে ডাকে, কারণ ইনি এই শহরে নেদারল্যান্ডস রাজ্যের বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পদ পেয়েছেন কিছুদিন আগে। এই প্রতিনিধিদের উপাধি হল কন্সল।

"আবার চিঠি?" কন্সলের মা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। তারপর বিরক্ত ভাবে বললেন—"কেন যে জোহান ওর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলছে না, তা বুঝি না বাপু। একটা কেলেংকারী হবে শেষকালে?"

কন্সল একটু চুপ করে থেকে বললেন—"মিটিয়ে ফেলতেই বল তুমি? মেটানো মানেই লক্ষ মার্ক দিয়ে দেওয়া। সেইটাই গটহোল্ডের দাবি।"

"দেওয়া কি তোমার মত নয়? সেও তো তোমার পিতারই পুত্র!" আঁতোয়ানেৎ ভাবলেশ-হীন দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকালেন।

কন্সলের মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে উঠল। একটুখানি চুপ করে থেকে তিনি বললেন—"মতের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে এক কথায় তা বলা যায় না। পারিবারিক হিসাবে গটহোল্ড আমার ভাই, তাকে এক লক্ষ মার্ক দেওয়া হবে, এতে আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু টাকাটা আসবে কোথা থেকে? আসবে বাডেন-ব্রুকদের কারবারের তহবিল থেকে। সেই কারবারের আমি একজন অংশীদার। অংশীদার হিসাবে ফার্মের স্বার্থ আমায় সর্বাগ্রে দেখতে হবে। গটহোল্ডের মত একটি লোক, যে ফার্মের জন্য এক মার্কের কাজও কখনও করে নি, সে এক কথায় এক লক্ষ মার্ক বার করে নিয়ে যাবে কারবার থেকে, এ ধারণাই অসহ্য আমার কাছে।"

কন্সলের যুক্তির কোন উত্তর তাঁর মা দিলেন না বা দিতে পারলেন না। তিনি কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন—"চল, এখন খাওয়ার ঘরে যাওয়া যাক, নিমন্ত্রিতেরা অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য।"

*　　　*　　　*

এইখানে গটহোল্ড-ঘটিত ব্যাপারটার পূর্ববৃত্তান্ত বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। জোহানের প্রথমা পত্নী এই ডুশাম্প-কন্যা আঁতোয়ানেৎ নন। প্রথম যৌবনে উনি জোসেফাইন নামে একটি সুন্দরী অভিজাত কুমারীকে বিবাহ করেন। জোহান সুখী হয়েছিলেন সে বিবাহে, কিন্তু অত সুখ তাঁর সইল না। মাত্র এক বছর বিবাহিত জীবনের পরেই জোসেফাইনের মৃত্যু হল। তিনি রেখে গেলেন একটি সদ্যোজাত শিশুপুত্র—সে ওই গটহোল্ড।

স্বাভাবিক নিয়মে এ-রকম অবস্থায় মাতৃহীন শিশুর ওপরে পিতার স্নেহ অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়েই যায়, কিন্তু বেচারী গটহোল্ডের ভাগ্যদোষে সে হয়ে পড়ল বিরাগের পাত্র। প্রিয়তমা পত্নী জোসেফাইনের মৃত্যুর জন্য জোহান যেন ওই অভাগা পুত্রকেই দায়ী করলেন। বেচারা কোন-দিন জানতে পারল না যে পিতৃস্নেহ কী বস্তু। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে পিতৃগৃহ থেকে নির্বাসিত হয়ে রইল, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে বাল্য ও কৈশোর কাটিয়ে প্রথম যৌবনেই সে বিবাহ করে বসল দরিদ্র বস্ত্র-ব্যবসায়ী স্টুরিংয়ের রূপসী কন্যাকে।

বলা বাহুল্য, জোসেফাইনের মৃত্যুতে অত্যধিক শোক পেয়ে থাকলেও দীর্ঘদিন বিপত্নীকের জীবন যাপন করা সম্ভব হয় নি জোহানের পক্ষে। তিনি তখন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী। সামাজিক ভাবে শহরের মাননীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করতে না পারলে, ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করা সহজ হয় না। আর সে-রকম মেলামেশা করতে হলে বিবাহ করা তো প্রথম প্রয়োজন! তিনি তাই শহরের শ্রেষ্ঠ ধনী ক্রোগারের কন্যা এলিজাবেথকে বিবাহ করলেন জোসেফাইনের মৃত্যুর

অল্পকাল পরেই। সেই এলিজাবেথের হল দুটি সন্তান, জ্যেষ্ঠ এই কন্সল, কনিষ্ঠা একটি কন্যা—তার বিবাহ হয়েছে দূরবর্তী কোন শহরে, পিতৃগৃহে সে কদাচিৎ আসে।

গটহোল্ড যখন অভিজাত সমাজের বাইরে এক দরিদ্র ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করে বসল—জোহান বাডেনব্রুক কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন, কারণ সামাজিক হিসাবে এতে বাডেনব্রুক পরিবারকে অনেকখানি খেলো হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু গটহোল্ড একগুঁয়ে লোক, পিতার নিষেধে সে কান দিল না।

বিবাহের পর জোহান তাকে পঞ্চাশ হাজার মার্ক এককালীন দান করে দিলেন, এবং বলে দিলেন অতঃপর গটহোল্ডের আর কোন প্রত্যাশা রইল না তাঁর কাছে। গটহোল্ড পঞ্চাশ হাজার মার্ক শ্বশুরের কাপড়ের ব্যবসায়ে ঢেলে সেই ব্যবসায়ের অংশীদার হয়ে বসল। তাইতেই গরিবানা ভাবে তার সংসার চলে।

ইদানীং তার মাথায় ঢুকেছে যে আইনতঃ না হক, ন্যায়তঃ সে পিতার কাছ থেকে আরও কিছু অর্থ পাওয়ার অধিকারী। গটহোল্ডের পিতামহ মেঙ্গস্ট্রাসে এসে যে বাড়িখানি তৈরি করেন, গটহোল্ডের পিতা সেটা বিক্রি করে মেঙ্গ স্ট্রীটে বৃহৎ প্রাসাদ ক্রয় করেছেন। এখন ওই বিক্রীত বাড়ির মূল্য যেটা পাওয়া গিয়েছে, তার একটা অংশ দেশপ্রথা অনুযায়ী গটহোল্ডের প্রাপ্য, কারণ ওই বাড়ি যে-বংশের সম্পত্তি ছিল, গটহোল্ডও সেই বংশেরই সন্তান।

সেই দাবিই করেছে গটহোল্ড। এক লক্ষ মার্ক চেয়েছে নিজের বখরা। এবং জোহান তা দিতে অস্বীকার করেছেন।

এলিজাবেথ কিন্তু স্বামীর এ-অস্বীকৃতির সমর্থন করেন না। তাঁর মনে একটা সংঘাত বেধেছে। বংশের প্রথম সন্তানকে বঞ্চিত করলে সেটা কি একটা অন্যায় হবে না? কী তার অপরাধ? বিবাহের ব্যাপারে পিতার নিষেধের ওপর সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে স্থান দিয়েছে। লোকচক্ষুতে বা ধর্মের অনুশাসনে এটা একটা মহা অপরাধ নয়।

এলিজাবেথ সমর্থন করেন নি স্বামীর অস্বীকৃতিকে। কিন্তু জোরের সঙ্গে প্রতিবাদও করেন নি স্বামীর ইচ্ছায়। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি কখনোই করেন না এরকম প্রতিবাদ।

*　　　*　　　*

এর কিছুদিন পরেই সংসারে ভাঙন করল। প্রথম গেলেন জোহানের স্ত্রী আঁতোয়ানেৎ, তারপর স্বয়ং জোহান। সামান্য অসুখেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন দুজনেই। পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে গটহোল্ড এলেন, কন্সলকে একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলেন যে পিতা শেষ মুহূর্তেও উইলে গটহোল্ডের জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন কি না।

না, তা করেন নি। জ্যেষ্ঠপুত্রকে নির্মমভবেই বঞ্চিত করে গিয়েছেন জোহান। খবর শুনে

টহোল্ড আর বাক্যব্যয় করলেন না। অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে যোগদান করলেন অন্য দশজন আত্মীয়ের তই, তারপর চলে গেলেন নিজের গৃহে।

কন্সল জোহান এখন বাডেন-ব্রুক ফার্মের একেশ্বর মালিক। তা ওপর তিনি নেদাবল্যান্ড াজ্যের কন্সল মেৎগাস্ট্রাস শহরে। কাজেই তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ। দুই পুত্র টম আর ক্রিশ্চয়ান এবং দুই কন্যা টনি ও ক্লারাকে নিজের পদমর্যাদার উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই তাঁর।

ক্লারার জন্ম হয়েছে বৃদ্ধ জোহান দেহরক্ষা করবার সামান্য আগে। শৈশব থেকেই সে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম ধীর গম্ভীর। যতই সে বড় হতে থাকে, একটি আশ্চর্য জিনিস প্রকট হতে াকে তার ভেতরে, সে হল তার ধর্মানুরাগ। বাডেন-ব্রুক পরিবারে ও-বস্তুটির খুব ছড়াছড়ি ছিল া কোনকালে। বৃদ্ধ জোহান তো ধর্মকর্মের ব্যাপারগুলোকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন চিরদিন। সক্ষেত্রে এই বালিকার ভেতর কী করে যে এমন একটা প্রবণতা দেখা দিল, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে, কেউই তা ভেবে পায় নি।

তার দিদি টনি ঠিক উলটো ধরনের মেয়েটি। ভয়ানক চঞ্চল, রীতিমত বেপরোয়া, স্ফূর্তি-াজ, হৃষ্টপুষ্ট দেহের অধিকারিণী। স্কুলে গিয়ে মারামারি করে, অন্যরকমের ছোটখাট কেলেঙ্কারিও াদ যায় না। কন্সল তাকে এই স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান। শেষ পর্যন্ত সে স্থায়ী হল সিসেমি উইকব্রকট্-এর বোর্ডিং স্কুলে। সেখানে তার সখী জুটলো কয়েকজন। কোপেনহেগেনের ইওরোপখ্যাত সুরশিল্পী আর্নল্ডসেনের কন্যা গার্ডা তাদের মধ্যে একজন।

মেয়ের দিক দিয়ে টনি যে রকম, ছেলের দিক দিয়ে ক্রিশিচয়ানও ঠিক সেইরকমই অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়াশুনায় তার মন নেই, অত্যন্ত তরলপ্রকৃতির ছেলে সে। থিয়েটারের ওপর তার প্রচন্ড আকর্ষণ। দশ বারো বছর বয়স থেকেই ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে থিয়েটারের সাজঘরে ঢুকে পড়বার ঝোঁক দেখা গিয়েছে তার ভেতরে।

শুধু তাই নয়, নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তার ধারণা বাম অঙ্গটা তার অস্বাভাবিক রকম দুর্বল। কে নাকি তাকে বলেছে—ওই দিকের সবগুলি স্নায়ুই তার খাটো। পরিণামে পক্ষাঘাত হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে তার।

মোটের ওপর দেহে মনে কোন দিক দিয়েই সে বাডেন-ব্রুক ফার্মের পরিচালকপদ গ্রহণের উপযোগী হবে না কোন দিন। অনেকখানি নৈরাশ্য অন্তরে নিয়ে কন্সল তাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ব্যবসা করবার ক্ষমতা যখন ওর নেই, তখন ও লেখাপড়া শিখুক। কর্মী হওয়ার দৃঢ়তা যখন নেই, তখন হোক বিদ্বান্।

তিন তিনটে সন্তানের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে কন্সল ফিরে তাকালেন টমের দিকে। হাঁ, এইখানে তিনি পেলেন সান্ত্বনা। টম ঠিক সেইরকম ছেলে—যার দ্বারায় বংশ উজ্জ্বল হয়। জোহান বাডেন-

ব্রুকের নাম রাখবার মত ছেলে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নিষ্ঠাবান্ কর্মী। দেহটিও মজবুত, কোন পরিশ্রমেই কাতর নয়। মার্জিত ব্যবহার, সামাজিক, সদালাপী, ঠিক যে রকমটি হওয়া উচিত ব্যবসায়ীর।

ওকে আর উচ্চশিক্ষার দিকে নিয়ে গেলেন না কন্সল। বছর পনেরো বয়স হইতেই স্কুল ছাড়িয়ে নিজের কারবারে ঢুকিয়ে নিলেন। এখানে ব্যবসার হাতে খড়ি নিক ও। তারপর বিদেশে গিয়ে পরিচিত কোন ফার্মে কাজ করবে কিছুদিন—দেশ-বিদেশের বাজারের হাল-চাল বোঝবার জন্য। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারপর মেঙ্গস্ট্রাসে এসে বসবে, বাডেন-ব্রুক ফার্মের অংশীদার হয়ে।

চার ভাইবোন বড় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

টনির বয়স তখন সবে পনেরো। হ্যামবুর্গ থেকে এল এক হের গ্রুনলিক। এ লোকটিও ব্যবসায়ী, লেনদেন আছে বাডেন-ব্রুকদের সঙ্গে। সেই সম্পর্কেই মেঙ্গস্ট্রাসে আসা। দু একদিন মেঙ্গস্ট্রীটের বাড়িতে আসা-যাওয়ার পরেই সে কন্সলের কাছে প্রস্তাব করে বসল—সে টনিকে বিবাহ করতে চায়।

কী মুশকিল! টনি ওদিকে লোকটাকে মোটেই পছন্দ করে না। ওর চেহারা, ওর কথাবার্তা, ওর চালচলন—কোনটাই পছন্দ নয় টনির।

কিন্তু টনির পছন্দকে বিশেষ কিছু মূল্য দিতে হবে বিবাহের ব্যাপারে, এমনধারা শিক্ষা কন্সল পান নি তাঁর পিতার কাছ থেকে। বৃদ্ধ জোহান জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন একমাত্র অপরাধে যে সে নিজের পছন্দমাফিক বিবাহ করেছিল—পিতার অমতে। কন্সল জোহান যতই ভালবাসুন মেয়েকে, বিবাহের ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দেবেন না কোনমতেই।

টনির অপছন্দের কথা ষোল-আনা জেনে শুনেও তিনি খোঁজখবর নিতে লাগলেন গ্রুনলিকের সম্বন্ধে। খোঁজখবরের ফল বেশ সন্তোষজনকই হল। লোকটি উঠতি ব্যবসায়ীই বটে। বাজারে, ব্যাঙ্কে সর্বত্রই ওর সুনাম। খাতাপত্র দেখে ওকে বেশ পয়সাওয়ালা লোক বলেই মনে হয়। পাত্র হিসাবে ও সুপাত্রই।

টনিকে মন স্থির করবার জন্য সমুদ্রতীরে পাঠিয়ে দেওয়া হল, ট্রেভামুণ্ড বন্দরে। সেখানে শোয়ার্জকফ পরিবারের বাড়িতে ও থাকে আর সমুদ্রের ধারে হেসে খেলে বেড়ায়। টনি একাই যে গিয়েছে ওখানে, তা নয়। মেঙ্গস্ট্রাসের অনেক লোকই সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার জন্য ওখানে যায় প্রতি বছর, এবারেও গিয়েছে। টনি কিন্তু তাদের সঙ্গে বেড়াতে ভালবাসে না। তার ভ্রমণের সঙ্গী হল তরুণ শোয়ার্জকফ, একুশ বছর বয়সের একটি সুন্দর ছেলে, যে ডাক্তারি পড়ে ফ্রাংকফুর্টে।

বলা বাহুল্য, গ্রুনলিকের প্রতি বিতৃষ্ণা এতে বেড়েই চলে টনির মনে। কিন্তু গ্রুনলিকও নাছোড়বান্দা। আর কন্সলও স্থিরসংকল্প।

শেষ পর্যন্ত কন্সলের উপদেশ এবং নির্দেশে একান্ত অনিচ্ছাতেই টনিকে রাজী হতে হল

গ্রুনলিকের সঙ্গে বিবাহে। অবশ্য এ-সম্মতির নৈতিক মূল্য কিছু নেই। কারণ পিতার অবাধ্য হয়ে গ্রুনলিককে প্রত্যাখ্যান করলে টনি হয়তো পিতৃব্য গটহোল্ডের মতই নির্বাসিত হত পিতার গৃহ এবং পিতার স্নেহ থেকে।

হ্যামবুর্গে চলে গেল টনি স্বামীর সঙ্গে। যাওয়ার সময় করুণ হাসি হেসে পিতাকে জিজ্ঞেস করল—"তুমি সুখী হয়েছ তো বাবা?" কন্সলের বুকের ভেতর সে-হাসি বিঁধল গিয়ে তীরের মত। তিনি তবু নিজের মনকে বোঝালেন—তিনি ঠিকই করেছেন। এ-বিবাহের পরিণাম ভালই হবে।

কিন্তু না, ভাল হল না। একটি মেয়ে হল টনির। নাম দেওয়া হল তার এরিকা। কন্সল সপরিবারে গিয়ে হ্যামবুর্গে মেয়ে জামাইয়ের অতিথি হয়ে কাটিয়ে এলেন কিছুদিন। তাঁর মনে হল টনি সুখেই আছে।

কিন্তু ভুল ভাঙল অচিরেই। হঠাৎ গ্রুনলিকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন কন্সল যে সে দেউলিয়া হতে বসেছে। সোয়া লক্ষ মার্ক সাহায্য বা ঋণ কন্সলের কাছ থেকে না পেলে সে পথে বসবে, টনি পথে বসবে, পথে বসবে এরিকাও।

আকাশ যেন মাথায় ভেঙে পড়ল কন্সলের। তিনি তক্ষুনি ছুটে গেলেন হ্যামবুর্গে। খাতাপত্র দেখলেন। এ সে খাতা নয়, যে খাতা বিবাহের আগে গ্রুনলিক তাঁকে দেখিয়েছিলেন। সেটা ছিল জাল, আসল খাতা এইটাই। গ্রুনলিকের ব্যবসার সত্যিকার পরিচয় এই খাতাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সে-পরিচয় ভয়াবহ। বিবাহের আগে থেকেই গ্রুনলিকের ব্যবসা দেউলিয়া হওয়ার পথে পা দিয়েছিল। আসন্ন সর্বনাশ ঠেকিয়ে রাখবার জন্য অনেক চেষ্টা করে গ্রুনলিক বাডেন-ব্রুকের মেয়েকে বিয়ে করে। তাতে যৌতুক পেলো আশি হাজার মার্ক, আর বাডেনব্রুকদের সুনাম খানিকটা তার ওপরেও প্রতিফলিত হয়ে বাণিজ্য জগতে তাকে একটা সাময়িক স্থিতি এনে দিল।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি তাতে। দুটি বৎসর কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল গ্রুনলিক। তারপর তাকে সর্বনাশের সঙ্গে মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হল। এখন তার একমাত্র ভরসা —শ্বশুর যদি কন্যার ওপর মমতার বশবর্তী হয়ে গ্রুনলিককে আবার রক্ষা করেন।

রক্ষা হয়তো কন্সল করতেন। কিন্তু হিসাবের খাতার পাতায় পাতায় যে অসাধুতার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, তা দেখে অন্তর তাঁর বিষিয়ে উঠেছে একেবারে। তিনি গ্রুনলিকের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন না। টনি আর এরিকাকে নিয়ে মেঙস্ট্রাসে ফিরে এলেন।

গ্রুনলিক দেউলিয়া হয়ে দেশত্যাগ করল, টনির বিবাহবিচ্ছেদ করালেন কন্সল, আদালতের সাহায্যে।

২

কন্সল রীতিমত আঘাত পেয়েছেন টনির ভাগ্যবিপর্যয়ে। নিজেকেই তিনি দায়ী বিবেচনা করছেন এ-ব্যাপারে। অবশ্য নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তিনি যা শুভ ও সংগত বিবেচনা করে-

ছিলেন, টনিকে বাধ্য করেছিলেন সেই পথে চলতেই। তার পরিণাম যে অশুভ হল, এটা একান্তই অন্যায় ও অপ্রত্যাশিত।

টনিকে যা কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হল এই বিবাহবিচ্ছেদের দরুন, কন্সল বিধিমতে তার ক্ষতিপূরণ করবার জন্য উদ্যোগী হলেন। টনির আসন এখন মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়িতে আরও দৃঢ়, আরও বেশী মর্যাদায় মণ্ডিত। তার কন্যার লালনপালন সুশিক্ষার ভার সব নিজেই নিয়েছেন কন্সল। সে নিজে যদি আবার বিবাহ করে, তবে সেই দ্বিতীয় বারের বিবাহেও সে পঞ্চাশ হাজার মার্ক যৌতুক পাবে, এমন ব্যবস্থাও তিনি করে রাখলেন।

টনির দিকেব এই নৈরাশ্য থেকে টমের দিকে যখন তিনি মুখ ফেরান, তখন কিন্তু আনন্দে ও গৌরবে বুকটা তাঁর ফুলে ওঠে। টম সর্বরকমে বংশধারাকে মর্যাদা দিয়ে চলেছে। প্রথম যৌবনে সেও একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। গরিবের সুন্দরী মেয়ে। ভালবাসার প্রতিদানও পেয়েছিল সেই মেয়েটির কাছ থেকে। কিন্তু টম স্বপ্নেও ভাবে নি যে ঐ দরিদ্রকন্যাকে সে বিবাহ করতে পারবে। কারণ এরূপ বিবাহ তার পিতামাতার অনুমোদন পাবে না কোনদিন, যেমন পায় নি গটহোল্ডের বিবাহ, যেমন পেতো না টনির সঙ্গে শোয়ার্জকফের বিবাহ, যদি সেটা ঘটতে পারত।

প্রেমের ওপরে বংশরীতিকে মর্যাদা দান করে টম পিতার প্রিয়তম হয়ে উঠল। আমস্টার্ডাম গিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের হাল-চাল খানিকটা শিখে আসার পরই সে অংশীদাররূপে গৃহীত হল পারিবারিক ব্যবসার ভেতর। পিতার অবর্তমানে সেই হবে এই বিরাট ব্যবসার একমাত্র মালিক।

আর ক্রিশ্চিয়ান? সে আরও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ড গিয়েছে। সেখানে রিচার্ডসন কোম্পানির অফিসে কিছু কাজও শিখছে। কিন্তু চপলমতি ক্রিশ্চিয়ানের মন নিত্যই নতুন, আরও নতুনের দিকে ধাবিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ভ্যালপারাইসো শহরে একটি চাকরি যোগাড় করে নিয়ে সে ইংলণ্ড থেকেই সোজা সেইখানে চলে গেল। যাওয়ার আগে বাপ-মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়াও দরকার বিবেচনা করল না।

ক্লারার মন সর্বদাই ধর্মের দিকে টানে। ধর্ম থেকে ধর্মযাজক হল মাত্র এক ধাপ। এক মিউনিকবাসী ধর্মযাজকের প্রতি আসক্ত হয়ে সে তাকেই বিবাহ করতে সংকল্প করল। নাম তার সার্ভিয়াস টাইবুর্টিয়াস। এবং যেহেতু ধর্মযাজকদের সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সঙ্গতি খুব কম নয়, সেই কারণেই কন্সল কোনই আপত্তি করলেন না এ-বিবাহে। ক্লারা চলে গেল স্বামীর সঙ্গে সেই সুদূর মিউনিকে।

শেষ জীবনে কন্সল নিজেও প্রোটেস্টান্ট ধর্মের খুব অনুরাগী হয়ে উঠলেন। বাড়িতে ধর্মীয় উৎসব একটিও বাদ যাওয়ার উপায় নেই। পরিবারের প্রত্যেকে তো বটেই, বাইরের আত্মীয়রাও নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন সে-সব উৎসবে আর যথাযোগ্য উপহার লাভ করেন।

হঠাৎ একদিন বিনা অসুখেই কন্সলের মৃত্যু হল। সন্ধ্যায় বাড়ির সবাই ভোজনকক্ষে

সমবেত হয়েছে, আসেন নি কেবল কন্সল। সবাই অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। মাদাম বাডেন-ব্রুক বলছেন—কন্সল চিঠিপত্র লিখতে ব্যস্ত। এমন সময় দাসী এল ছুটতে ছুটতে—খবর দিল—কন্সল চেয়ারে বসে আছেন। নড়তে পারছেন না। সকলে দৌড়ে গিয়ে দেখল—তাঁর দেহে আর প্রাণ নেই।

যথাযোগ্য আড়ম্বরে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে কন্সলের দেহ কবর দেওয়া হল। বর্ষব্যাপী শোক উদযাপন করল আত্মজনেরা। তারপর টমাস শক্ত হাতে ধারণ করল বাণিজ্য-তরণীর হাল। তরুণ বয়সেই সে পাকা ব্যবসায়ী হয়েছে। তার পরিকল্পনায়, তার অদম্য উৎসাহে, নতুন নতুন ক্ষেত্রে বাডেন-ব্রুক ফার্ম নিত্য নতুন সফলতা অর্জন করতে লাগল।

কন্সলের মৃত্যুর পর নেদারল্যান্ড রাজ্যের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিব পদ টমাসেরই পাওয়ার কথা। কিন্তু টমাস নিজে থেকেই প্রস্তাব করল—পদটি দেওয়া হক তার পিতৃব্য গটহোল্ডকে। এতে হয়তো পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ খানিকটাও তিনি ভুলতে পারবেন এই পরিণত বয়সে। সকলেই টমাসের এই সৌজন্যের প্রশংসা করল। বিশেষ করে অভিভূত হলেন নিজে গটহোল্ড। ভাইয়ের সংসারের ওপর ভদ্রলোক কোনদিন কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। এখন সত্যিকারের মনের মিল খানিকটা প্রতিষ্ঠিত হল—বাডেন-ব্রুক পরিবারের দুই শাখার ভেতরে।

এরপর টমকে যেতে হল আমস্টার্ডামে ব্যবসা কর্মেরই উপলক্ষে। সেখানে তার পরিচয় হল অদ্বিতীয় সুরশিল্পী আর্নল্ডসেনের সঙ্গে, যাঁর হাতের বাজনা আর কণ্ঠের সুর জাদুমন্ত্রের মতই অভিভূত করে থাকে সারা ইওরোপের মানুষকে।

শুধু আর্নল্ডসেনের সঙ্গেই নয়, তাঁর রূপসী কন্যা গার্ডার সঙ্গেও পরিচয়ের সৌভাগ্য হল টমের। প্রথম প্রণয় ব্যর্থ হওয়ার পর টম একরকম ঠিক করেই বসে ছিল যে জীবনে সে বিবাহ করবে না। বংশধারা লুপ্ত হবে, বাণিজ্যজগতের স্মরণীয় নাম বাডেন-ব্রুক অতীতের স্মৃতিতেই পর্যবসিত হবে—এ-আশঙ্কায় এক একবার তার অন্তর দুলে উঠত বটে, তার অর্থ-গঠিত সংকল্প ভিত্তিমূলেই শিথিল হয়ে আসত, তাও ঠিক বটে, কিন্তু বিবাহে তার রুচি ফিরে আসত না মোটেই।

কিন্তু এইবার! সংগীতপটীয়সী গার্ডার সুরঝংকার তাকে কোন্ অনাস্বাদিত আনন্দের আভাস দিল, তা কে জানে, কিন্তু ধীবে ধীরে সে যেন এক জাদুর জালে জড়িয়ে পড়তে লাগল। অবশেষে সে বিবাহের প্রস্তাব করল গার্ডার কাছে। গার্ডার বয়স সাতাশ পার হয়ে গিয়েছে, সেও এ-জীবনে বিবাহ করবে না বলেই মনস্থির করে বসে ছিল, কারণ বিবাহিত জীবনে সংগীত সাধনার বিঘ্ন ঘটবে—এইটিই ছিল তার প্রবল আশঙ্কা। অথচ জীবনে কিছু যদি তার প্রিয় থাকে, তবে তা হল সংগীত, জীবনের সব সেরা আনন্দের মুহূর্ত হল তার কাছে সেইটি, যে-সময় পিতার সঙ্গে মুখোমুখি বসে দ্বৈতসংগীতে সে হৃদয়ের আবেগ উজাড় করে দিতে পারে।

কিন্তু এইবার গার্ডার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল। সে রাজী হয়ে গেল বিবাহের প্রস্তাবে। প্রবীণ আর্নল্ডসেন সম্মতি দিলেন সাগ্রহে। কোন্ পিতা না দেখতে চায় যে তার প্রাপ্তবয়স্কা দুহিতা সুপাত্রে অর্পিতা হল? আর টম তো সব দিক দিয়ে সুপাত্রই! ধনে মানে বংশমর্যাদায় এই তরুণ বণিকরাজ তো দুনিয়ার কারও চাইতেই খাটো নয়!

টমের মায়ের কাছে চিঠি গেল। তিনি তো সম্মতি দেবেনই! টনিও খুব খুশী। একে ভাইয়ের বিয়ে, তার ওপরে বিয়ে আবার তারই বাল্যসখীর সঙ্গে। সিসেমি উইকব্রখ্ট-এর স্কুলে এই গার্ডার সঙ্গে কয়েক বছরই একসাথে পড়েছে টনি। বুড়ী সিসেমি এখনও বেঁচে আছে! সেও কী খুশীই না হবে!

সবাই খুশী, অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে যারা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সন্দেহে আশঙ্কায় মাথা দোলাবার লোকেরও একেবারে অভাব নেই। যথা গটহোল্ড মহাশয়ের অবিবাহিতা তিন কন্যা। তারা প্রথমে কানে কানে, তার পরে খোলাখুলি বলাবলি শুরু করল যে এ-রকম অসম বিবাহের ফল ভাল হতে পারে না কখনও। ধনী আর গরিবের বিবাহ সুখের হয় না, তা জানে সবাই। তেমনি সুখের হয় না, যদি পাত্র আর পাত্রীর বংশে সাংস্কৃতিক সংঘাত বাধবার মত গরমিল থাকে। আর্নল্ডসেনেরা হলেন বংশানুক্রমে গাইয়ে-বাজিয়ের বংশ। এদিকে বাডেন-ব্রুকরা জানে শুধু কেনা-বেচা লাভ-লোকসানের খতিয়ান। এদের মিলন কি তেল আর জলের মিশ্রণের মত একটা অত্যন্ত বাহ্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না?

যা-ই হোক, এই শ্রেণীর সংশয়বাদীদের কথা পাত্র বা পাত্রী কারও কানে পৌঁছলো না, অথবা পৌঁছে থাকলেও তারা তাতে কোন গুরুত্ব আরোপ করল না। বিবাহ হয়ে গেল, এবং বিবাহ-উপলক্ষে গাইয়ে বাজিয়ে আর্নল্ডসেন পুঁজিবাদী পাত্রপক্ষকে অবাক্ করে দিয়ে কন্যাকে এককালীন যৌতুক দিয়ে দিলেন একেবারে তিন লক্ষ মার্ক, বাডেন-বুকদের মত প্রথম শ্রেণীর ধনীদের পরিবারেও যেখানে পুত্রের বিবাহে এক লক্ষের বেশী যৌতুক কেউ প্রত্যাশা করে না।

কিন্তু সংশয়বাদীরা আবারও মাথা নাড়ল, এই বদান্যতা দেখে। এর নাম বদান্যতা নয়, এর নাম উড়নচণ্ডে স্বভাব, এর অর্থ হল—অর্থের মূল্য সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতনতার অভাব। তিন লক্ষ মার্ক যে কতগুলি মার্ক, তা হিসাব করে দেখলে কখনই আর্নল্ডসেনের মত লোক অতটা অর্থ এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন না।

সংশয়বাদীদের মনের ভাবটা কী তাহলে? ঠিক কী তারা আশা বা আশঙ্কা করছে? সে-জিনিসটা হল এই যে এ-বিবাহের ফল ভাল হবে না। হতে পারে না। এই দুই বিপরীতমুখী প্রকৃতির মিলনে একটা বিসদৃশ বস্তুর উৎপত্তি হবে।

যাক, একথা তারা স্পষ্ট করে বলবার সাহস রাখে না, বা প্রয়োজন বোধ করে না। বিবাহ

হয়ে গেল। এবং গার্ডাকে নিয়ে টম চলে এল মেঙ্গস্ট্রাসে। টনি ছুটে গিয়ে গার্ডাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। টমের মা সাদরে সংবর্ধনা করে নিলেন পুত্রবধূকে।

টম কিন্তু মেঙ্গ স্ট্রীটের প্রাসাদে ওঠে নি নববধূকে নিয়ে। সে যতদিন মধুচন্দ্রমা যাপন করছিল ইতালীতে, সেই সময়ের ভেতরই নবদম্পতির জন্য নতুন এবং আধুনিক এক মনোহর হর্ম্য তৈরী হয়ে গিয়েছে ব্রড স্ট্রীটে। টনিরই তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়েছে এই বাড়ি। সারা দুনিয়ার দুর্মূল্য উপকরণ দিয়ে গঠন করে, এই অভিনব প্রাসাদকে সজ্জিত করা হয়েছে সৌন্দর্যে ও সৌষ্ঠবে অতুলনীয় সব আসবাব দিয়ে। আয়তনে মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়ির মত অত বড় না হলেও, এ-ও একটা দেখবার মত বাড়ি।

মেঙ্গ স্ট্রীটের পুরনো বাড়িতে এখন রইলেন টমের মা, টনি এবং তাঁর মেয়ে এরিকা এবং ক্রিশ্চিয়ান। হ্যাঁ, আট বৎসর প্রবাস যাপনের পরে ক্রিশ্চিয়ান ভ্যালপারাইসো থেকে ফিরে এসেছে। টম তাকে পারিবারিক ব্যবসার ভেতর একটি দায়িত্বশীল পদই দিয়েছে। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানের নিষ্ঠা নেই, ঠিক সময়ে আফিসে আসা তার ধাতুতে নেই, তাকে নিয়ে টম সদাই বিব্রত।

আফিস এখনও মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়িতেই আছে। সম্পূর্ণ একতলাটিই জুড়ে রয়েছে কেরানীরা তাদের বিভিন্ন দপ্তর সাজিয়ে। দোতলা তেতলায় বাডেন-ব্রুক পরিবারের বাসস্থান।

ইতিমধ্যে মিউনিকে বেড়াতে গিয়ে টনি পরিচিত হয়ে এসেছে একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সাথে, নাম তার হের পার্মেনেডার। ব্যবসাবাণিজ্যই করে বটে লোকটি, তবে একান্ত স্বাধীনভাবে নয়, কোন এক অনাত্মীয় বণিকের সামান্য অংশীদাররূপে। সেই ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারেই মেঙ্গস্ট্রাসে এসে সে আতিথ্যগ্রহণ করল মাদাম বাডেন-ব্রুকের বাড়িতে। সুবাদ—টনির সঙ্গে সেই অল্পদিনের পরিচয়।

কিন্তু অল্পদিনের পরিচয়ই ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠল এবং বিদায়ের আগেই পার্মেনেডার বিবাহের প্রস্তাব করল টনির কাছে। টনিও বৈধব্য জীবনযাপন করে করে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, সে পার্মেনেডারের প্রস্তাব এক কথাতেই গ্রহণ করে বসল।

টম একটু খোঁজ খবর নিল বটে পার্মেনেডারের বৈষয়িক অবস্থা সম্বন্ধে, কিন্তু সে কেবল নিতে হয় বলেই নেওয়া। বিবাহ হয়ে গেল এবং পরলোকগত কন্সল, টনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে, তার জন্য যে পঞ্চাশ হাজার মার্ক যৌতুকের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, তাও টম সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিল পার্মেনেডারের হাতে।

মিউনিকে গিয়েই পার্মেনেডার কিন্তু এক কাণ্ড করে বসল। কোথায় টনি আশা করে বসে আছে যে যৌতুকের টাকা ব্যবসায়ে ঢেলে পার্মেনেডার ওর ভেতর নিজের অংশীদারিটা আরও জোরালো করে তুলবে, তা নয়, লোকটা সরাসরি অংশীদারি ছেড়ে দিয়ে নিজের সামান্য মূলধন

তুলে নিয়ে এল আফিস থেকে। কেন?—না, "ব্যবসা আমার ভাল লাগে না। এখন আমি বিশ্রাম করব। খাওয়া-পরার দুর্ভাবনা তো আর নেই।"

এই নিয়েই টনির সঙ্গে পার্মেনেডারের মতান্তর শুরু হল, এবং সে মতান্তর ক্রমে গিয়ে দাঁড়াল মনান্তরে। ব্যাপারটা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল, যখন টনির একটি মেয়ে হল এবং হয়েই মারা গেল। গৃহধর্মে যেটুকু আসক্তি ছিল পার্মেনেডারের, তাও যেন এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিলুপ্ত হয়ে গেল, সে বেশির ভাগ সময় কাটাতে লাগল ক্লাবে ও অন্যান্য আপত্তিকর স্থানে। তবে চরিত্র-হীনতার পরিচয় পেয়েই টনি তীক্ষ্নস্বরে তার প্রতিবাদ করল, এবং পার্মেনেডার তার জবাব দিল অকথ্য ভাষায়। ফলে এরিকাকে নিয়ে টনি হঠাৎ ফিরে এল মেঙ্গস্ট্রাসে। টম তাকে অনেক বোঝালো পার্মেনেডারের কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু কোন কথাই টনি কানে তুলল না। অগত্যা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা রুজু হয়ে গেল আবারও। আশ্চর্য এই যে পার্মেনেডার একটুও আপত্তি করল না বিবাহ-বিচ্ছেদ, এমন কি দ্বিরুক্তিমাত্র না করে টনির যৌতুকের সম্পূর্ণ অর্থটাই সে ফেরত পাঠিয়ে দিল টমের কাছে। লোকটার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল বটে, কিন্তু অর্থপিশাচ বা অসাধু সে ছিল না গ্রুনলিকের মত।

ইতিমধ্যে টম আবার একটা নতুন বাড়ি তৈরি করেছে ফিশার লেনে। এ একটা রাজপ্রাসাদ বললেই হয়। ব্রড স্ট্রীটের বাড়ি বিক্রি করে সে এখানে উঠে এসেছে। মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়ি থেকে কারবারের অফিস তুলে আনা হল এই বাড়িতে। মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়ির একতলাটা ভাড়া দেওয়া হল ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে।

গটহোল্ড মারা গিয়েছেন, বংশানুক্রমিক কন্সল উপাধি আবার ফিরে এল টমের কাছে। সে এখন কন্সল টমাস বাডেন-ব্রুক। কিন্তু সামাজিক সম্মানে এর চাইতেও এক ধাপ উঁচুতে সে উঠে গেল অচিরে। শহরের প্রশাসক মণ্ডলীতে অর্থাৎ সিনেটে একটি সভ্যপদ খালি হয়েছিল, এসব পদের অধিকারীরা সিনেটর নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। পদগুলি পূরণ করা হয় নির্বাচনের ভিত্তিতে। প্রধানতঃ টনির পীড়নেই টম নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল।

প্রতিযোগিতা চলেছিল খুব প্রবলভাবে। কিন্তু বাডেন-ব্রুকদের তখন তুঙ্গী দশা। নির্বাচনে টমই জিতল। সে এখন সিনেটর বাডেন-ব্রুক।

৩

মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়ির বিস্তীর্ণ একতলাটা জুড়ে ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানির আফিস। আফিসের ডিরেক্টর হিউগো উইনসেঙ্ক এখানকার লোক নয়, বাড়ি তাঁর সাইলেশিয়া প্রদেশে।

একই বাড়িতে অবস্থান, এরিকার সঙ্গে হিউগোর প্রায়ই দেখা হয় সিঁড়ির মুখে বা সদর দরজায়। অবশেষে একদিন ওপরে উঠে গিয়ে গৃহস্বামিনীর সঙ্গে দেখা করে এলেন উইনসেঙ্ক। গৃহস্বামিনী মাদাম বাডেন-ব্রুক ও তাঁর কন্যা মাদাম গ্রুনলিকের সঙ্গে।

কথাবার্তা তেমন মার্জিত নয় ভদ্রলোকটির। সভ্যসমাজে মেলামেশার বিশেষ সুযোগ পান নি, বেশ বোঝা যায় সেটা। তবু লোকটির আনাগোনায় কোন বিরক্তি প্রকাশ করেন না মহিলারা। কারণ ডিরেক্টরটি স্পষ্টই অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন এরিকার প্রতি। এরিকার বয়স কুড়ি হল। বিবাহ তো দিতেই হবে!

পাত্রও এমন কিছু মন্দ নয় উইনসেঙ্ক। বয়স এরিকার অনুপাতে অবশ্য বেশ কিছু বেশী। এরিকার কুড়ি, এর চল্লিশ বা তারও দু এক বছর ওপরে। কিন্তু বয়স যা-ই হক, স্বাস্থ্য এর ভাল, বেশ গাঁট্টা মজবুত চেহারা। তাছাড়া আসল বস্তুর দিক দিয়ে এ মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়। উপার্জন! মোটা উপার্জন লোকটার! মাস গেলে হাজার মার্ক মাইনে! সোজা কথা নয়। এর চেয়ে ভাল অবস্থার পাত্র এরিকা কি করে আশা করতে পারে? তার নিজের যৌতুক তো কিছুই নেই! টনির দ্বিতীয়বার বিবাহের যৌতুক সেই যে পঞ্চাশ হাজার মার্ক, যেটা পার্মেনেডারের ভদ্রতার দরুন ফেরত পাওয়া গিয়েছিল, সেইটি সম্পূর্ণ যদি এরিকাকে ধরে দেওয়া হয়, তাহলেও তো প্রথম শ্রেণীর ধনী পরিবারে তা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না।

তার ওপর আর এক কথা। প্রথম শ্রেণীর ধনী বলতে ব্যবসায়ী লোকই বোঝায়। তা, কার ব্যবসার ভেতরে কী আছে, বাইরে থেকে মোটেই বোঝা যায় না। বোঝা যায় নি গ্রুনলিকের ব্যাপারে, বোঝা যায় নি পার্মেনেডারের বেলাতেও। নড়বড়ে ব্যবসাকেও জাল খাতার সাহায্যে উন্নতিশীল বলে অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়।

না, ওসব ঝুঁকির ব্যাপারে যাওয়ার দরকার নেই। উইনসেঙ্ক ব্যবসা করে না। তার যে কী আয়, তা দেশের লোক সবাই জানে। আফিসের মাইনে! সুনির্দিষ্ট জিনিস, ওতো আর বাড়িয়ে দেখানো যায় না।

এরিকা? তার পছন্দ-অপছন্দের কথা কে জিজ্ঞাসা করছে? ভাবে ভঙ্গীতে মনে হয়— অপছন্দের দিকেই মেয়েটার ঝোঁক বুঝি। কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে তো চলে না। টনি দুই দুবার বিয়ে করেছিল, প্রথমবার ঘোর অনিচ্ছাতে দ্বিতীয়বার নিরুপায় হয়ে। ফল? ফল ভাল হয় নি অবশ্য। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? চিরদিন আইবুড়ো থাকার চেয়ে বিয়ের পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনেক ভাল।

অতএব উইনসেঙ্ক-এর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল এরিকার। নবদম্পতি গিয়ে নতুন একটা ভাড়া-

বাড়িতে উঠল। এরিকা নেহাতই বালিকা, তার ঘরসংসার গুছিয়ে দেওয়ার জন্য টনিকেও গিয়ে থাকতে হল এরিকার বাড়িতে। মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়িতে রইলেন শুধুই মাদাম বাডেনব্রুক, অর্থাৎ টমের মা এবং ক্রিশ্চিয়ান।

ক্রিশ্চিয়ান মাঝে হ্যামবুর্গের একটা ছোট কারবারের অংশীদার হয়েছিল। ব্যবসা তো ফেল হয়েছেই, পরন্তু প্রবাসের দিনগুলিতে সে এমন-সব কুসঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, ভদ্র-সমাজেই যারা অচল। এদের মধ্যে অভিনেত্রী এলিনের নামই প্রথমে করতে হয়।

নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এখনও আগের মতই আজগুবি সব ধারণা ক্রিশ্চিয়ানের—যথা তার বাম অঙ্গের স্নায়ুগুলো সব খাটো, পক্ষাঘাত তার অনিবার্য পরিণাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। সময়ে সময়ে এমনভাবে সে কথা বলে যে শ্রোতারা ভাবে ও শীগগিরই বদ্ধ পাগল হয়ে যাবে।

এমন সময়ে একটি বহু-আকাঙ্ক্ষিত শুভ ঘটনা ঘটল বাডেন-ব্রুকদের সংসারে। বংশধারা অব্যাহত থাকবার একটা উপায় হল। একটি পুত্র হল গার্ডার। মহা উৎসব হল ফিশার লেনের বাড়িতে। স্বর্ণমাণিক্যে সিল্কে সাটিনে ভূষিত শিশুকে দেখে আনন্দ করল সবাই। কিন্তু অন্তরঙ্গেরা ঠিক তৃপ্ত হতে পারল না এ-দেখায়। শিশুটির স্বাস্থ্য যেন আশানুরূপ নয়।

বংশের কৃতী পুরুষদের যে-নাম ছিল, সেই জোহান নামই ওকে দেওয়া হল। সংক্ষেপ করে সবাই ওকে ডাকে হ্যানো বলে।

এদিকে সঙ্গে সঙ্গেই দুঃসংবাদ—মিউনিকে ক্লারার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে মায়ের নামে এক চিঠি লিখেছিল, সেই চিঠি নিয়ে জামাই টাইবুরিয়াস এসে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করল। কয়েকদিন মেঙ্গ স্ট্রীটে কাটিয়ে সে যখন ফিরে গেল, তখন একদিন মাদাম বাডেন-ব্রুক ডেকে পাঠালেন টমকে।

ডেকে এনে টমকে যে-খবরটি শোনালেন তিনি, তা শুনে টম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি টমকে না জানিয়েই তার মা সর্বনাশা কাজ করে বসেছেন। নিঃসন্তান ক্লারার উত্তরাধিকার বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা আইন-অনুসারে, কিন্তু ক্লারা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মায়ের কাছে কাতর মিনতি জানিয়ে গিয়েছে—সম্পূর্ণ অর্থটাই যেন তার স্বামীকে দিয়ে দেওয়া হয়।

বলা বাহুল্য ধূর্ত টাইবুরিয়াসই স্ত্রীর ওপর চাপ দিয়ে এই পত্রখানি লিখিয়ে নিয়েছে তাকে দিয়ে। পাদরী হলেই যে নির্লোভ হবে এমন কি কথা?

ক্লারার উত্তরাধিকার মানে অল্প-স্বল্প কথা নয়, প্রায় সোয়া লক্ষ মার্ক। এটা ন্যায়তঃ আইনতঃ বাডেন-ব্রুক পরিবারে ফিরে আসার কথা। কিন্তু মুমূর্ষু মেয়ের অন্তিম শয্যার কাতরোক্তিতে বৃদ্ধা জননী এমনই অভিভূতা হয়ে পড়েছিলেন যে জামাতাকে স্পষ্টভাষায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে উত্তরাধিকারটা কন্যার অবর্তমানে জামাতাকেই দেওয়া হবে।

এখন টম কী করবে? তাকে একটিমাত্র কথাও জিজ্ঞাসা না করে তার মা এমন একটা সাংঘাতিক কাজ করে বসবেন, এ তো সে ভাবতেও পারে নি! বাডেন-ব্রুক ফার্মের পক্ষে এ একটা মারাত্মক ক্ষতি। মায়ের কথার মর্যাদা দিতে হলে মুখ বুজে এ-ক্ষতি সহ্য করতেই হবে টমকে। আদালতে গিয়ে দাঁড়ালে অবশ্য টমেরই জিত হয়, কারণ উত্তরাধিকার-আইন লঙ্ঘন করে ট্রাইবু্যরিয়াসকে ওই সোয়া লক্ষ মার্ক খয়রাত করবার কোন অধিকারই নেই মাদাম বাডেন-ব্রুকের। কিন্তু তাই কি টম পারে? অর্থটাকে বাঁচাতে গিয়ে মাকে খাড়া করতে পারে আদালতের কাঠগড়ায়?

না, টম তা পারে না। মুখ বুজেই ক্ষতি সহ্য করতে হল টমকে।

আরও ক্ষতি তার ভাগ্যে ছিল। টনির এক বান্ধবীর স্বামী মফস্বলের জমিদার, নাম তার কাউণ্ট মাইবুম। হঠাৎ তার পঁয়ত্রিশ হাজার মার্কের দরকার হল। কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝেই তার এ-রকম আকস্মিক দরকার হচ্ছে, পড়তা খারাপ পড়েছে তার। বাজারে এত ঋণ যে নতুন ঋণ আর মেলে না। সে ধরে পড়ল টনিকে। এই অনুরোধ যে "তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মার্ক পাইয়ে দাও।" বান্ধবীর খাতিরে টনিকে আসতে হল টমের কাছে এই প্রসঙ্গ নিয়ে।

টম প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা—কারণ বাডেন-ব্রুকদের কাজ হল ব্যবসাবাণিজ্য করা, টাকা ধার দেওয়া নয়। তাও যদি দিতেই হয় ভগ্নীর বিশেষ অনুরোধে পড়ে—একটা উপযুক্ত জামিন তো চাই! অত অর্থ বিনা জামিনে ধার দেওয়া তো একেবারেই অসম্ভব।

টনি উৎফুল্ল হয়ে বলল—"জামিন কেন? সে তার ফসল বেচে দিচ্ছে। ওর সমস্ত খামার জমিতে ফসল যা হচ্ছে এবার, দুমাস পরে তা কেটে তুললে তোমার অর্থ ডবল হয়ে ফিরে আসবে। বলতে গেলে পঁয়ত্রিশ হাজার ধার দিয়ে তুমি দুই মাসের দরুন সুদ পাচ্ছ আরও পঁয়ত্রিশ হাজার।"

অগত্যা, টম গিয়ে দেখে এল মাইবুমের খামার। সত্যই ফসল খুব ভাল হয়েছে, পঁয়ত্রিশ হাজারে এ-ফসল কিনে নিলে খুবই লাভের কারবার হবে একটা। দলিল হয়ে গেল, মাইবুমকে

পঁয়ত্রিশ হাজার মার্ক দিয়ে দিল টম। ফসল পাকলে সে কেটে নিয়ে আসবে, তুলবে মেঙ্গাস্ট্রাসের গুদামে।

কিন্তু কী অদৃষ্ট! ফসল পেকে ওঠবার কিছুদিন আগেই একান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে হয়ে গেল একটা শিলাবৃষ্টি। আর তার পরের দিনই একটা টেলিগ্রাম এল টমের কাছে—মাইবুমের বিস্তীর্ণ খামারের সমস্ত ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই শিলাবৃষ্টিতে। ডুবল পঁয়ত্রিশ হাজার মার্ক।

এর পরই আর এক বিপর্যয়। এবার আর্থিক ক্ষতি তেমন নয়, ব্যাপারটা বাডেন-ব্রুকদের আভিজাত্য গর্বে দিল প্রচণ্ড আঘাত। টনির জামাই সেই উইনশেঙ্ক এক ফৌজদারি মামলায় পড়ে গেল। কোম্পানির তহবিল নিয়ে সে কী-সব হিসাবের কারচুপি করেছে। বিচারে সাড়ে তিন বৎসর কারাদণ্ড হল তার।

টনি তার মেয়েকে নিয়ে আবার ফিরে এল তার মায়ের কাছে, মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়িতে। আর তার পরেই মাদাম বাডেন-ব্রুক আক্রান্ত হলেন নিউমোনিয়ায়। টমের শত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বর্ষীয়সী মহিলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়ি আর রেখে কী হবে? সাতাশি হাজার মার্ক মূল্যে ওটা বিক্রি করা হল। অর্থটা চার ভাগ হল। টম, টনি ক্রিশ্চিয়ান প্রত্যেকে এক এক ভাগ পেলো। আর শুনতে আশ্চর্য লাগে—বাকী ভাগটা পেলো মির্উনিকবাসী যাজক টাইবুর্যারিয়াস।

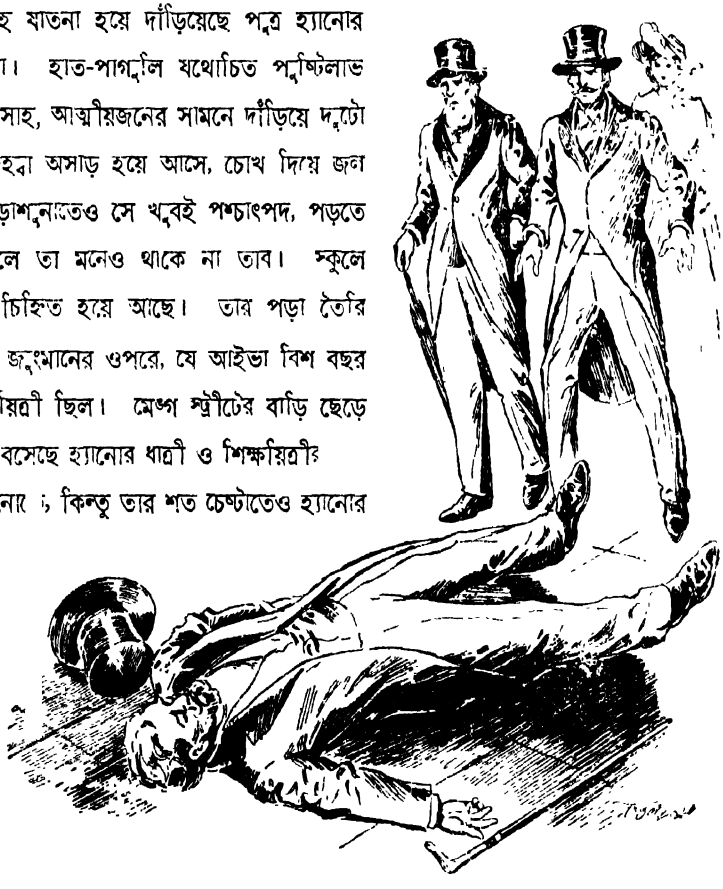
টনি শহরের উপকণ্ঠে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে এরিকার সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগল। তার জামাই উইনশেঙ্ক, আত্মীয়দের তদ্বিরে সরকারের তরফ থেকে মার্জনা লাভ করে, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুক্তিলাভ করে এল এই সময়, কিন্তু লোকলজ্জায় সে আর মেঙ্গাস্ট্রাসে রইল না, চলে গেল বিদেশে নতুন করে জীবন গড়ে তোলবার জন্য। কিছুদিন সে চিঠিপত্র লিখল এরিকার কাছে, তারপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একেবারে।

আর ক্রিশ্চিয়ান? সে নগদ অর্থ হাতে পেয়ে হ্যামবুর্গে চলে গেল, এবং অভিনেত্রী এলিনকে বিবাহ করে বসল।

নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্রিশ্চিয়ানের চিরদিনই একটু পাগলামি ছিল। তার মা-ভাই-বোন

সেটাকে চিরদিন উপেক্ষা করে এসেছে। কিন্তু চরিত্রহীন এলিন সহ্য করবে কেন? পাগল বলে সে ক্রিশ্চিয়ানকে ভরতি করে দিল এক পাগলা গারদে।

টমের সবচেয়ে দুর্বিষহ যাতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুত্র হ্যানোর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা। হাত-পাগুলি যথোচিত পুষ্টিলাভ করে না, খেলাধুলায় নেই উৎসাহ, আত্মীয়জনের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা কইতে গেলেও তার জিহ্বা অসাড় হয়ে আসে, চোখ দিয়ে জল পড়ে একান্ত অকারণেই। পড়াশুনাতেও সে খুবই পশ্চাৎপদ, পড়তে তার ভালও লাগে না, পড়লে তা মনেও থাকে না তাব। স্কুলে অমনোযোগী ছাত্র বলে সে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার পড়া তৈরি করিয়ে দেওয়ার ভার আইভা জুংমানের ওপরে, যে আইভা বিশ বছর আগে হ্যানোর বাবারও শিক্ষয়িত্রী ছিল। মেঙ্গ স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে এখন সে ফিশার লেনে এসে বসেছে হ্যানোর ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর প্রাণের মত সে ভালবাসে হ্যানো ; কিন্তু তার শত চেষ্টাতেও হ্যানোর মানসিক শক্তির বিকাশ হয় না।



টম মাথা ঘুরে পড়ে গেল [পৃঃ ২৩৮

অথচ অন্য একদিকে শৈশব থেকেই সে প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। সে-দিকটা হল সংগীতের দিক। গান-বাজনা তার ভাল লাগে, কেউ না শিখিয়ে দিলেও রাগ-রাগিণীর খেলা অনায়াসেই সে আয়ত্ত করে নেয়। গির্জার বাদক হের ফুওল তার কৃতিত্ব দেখে রীতিমত চমৎকৃত।

টম এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছে—গার্ডার সঙ্গে তার পরিণয় একটা ভুল পদক্ষেপ হয়েছিল।

তারই ফলে ব্যবসায়ী বাডেন-ব্রুক পরিবারে স্বপ্নলোকচারী সংগীতশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে। বাডেন-ব্রুকের দেহের ভেতর যে আত্মার অধিষ্ঠান হয়েছে তা সুরস্রষ্টা আর্নল্ডসেনের। এর পরিণাম কী হবে? একশো বছরের পুরোনো ব্যবসাটা ধ্বংস হয়ে যাবে না কি?

হ্যানোর চরিত্রটা বদলে দেওয়ার জন্য যত রকমে সম্ভব, চেষ্টা করল টম। দেহচর্চার জন্য তাকে ব্যায়ামাগারে ভরতি করে দিল, মাঝে মাঝে ট্রেভামুণ্ডের সমুদ্রসৈকতে দীর্ঘদিনের জন্য তার ছুটি যাপনের ব্যবস্থা করে দিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মাথায় সে অনেকটা লম্বা হয়ে উঠল বটে, কিন্তু দেহ চিরদিনই অপুষ্ট রয়ে গেল এবং মনও রয়ে গেল অপরিণত। একে দিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য চালানো যে একদিনের জন্যও সম্ভব হবে না, তা ক্রমেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগল টম।

টমের বয়স হয়েছে। শরীরও সুস্থ নেই। স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রধান কারণ অবশ্য ভবিষ্যতের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা। হঠাৎ তার মৃত্যু হলে বাডেন-ব্রুকদের ইওরোপ-জোড়া বাণিজ্যের হাল ধরবে কে? অনেক ভেবে টম একদিন তার উইল করে ফেলল।

এর পরেই ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দাঁত টমের ছেলেবেলা থেকেই খারাপ। একটা দাঁত অসহ্য যাতনা দিতে শুরু করল এখন। এইদিন সেনেটের অধিবেশন চলার কালেই পাগলের মত টম বেরিয়ে পড়ল কষ্ট সহ্য করতে না পেরে। সোজা চলে গেল দাঁতের ডাক্তার ব্রেকটের দোকানে। ব্রেক্‌ট্ দেখে বলল—দাঁতটা তুলতে হবে।

এরই নাম দুর্ভাগ্য! তুলতে গিয়ে দাঁতটা মাঝামাঝি ভেঙে গেল। যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল, রক্ত পড়তে লাগল অবিরল ধারায়। ব্রেক্‌ট অপ্রতিভ হয়ে কোনমতে রক্তটা বন্ধ করে দিল, তারপর বলল—"দাঁতের গোড়াটা না তুলে ফেললে তো হবে না। তবে আজ আর সে কষ্ট আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আজ বাড়ি যান। কাল তখন তুলব।"

বাড়ি যাওয়ার পথে টম মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেল। আবার রক্ত ঝরতে লাগল, গলগল করে। যে জায়গাটাতে সে পড়েছিল, সে একটা নির্জন মোড়। পথচারীদের চোখে যখন টমের অচেতন দেহটা পড়ল, তখন অবিরাম রক্তক্ষরণে তার জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে।

বাড়িতে যখন তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল অবশেষে সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ল ফিশার লেনে। দুদিন অজ্ঞান থাকার পরে মৃত্যু হল সেনেটর টমাস বাডেন-ব্রুকের।

● টমাস মান

উইল খুলে দেখা গেল—টম নির্দেশ দিয়ে গিয়েছে বাডেন-ব্রুক ফার্ম তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলবে।

ব্যবসা বন্ধ করে বাড়ি বিক্রি করে গার্ডা একটা ছোট বাড়িতে গিয়ে উঠল এই শহরেই। এইখানেই হ্যানোর মৃত্যু হল টাইফয়েডে।

তারপর গার্ডা আর মেঙ্গস্ট্রাসে রইল না। বাডেন-ব্রুকদের অগাধ অর্থ সঙ্গে নিয়ে বাপের কাছে চলে গেল আমস্টার্ডামে, নিরিবিলিতে সংগীত সাধনা করবার জন্য। অতীত গৌরবের স্মৃতি বক্ষে নিয়ে মেঙ্গস্ট্রাসে একমাত্র বাডেন-ব্রুক যে পড়ে রইল, সে টমের বোন টনি।

লেখক পরিচিতি



টমাস ম্যান

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির লুবেক নগরে জন্ম হয় নবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক টমাস মানের। বাল্যে ও কৈশোরে স্কুলে ও কলেজে যথাযোগ্য সুশিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু অর্থকরী বৃত্তির দিকে তাঁকে আকৃষ্ট করবার পারিবারিক প্রচেষ্টা সবই একে একে ব্যর্থ হয়ে গেল। সব ছেড়ে তরুণ টমাস ঝুঁকে পড়লেন সাহিত্যসাধনার দিকে।

তাঁর প্রথম রচনা—"দ্যর ক্লেইন হের ফ্রীডমান" নামক একটি ছোট গল্প। অত্যুচ্চ মানের সাহিত্য না হলেও, তারই দৌলতে নবীন সাহিত্যিক সাহিত্যজগতে কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তখন তিনি বাস করছিলেন ইতালিতে অগ্রজ হেনরিকের কাছে। সেইখানে বসেই তিনি তাঁর প্রথম বৃহৎ উপন্যাস "বাডেন-ব্রুকস্" লিখতে শুরু করেন। ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এই অনন্যসাধারণ সাহিত্যকর্ম দেশে

বিদেশে অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়ে উঠল। একটি বণিক পরিবারের অভ্যুদয়, ভূমোন্নতি ও অবশেষে বিপর্যয় এবং অবলুপ্তির ধারাবাহিক বিবরণ অবলম্বন করে দীর্ঘ চার পুরুষের জীবনকাল শতাধিক বৎসরব্যাপী জার্মানির সামাজিক ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গলস্‌ওয়ার্দির অমর রচনা "ফর্সাইট সাগা"র সঙ্গে অনেক দিক দিয়েই "বাডেন-ব্রুকসে"র তুলনা চলে।

টমাস মানের অন্যান্য প্রসিদ্ধ রচনা হল—ট্রিস্টান, টোনার ক্রোগার, ফিওবেঞ্জা, ফেলিক্স ক্রুল ডেথ ইন ভেনিস, রয়াল হাইনেস, বাশান অ্যান্ড আই, এ ম্যান অ্যান্ড হিজ ডগ, ম্যাজিক মাউন্টেন এবং বিশ্বসাহিত্যে তাঁর চিরস্মরণীয় অবদান—"জোসেফ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স"। সুবৃহৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঁচখানি গ্রন্থে বাইবেলোক্ত জোসেফের কাহিনীকে তিনি এক নতুন সজ্জায় উপস্থিত করেছেন পৃথিবীর সামনে।

জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরে তিনি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডে বাস করতে থাকেন। মাঝে কয়েক বছর আমেরিকার লস এঞ্জেলসে অবস্থান করলেও ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখে ফিরে আসেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল প্রাইজ এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্যেটে প্রাইজ লাভ করেছিলেন তাঁর সাহিত্যসাধনার বিশ্বজোড়া স্বীকৃতিস্বরূপ।

সমাপ্ত